॥ প্রথম প্রকাশ ॥
আশ্বিন, ১৩৬১

॥ দ্বিতীয় প্রকাশ ॥
আশ্বিন, ১৩৬২

॥ প্রকাশক ॥
শ্রীধীরেশ চন্দ্র সান্যাল
১০, নবীন কুণ্ড লেন
কলিকাতা-৯

॥ প্রচ্ছদপট ॥
শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

॥ মুদ্রাকর ॥
শ্রীনির্মল সিন্হা
অজন্তা আর্ট প্রেস
২৬এ, কেশব সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

॥ মূল্য ॥
সাড়ে তিন টাকা

বাণী, চৈতালী ও পার্থসারথিকে—

# প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশান্তি কুমার দাশগুপ্ত একদিন সাহিত্যিক বলে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। সে অনেকদিনের কথা—তখন অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকাতেই তাঁর লেখা দেখা যেত। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর যে তুখানা উপন্যাস বেরোয় তার একটা গ্রন্থরূপেও আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্ত্তমানে যে উপন্যাসটি আমরা প্রকাশ করছি তা তিনি লিখেছিলেন ১৯৪৬ সালে। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যে লেখকের ছিল তা বেশ বুঝতে পারা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকরা কি ফল পাবে তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি তখনই করেছিলেন। সমাজের একটা বড় সমস্যার দিকেও তিনি আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তাই এটা প্রকাশ করবার লোভ আমরা সামলাতে পারলুম না।

উপন্যাসটি প্রকাশ করার ব্যাপারে নানা দিক দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীনৃপেন সেন এবং শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী। এই সুযোগে আমরা তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে নিচ্ছি।

—প্রকাশক—

॥ এই লেখকের অন্যান্য বই ॥

বন্ধন-হীন গ্রন্থি ( উপন্যাস )

দেশ যাদের ডাকে ( ছোটদের উপন্যাস )

সাহিত্য ও আলোচনা ( সমালোচনা )

১

বছর কুড়ি-একুশের একটি যুবক স্তূপীকৃত পুস্তক রাশির মধ্যে বসিয়া একটি পুস্তক দেখিতেছিল। এমন একটি ভাঙ্গা গৃহের ভাঙ্গা ঘরে অমন অপরূপ রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কেবলমাত্র দেহের রং-ই নহে, নাক চোখের কোথাও কোন খুঁত আছে বলিয়াও মনে হয় না। মা অন্নপূর্ণা তাই আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন রাজকুমার। এই দরিদ্র রমণীর আদরটুকুই ছিল সম্বল—পুত্রের ভরণপোষণের জন্য আর যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা নেশাখোর স্বামীর কল্যাণে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। স্বামী সময়ে অসময়ে গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে এবং নেশার পয়সা সংগ্রহের জন্য গৃহের যাহা পায় তাহাই লইয়া যায়। তথাপি অন্নপূর্ণা পুত্রের মুখ চাহিয়া অজস্র অত্যাচার সহিয়াও দুই একটি গহনা লুকাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহারই দ্বারা পরাণ কাকার পাঠশালার সমস্তটুকু বিদ্যার অধিকারী করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন রাজকুমারকে। পরাণও রাজকুমারের বুদ্ধি দেখিয়া নিজের বিদ্যার অনেকখানিই তাহাকে দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

রাজকুমারদের অবস্থা ভালই ছিল। ঠাকুর্দার আমল হইতেই তাহাদের অবস্থার পতন আরম্ভ হয়। তিনি ছিলেন মস্ত পণ্ডিত, সংসারে জড়িত হওয়া অপেক্ষা সংসারকে অতিক্রম করিয়া যাইবার ঝোঁকটাই ছিল তাঁহার অনেক বেশী—তাই সব সময়েই ইংরাজী-বাঙ্গলা-সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে তিনি

ডুবিয়া থাকিতেন। সেই অবসরে দেনায় সম্পত্তিও একে একে ডুবিতে ছিল এবং নেশায় ডুবিতেছিল তাঁহার একমাত্র পুত্র গোকুল। যে সময় তিনি গ্রন্থ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন তখন আর কোনদিকে কোন সময় ছিল না।

যাহা অবশিষ্ট ছিল গোকুল তাহা শেষ করিয়া আনিল অল্প কয় দিনে। তাহার সমস্ত সম্পত্তিই ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছিলেন জ্ঞাতি জমিদার যদু ঘোষাল। যদু ঘোষাল পাকা জমিদার, ছোট খাট চেহারার বৃদ্ধ গোছের মানুষটিকে লোকে ভয়ও পাইত বড় কম নয়। কিন্তু এ হেন যদু ঘোষালের অতি আদরের নাতিনী সতী যে কেমন করিয়া রাজকুমারের এত ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় হইয়া উঠিল তাহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। যদু বাধা দিলেন না—হয়ত' একান্ত প্রিয় নাতিনীকে বাধা দিতে পারিলেন না।

রাজকুমার পুস্তক রাশির মধ্যে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। এত বিস্ময় তাহার জন্য তাহাদেরই গৃহে জমা ছিল! যেখানা সে পড়িতেছিল তাহাতে কত ভাল ভাল কথাই না লেখা আছে! সবগুলিতেই কি এমনি সব লেখা আছে নাকি? পরম স্নেহভরে এক একবার সে ধ্যানস্তিমিত চক্ষে পুস্তকগুলির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। সেই টানা টানা চক্ষু দুইটিতে যেন কোন্ এক রাজ্যের স্বপ্ন!

সতী যে কখন ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে রাজকুমার তাহা জানিতেও পারে নাই। এই পনের-ষোল বছরের মেয়েটি এমনি করিয়াই মাঝে মাঝে পা টিপিয়া রাজকুমারের একেবারে পিছনে আসিয়া তাহাকে চম্‌কাইয়া দেয়। ভারী ভাল লাগে কুমারদার চমকিত চাহনি। ঐ চক্ষু দুইটা যেন কি! সতীর কি যে মনে হয় তাহা সে জানে না—মাঝে মাঝে দুই হাত দিয়া সে ওই দুইটাকে ঢাকিয়া দেয়। পুস্তক রাশির দিকে চাহিয়া আজ সতীর

স্মৃত হইবার পালা। অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া সে একেবারে রাজকুমারের পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, এত বই কোথায় পেলে কুমারদা ?

রাজকুমার এতক্ষণে সতীকে দেখিতে পাইল, খুসীর সহিত তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, কলম্বসের আবিষ্কার।

চক্ষুতে হাসির দীপ্তি মাখিয়া সতী বলিল, ওঃ, ভারতবর্ষের খোঁজে বেরিয়ে যে আমেরিকায় যায় তার আবার আবিষ্কার !

সতীর মাথায় হাত রাখিয়া হাসিমুখেই রাজকুমার বলিল, আমারও হয়েছে তাই। জানই ত বন্ধ ঘরটায় ছিল দাদুর কয়েকটা কাঠের সিন্দুক। বাবা আজ টল্‌তে টল্‌তে এসে ঘর খুলে নেশার পয়সা জোগাড় করতে সিন্দুক গুলো নিয়ে গেছেন—আর ঘরের মধ্যে ঢেলে দিয়ে গেছেন আবর্জ্জনাস্বরূপ দাদুর প্রিয় বই-গুলো। বলিতে বলিতে রাজকুমারের হাসি শূন্যে মিলাইয়া গেল—চক্ষু দুইটাতে অশ্রু বিন্দু টল্ টল্ করিয়া উঠিল।

সতী জানে কুমারদার দুঃখ। কেহ কি সে দুঃখ একেবারে দূর করিয়া দিতে পারে না ? কুমারদার মা-ই তাহার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু সে ত' নিজের চোখে সেই মায়ের লাঞ্ছনা দেখিয়াছে নেশাখোর স্বামীর হাতে। অন্নপূর্ণার দেহের উপর যে রেখা গুলি পড়িয়াছে রাজকুমারের মনে সেগুলি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে।

সতী কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। রাজকুমারের চক্ষে যে অশ্রু বিন্দু টল্ টল্ করিয়া উঠিয়াছিল সতীর বক্ষে তাহাই যে প্রবল আবেগে বহিয়া চলিয়াছে। রাজকুমার নিজেই সংযত হইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, অতুলদাকে মনে আছে সতী ?

সতী উত্তর করিল, মনে আছে। তারপর গলাটা একটু পরিস্কার করিয়া বলিল, মনে না থাকবার কোন কারণ ত' নেই কুমারদা। গ্রামের পর গ্রাম

ঘুরে তিনি লাঠি আর ছোরা খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গের ছোট মেয়েটা ওই বয়সেই কত না ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল। বলিতে বলিতে সতীর চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, একটু থামিয়া আবার সে বলিয়া চলিল, তাঁকে এখানে আটকে রেখেই ত শিখে নিলে অনেক কিছু এবং তাঁরই কথায় খুলেছ তোমার 'তরুণ সঙ্ঘ'।

রাজকুমার শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সম্মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে যেন ভবিষ্যতের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। সতী থামিতেই সে সজাগ হইয়া বলিল, অতুলদা বলেছিলেন শুধু লাঠি-ছোরায় কিছু হবেনা তার সঙ্গে চাই মনের খোরাক। কয়েকটা বইও তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ভাবছি এগুলোর সাহায্যে সঙ্ঘের গ্রন্থাগার খুলে দেব'।

সতী খুসীতে মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, খুব ভাল। তারপর আব্দারের ভঙ্গীতে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমাকে কিন্তু সব বুঝিয়ে দিতে হবে।

রাজকুমার হাস্য মুখে সতীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

*

*　　　*

রাজকুমারদের তরুণ সঙ্ঘের গ্রন্থাগার খোলা হইয়া গেল। ছেলের দল খুব উৎসাহের সহিত বইগুলি লইয়া গিয়া পাঠ করে। সকলেই যে সব বুঝিতে পারে তাহা নহে তথাপি কাহারও আগ্রহ এতটুকু কমিল না। পিতা অথবা ভ্রাতার সাহায্যে কিছু কিছু বুঝিয়া লইবার চেষ্টাও অনেকে করিত। পাঠশালা যাহা পারে নাই এই গ্রন্থাগার তাহাই করিল। ছেলে মেয়েদের মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

সতীকে অধিকাংশ বই পড়িয়া শুনাইত রাজকুমার। কিন্তু ঠাকুর্দার

পাণ্ডিত্যের কণামাত্রও যে তাহার নাই তাহা বুঝিতে রাজকুমারের বিলম্ব হইল না। সে তাই একদিন পরাণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরাণ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বেঁচে থাক দাদু, শুনলাম গ্রন্থাগার করেছ—এর থেকে ভাল কাজ আর নেই। জ্ঞানেই ত মানুষ শুদ্ধ হয়।

পরাণের মুখের দিকে চাহিয়া রাজকুমার বলিল, সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি দাদু। বইগুলো নিয়ে আপনি একটা বড় রকম পাঠশালা বসিয়ে দিন না।

পরাণ খুসী হইলেন, রাজকুমারের মাথায় হাত রাখিয়া ক্ষণকাল চক্ষু বুঁজিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, বড় ভাল লাগল তোমার কথা। জানবার আগ্রহ যখন হয়েছে তখন আর ভাবনা কি? আমার সাধ্যমত আমি করব। ক্ষণকালের জন্য তিনি অন্যমনস্ক হইয়া সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বর্ত্তমান হইবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ ভবিষ্যতের কোন দৃশ্য বোধ করি তখন তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

রাজকুমারের আশে পাশে যেন একটা স্বপ্নের জাল রচিত হইয়া গেছে। অতুলদা তাহাকে এক স্বপ্ন দেখাইয়া গিয়াছেন, দাদুও যেন কি স্বপ্ন দেখিতে-ছেন। সে চুপ করিয়াই পরাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরাণ ধীরে ধীরে বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তোমার ঠাকুর্দ্দা পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর বই ছোঁয়ার যোগ্যতাও আমার নেই। কিন্তু তবু তোমাদের আমি চাই বলেই তোমাদের সঙ্গে থাকব।

রাজকুমার বলিল, আপনি আমাদের গুরু।

পরাণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ঠাকুর্দ্দার সমান পণ্ডিত হতে না পারলেও তাঁরই মত ন্যায়ের ভক্ত হও। সত্যাশ্রয়ীর জয় হয়।

পরাণের একটা ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। পরপারের ডাক আসিবার কিছু-দিন পূর্ব্বে রাজকুমারের ঠাকুর্দা যখন একবার গ্রন্থ হইতে মুখ তুলিয়া নিজের সংসারের দিকে চাহিলেন তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে উহাকে সামলাইয়া লইবার আর কোন উপায়ই নাই। পণ্ডিতের দৃষ্টিতে বোধ করি সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত গ্রামের সংসারের ছবিই ভাসিয়া উঠিল। গ্রামের ছেলে-গুলিকে যদি সত্য পথ না দেখান যায় তবে প্রতি সংসারেই গোকুলের আবি-র্ভাব হইবে। শঙ্কিত পণ্ডিত ভিন্ন গ্রাম হইতে বন্ধু স্থানীয় পরাণকে ডাকিয়া আনিলেন এবং যদু ঘোষালকে বলিয়া তাঁহারই জমিতে তাঁহার পাঠ-শালা এবং আস্তানা বসাইয়া দিলেন। এই আদর্শবান সংসারে আসক্তিহীন ব্যক্তিটিকে তিনি ভালবাসিতেন—গ্রামকে তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। যদু ঘোষালও পাঠশালা বসাইয়া জমিদারের কর্ত্তব্য করিয়াছেন মনে করিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং সময়ে অসময়ে পরাণকে উপদেশে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিলেন।

পরাণের দৃষ্টি ছিল রাজকুমারের প্রতি। কিন্তু জোর করিয়া বিদ্যা দেওয়া যায় না—যাহার আগ্রহ আছে কেবলমাত্র তাহারই বিদ্যার্জ্জনের অধিকার আছে। তাই তিনি কোন দিন নিজে গিয়া রাজকুমারকে ডাকিয়া আনেন নাই। আগ্রহ রাজকুমারের নিজেরই যথেষ্ট ছিল, তাহার সহিত মিলিত হইল মায়ের আকাঙ্ক্ষা। রাজকুমার সমর্পিত হইল পরাণের হাতে। কিন্তু যে বিদ্যা অর্থের বিনিময় না করিয়াই অর্জ্জিত হয় সে বিদ্যার প্রতি অন্নপূর্ণার কোন শ্রদ্ধা ছিল না। একলব্য যে আঙ্গুল কাটিয়া গুরুদক্ষিণা দিয়াছিল! গুরুকে দক্ষিণা দিতে হইবে বই কি! তাই স্বামীর অত্যাচার সহিয়া গোপন করিয়া রাখা অলঙ্কারগুলি সে এই কার্য্যে ব্যয় করিল। পরাণ বাধা দিলেন না।

আজ সেই রাজকুমারই গ্রন্থাগার পত্তন করিতে চলিয়াছে। দাদুর কাছেও তাহার আহ্বান আসিয়াছে—এমনি আহ্বানের জন্য যে পরাণ বহুদিন হইতেই প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। কিন্তু বড় দেরী হইয়া গিয়াছে, আজ তিনি বৃদ্ধ। তথাপি তিনি পিছাইয়া পড়িলেন না। রাজকুমারদের দলের পুরোভাগেই এই পক্ককেশ বৃদ্ধকে দেখা যাইতে লাগিল।

*

* *

গ্রামে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। পড়িবার কথা কেহ কোনদিন বড় ভাবিয়া দেখে নাই। গতানুগতিক ভাবে ছেলেমেয়েদের পাঠশালায় পড়িতে দেওয়া দেখিয়া আসিয়াছে বলিয়াই কোন চিন্তা না করিয়া সকলেই পুত্র কন্যাদের পরাণের হাতে কিছুদিনের জন্য ফেলিয়া রাখিতেন। পরাণ আসিয়াছেন বৎসর কুড়ি পূর্ব্বে, তাহার পূর্ব্বে কয়েক বৎসর কোন পাঠশালা বসে নাই—তাহার পূর্ব্বে পাঠশালা করিতেন হরু গোসাই, আরও পুরাতন কথা বোধ হয় কাহারও স্মরণ নাই। পুত্র কন্যার জন্মের পর আর কোন দায়িত্ব আছে বলিয়া এদেশের পিতামাতারা বড় স্বীকার করেন না। জীব দিয়াছেন যিনি তিনিই ত' ষষ্ঠীর দিনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে সমস্ত ভবিষ্যৎ কপালে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবার জো নাই। অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা নাচিয়া কুঁদিয়া আপন মনেই বড় হইতে থাকিবে, তাহাদের জন্য ভাবিবার কিছু নাই। আহার জোগাইতে না পারিয়া একান্ত অক্ষম হইলে সেই জীবদাতা প্রয়োজন মত না হয় দুর্ভিক্ষ পাঠাইয়া দিবেন। তখন এই ধর্ম্মপ্রাণ জাতি কপাল ঠুকিয়া বলিবে, ভবিতব্য,—বলিবে, পাপের ফল।

কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সেই ধর্ম্মপ্রাণ জাতিরই এক গ্রামের লোকদের অযথা চিন্তিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে! কেহ বলিলেন,

অর্ব্বাচীন ; কেহ বা বলিলেন, পড়া পড়া খেলা। আবার কেহ কেহ সময়ে অসময়ে আসিয়া দুই চারিটা বই ঘাঁটিয়া দেখিতে লাগিলেন।

নিত্য নিয়মিত পরাণ ছেলেদের পড়াইতেন। এই বিদ্যোৎসাহী বৃদ্ধের উৎসাহ পাইয়া ছেলেমেয়ের দল খুসী মনে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেবলমাত্র পড়াশুনা নহে গ্রামের অন্যান্য সংস্কারের দিকেও তাহারা মন দিল। ম্যালেরিয়ারূপী যমকে তাহারা প্রত্যেকেই বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছে—নিজেরাও ভুগিয়াছে বড় কম নয়। ভবিষ্যৎ পুরুষকে বাঁচাইতে হইবে, অন্তত তাহার জন্য চেষ্টা চাই।

পরাণ উৎসাহ দিয়া বলিলেন, ভগবানের মঙ্গল বিধানে অবিশ্বাস করি না। কিন্তু তিনিও আমাদের দিয়েই কাজ করিয়ে নেন। আমার, তোমার —সবার কাজই আমাদের করতে হবে।

কে একজন বলিল, সন্ন্যাসীরা বলেন কাজ করলেই পাপ হয়।

পরাণ তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, ভাঙ্গা চশমাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল সেটাকে ঠিক করিয়া ছেলেটির মাথায় হাত রাখিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন, সব সন্ন্যাসী তা বলেন না। যাঁরা বলেন তাঁরা ভগবানের সৃষ্টি নষ্ট করতে চান। তাঁরা শুধু জাতির শত্রু নন—ঈশ্বরেরও শত্রু।

রাজকুমার ধীর কণ্ঠে বলিল, গ্রামগুলোকে প্রস্তুত করতেই হবে। অতুলদা বলে গেছেন এক বিরাট যুদ্ধের সম্মুখীন হচ্ছে দেশটা। সময় মত সাহায্য পাঠাবেন তিনি, সে যুদ্ধে এ গ্রাম একক দাঁড়িয়ে থাকবে না। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজে লাগতে হবে।

পরাণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, সেই জন্যেই আমাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য হবে প্রত্যেকটা কাজ করবার সময় তার কারণ বুঝিয়ে দেওয়া। প্রত্যেককেই ভাবতে হবে, সামান্য মুটে-মজুর বলে আমরা যাদের দূরে ঠেলে রেখেছি

তাদের চোখেও আলো ফেলতে হবে। প্রত্যেকের চিন্তার ওপর অন্যের চিন্তাই ত' জগৎকে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দেবু বলিল, আপনি আমাদের চিন্তা করতে শেখাচ্ছেন দাদু।

রাজকুমারের ন্যায় সমস্ত ছেলেমেয়েরাই পরাণকে দাদু বলিয়া ডাকিত। বৃদ্ধ তাহাতে বেশ আনন্দ পাইতেন। এই ছোটদের দলে তিনি নিজেকে বেশ সুন্দর ভাবে মিশাইয়া দিয়াছিলেন—নূতন জীবন যেন তাঁহার ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি হাস্যমুখে রাজকুমার ও দেবুকে দুইপাশে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তোমরা দু'জনে যখন এক হয়েছ তখন আর ভয় কি! মাথা আর হাতে মিতালি হয়েছে—জয় তোমাদের হবেই দাদা।

দেবু লজ্জিত ভাবে বলিল, কুমার ভাল ছেলে ছিল বলে পাঠশালায় ওর ওপর কত অত্যাচারই না করেছি। অথচ নিজের গড়া সঙ্ঘে ওই আমায় স্বচ্ছন্দে ব্যায়াম শেখাবার সর্দ্দারি দিয়ে দিলে! দেবুর চক্ষু দুইটা ছল ছল করিয়া উঠিল—সে পরম প্রীতিভরে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

রাজকুমার সেই দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, দেবু ওর পুরণো কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না দাদু।

দেবুর চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে পরাণ বলিলেন, তোমার মধ্যে ফাঁকি ছিলনা বলেই কুমারের সঙ্গে মিলতে তোমার আট্‌কায় নি। ভাল না লাগলেও ভাল লেগেছে বলে তুমি ঠকাতে চাওনি। তোমার সে সময়ের অত্যাচারে কুমারও ফুটে উঠেছে—তার লজ্জা কেটে গেছে।

সতী আসিয়া বলিল, নিজেরাই ত' পড়ছ দিনরাত, অন্যদের শেখাতে হবে না বুঝি?

তাহার অভিমান ভরা মুখের দিকে চাহিয়া কৌতুক ভরে পরাণ উত্তর করিলেন, অন্তেরা নিজেরাই এসে শিখুক না।

সতী রাগ করিয়া জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, ঠাট্টা নয় দাদু। রমজান্-হরিহরদের বললুম তাদের বাড়ীর কাছাকাছি সমস্ত বন-জঙ্গল কেটে ফেলতে, তা তারা হেসেই অস্থির হল। বলে, ওতে কি আর ম্যালোয়ারী হয়! ম্যালোয়ারীর ডিপো হচ্ছে পেটে—পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, ম্যালোয়ারী হবে না ত' কি!

ক্ষণকাল সম্মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরাণ বলিলেন, কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলেনি তারা। তারপর সতীর দিকে চাহিয়া সংযত কণ্ঠে বলিলেন, সেই জন্তেই ত' যারা শিক্ষা দেবে তাদের আগে শিখে নিতে হয় দিদি।

সতী এত কথা বুঝিতে চাহিল না। না শিখিলে যে শিখাইতে পারা যায় না তাহা সে বোঝে। কিন্তু এই শিখিবার কি কোন শেষ নাই? কুমারদা ত' সব বই-ই প্রায় পড়িয়া ফেলিয়াছে! তাই সে অপ্রসন্ন মুখেই বলিল, শিখতেই ত' তবে জীবন কেটে যাবে।

পরাণ আপন মনেই মাথা নাড়িয়া বলিলেন, যাবেইত' দিদি—কত' জীবন এমনি কেটে গেছে। তাদের সারা জীবনের শিক্ষা নিয়েই ত' আমরা পথ চলছি। এমনি করেই একটু একটু করে পথ তৈরী হয়।

কিশোরী বলিয়া বসিল, সারা জীবন পথই তৈরী হবে, কেউ হাঁটবে না?

রাজকুমার মুখ তুলিয়া বলিল, পথ ত' হাঁটবার জন্তেই সতী। যার শক্তি আছে সে পথে পা' বাড়াবেই। পথে নেমে যেন তাকে পথ খুঁজতে না হয়।

সতী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, বুঝি না বাপু তোমাদের কথা।

পরাণ হাসিলেন, তাহার চিবুক ধরিয়া মুখটা নিজের দিকে ফিরাইয়া বলিলেন, বুঝতে যে হবে। তোমরাই শক্তি; ঢাকতেও যেমন তোমরা জান তেমনি জান প্রকাশ করতে। জগৎকে প্রকাশ কর।

*

* *

বাগ্দী পাড়ায় একটা ছোট খাট রকমের মড়ক লাগিয়া গিয়াছিল। তরুণ সঙ্ঘে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়া গেল যে যতদূর সম্ভব ইহাদের সাহায্য করিতে হইবে—পরাণ উৎসাহ দিলেন।

ঠাসাঠাসি করিয়া ঘরগুলি যেন পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ঘরগুলির মাথা নীচু এবং জানালা ছোট ছোট। আলো বাতাস ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য যেন আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে তাহারা। ভিতরের প্রাণীগুলির মনের আলো-বাতাসও সেই সঙ্গে ঠেকিয়া গিয়াছে। এই আলো-বাতাসের কথা তাহারা কোন দিন ভাবেও নাই। কেহ তাহাদের সে-কথা স্মরণ করাইয়াও দেয় নাই।

কুমার, দেবু, সতী, পরাণ প্রভৃতি ইহাদের সাহায্যে লাগিয়া গিয়াছেন। সঙ্ঘের এবং সতীদের বাড়ীর ঔষধের বাক্সের সাহায্যেই যতদূর সম্ভব কাজ চলিতেছে। গ্রামে ডাক্তার একজন মাত্রই আছেন—এম, বি (হোমিও)। কিন্তু তিনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন না। বাগ্দী পাড়ায় পয়সা দিয়া চিকিৎসা করাইবার মত সামর্থ্য কাহারও নাই, সুতরাং বিনা পয়সার চিকিৎসকদের দিয়াই কাজ চলিতে লাগিল। বইয়ের সাহায্যে পরাণ পণ্ডিত ডাক্তার হইয়া উঠিলেন। সেবা কার্য্যও চলিতে লাগিল।

বাগ্দী পাড়ার লোকগুলি হতচকিত হইয়া গেল। তাহাদের মৃত্যুর পথ রোধ করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে ত' কেহই আসে নাই। মৃত্যুর পর সৎকারের

জন্য জমিদার হয়ত' কখনও কখনও নিতান্ত দয়া করিয়া এক আধটা টাকা ফেলিয়া দিয়াছেন কিন্তু ইহারা যে মৃত্যু না হইতে দিবার জন্য নিজেদের পয়সায় পথ্যও কিনিয়া দেয়! এ হইল কি? একদল তরুণ তাহাদের এমন করিয়া ভাল বাসিল কেমন করিয়া?

দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই সেবা করিয়া চলিল। বাগ্দী পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ভাল বাসিয়া তাহারা তাহাদের ভালবাসাও জয় করিয়া লইল। এই অশিক্ষিতের দল বুদ্ধি দিয়া উহাদের সব কথা বুঝিতে না পারিলেও হৃদয় দিয়া উহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিবার ব্যাপারে কোন ভুল করিল না। ইহাকেই বোধ হয় বলে সম্পূর্ণ জয় করা।

বাগ্দী পাড়ার সর্দ্দার মহেন্দ্রের ছেলেটার কয়েকদিন হইতেই বাড়াবাড়ি চলিয়াছে—কোন্ অদৃশ্য দেবতার শান্তিময় ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িবার জন্য সে যেন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। রাজকুমারের দল মহেন্দ্রের গৃহের উদ্দেশ্যে পা বাড়াইল।

মহেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল—চোখ দুইটা লাল হইয়া আছে, মাথার চুলগুলি খাড়া। বাবুদের দেখিয়া সে একটু নড়িয়া বসিল, তাহার ভাই আসিয়া তাহাদের একটা আসন দিয়া গেল।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, নরু কেমন আছে এখন?

হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া মহেন্দ্র বলিল, ও থাকবে না। সেই ভাল দা-ঠাকুর—বেঁচে করবেই বা কি? খাবার কোথায়?

দেবু একটু ঝাঁঝের সহিতই বলিল, পৃথিবীশুদ্ধ লোকের মুখেই ত' ওই এক কথা। কিন্তু কেন মরব আমরা বলত? কেবলমাত্র গরীব বলেই কি বাঁচবার অধিকার আমাদের নেই?

মহেন্দ্র হতাশভাবে মাথা নাড়িতেছিল। দেবুর শেষ কথা শুনিয়া বলিল, সে সব জানিনা, কিন্তু মরতে আমাদের হবেই। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা তুলিয়া সে সম্মুখের দিকে চাহিল। তাহার লাল চক্ষু দুইটা বোধ হয় আরও লাল হইয়া উঠিয়াছিল, উত্তেজনায় সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল। আত্মসংযমের কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া সে বলিয়া চলিল, মরতে আমাদের হবেই বাবু। বুকের রক্ত দিয়ে আমরা জমিদারকে বাঁচিয়েছি, আমাদের বাপ পিতাম'র আমল থেকে আমাদের লাঠি জমিদারের জমি বাড়িয়েছে। দরকার হলে আজও আমাদের ডাক পড়ে—তবু খাওয়া আমাদের-জোটে না। আমরা মরব না ত' কি?

পরাণ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন, এইবার বলিলেন, সেই অভিশাপ ত' লাগবেই মহেন্দ্র, তোমরা মরবে না ত' কে মরবে বল? লাঠির জোর ছিল বলে কত অত্যাচারই না করেছ। যাদের ওপর ঐ লাঠিবাজি করেছ তারা তোমাদেরই মত গরীব, তোমাদের ভাই। সামান্য অর্থের জন্য নিজেদের পিশাচ করেছিলে। সেই অর্থও ঐ গরীবদের রক্ত শোষণ ক'রেই অর্জ্জিত হয়েছে। তোমরা শুধু নিজেরাই দাস হওনি—অপরকেও দাস করেছ। মরতে তোমাদের হবেই মহেন্দ্র। বহুদিনের সঞ্চিত অভিশাপ এতদিন তোলা ছিল, আজ তোমাদের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তা' তোমাদের আক্রমণ করেছে—তোমাদের শেষ না করে ও যাবে না।

এই কঠিন তিরস্কারে মহেন্দ্রের মাথা নত হইয়া গিয়াছিল। সত্য কথা বলিয়াছেন পণ্ডিত—মরিতে তাহাদের নিশ্চয়ই হইবে। চক্ষু দিয়া তাহার টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এতক্ষণে মাথা তুলিয়া সে বলিল, আমাদের বাঁচবার কি পথ নেই পণ্ডিত মশাই?

পরাণ বলিলেন, পথ ত' সব সময়েই খোলা আছে মহেন্দ্র, যত পাপই করে

থাক না কেন পথ কখনও রুদ্ধ হবে না। মন পরিষ্কার করে শুধু একবার পথে নেমে এস—আনন্দ পাবে।

মহেন্দ্র হাত জোড় করিয়া বলিল, কি করতে হবে আদেশ দিন।

পরাণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আদেশ কেউ কাউকেই দেবে না মহেন্দ্র, পথের কথা আমরা শুধু ইঙ্গিতে বলে দিতে পারি। এতদিন যে পথে চলেছিলে তাতে পেটও ভরেনি, ধর্ম্মও গেছে। আমাদের পথে চললেও পেট হয়ত ভরবে না কিন্তু ধর্ম্ম বাঁচবে। ধর্ম্ম যদি বাঁচে তবে তার ফলে একদিন পেটও ভরবে মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র আগ্রহপূর্ণ স্বরে বলিল, আমি মুখ্যু মানুষ—আমাকে পথ দেখিয়ে দিন। সাত পুরুষের রক্তেও কি সমস্ত অভিশাপ ধুয়ে ফেলা যাবে না পণ্ডিত মশাই ?

পরাণ বলিলেন, তুমি পারবে মহেন্দ্র—তোমাদের মধ্যে যে একাগ্রতা আছে তার কণামাত্র থাকলেও কার্য্যসিদ্ধি হয়। যে একাগ্রতা নিয়ে জমিদারকে সেবা করেছ সেই একাগ্রতা নিয়ে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচতে শেখাও।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, জমিদারের শত্রুতা করতে হবে ?

রাজকুমার শান্ত ভাবে উত্তর করিল, দরকার হলে হবে বই কি ! তবে অত্যাচারের প্রতিশোধ নয়—প্রতিরোধ করতে হবে।

মহেন্দ্র চক্ষু তুলিয়া পরাণের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নেমক হারামি হবে না পণ্ডিত মশাই ?

মহেন্দ্রের দিকে স্থির চক্ষে চাহিয়া পরাণ বলিলেন, না। ও নেমক জমিদার কোথা থেকে সংগ্রহ করে ভেবেছ কি মহেন্দ্র ?

মহেন্দ্র কোন কিছু ভাবিয়া দেখে নাই—প্রয়োজনও বোধ করে নাই।

ভগবানের প্রতিভূ রাজা, রাজার প্রতিভূ জমিদার এই কথাটা শুনিয়া শুনিয়া সংস্কারগত হইয়া গেছে।

পরাণ বলিয়া চলিলেন, বড় ঘরে জন্মাওনি বলেই পাপ হয়নি, বিদ্যা-বুদ্ধি নেই বলেই খাবার অধিকার কমে নি। বুদ্ধির মূল্য যদি থাকে—কর্ম্মশক্তিরও আছে। এই দুইয়ের মিলনেই সৃষ্টি সম্ভব।

মহেন্দ্র বলিল, অতকথা বুঝতে পারিনা বাবু। যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া যেন অকস্মাৎ সজাগ হইয়া বলিয়া ওঠে, আমি পারব'ত বাবু আপনার কথা মত কাজ করতে?

পরাণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, পারবে, চলতে চলতে নিজেই পথ পাবে, শুধু একবার পথে নেমে এস, সব ভাবনার শেষ হবে।

দুই হাত বুকের কাছে রাখিয়া মহেন্দ্র কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, তাই হোক বাবু, আপনাদের আশীর্ব্বাদ আমাদের মানুষ করবে। তাহার দুই চক্ষু দিয়া তখন অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

*

* *

কাহাকেও বুঝাইয়া যখন নিজের মতে টানিয়া আনা যায় তখন উৎসাহের আর সীমা থাকে না। এই কথা বিশেষ করিয়া খাটে তাহাদের সম্বন্ধে যাহাদের মনে সংশয়ের জটিলতা তেমন কোন দাগ কাটে নাই। বাগ্দী পাড়ায় কিছুটা সাফল্য অর্জ্জন করিয়া, বিশেষ করিয়া মহেন্দ্রকে দলে আনিতে পারায় তরুণ সঙ্ঘের উৎসাহী কর্ম্মীদের উৎসাহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সমাজে অপাংক্তেয় যাহারা সত্যকার কার্য্যক্ষেত্র ত' তাহাদের মধ্যেই পড়িয়া আছে। ওই বাগ্দী পাড়ার কাছাকাছি আছে মুসলমান বস্তী—উহাদেরও একবার বুঝাইতে পারিলে হয়। বাগ্দী ও মুসলমানেরা যদি হাতে হাত মেলায় তবে বোধ

হয় তাহাদের মিলিত শক্তির বলে অনেক অসম্ভবই সম্ভব হইয়া উঠিবে। এই কথা মনে করিয়াই আজ সঙ্ঘের গৃহে সভ্যরা উৎসাহের সহিত আলোচনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। সতীর চোখ-মুখও আজ প্রদীপ্ত। যাক্, কুমারদারা কেবল বই পড়িয়া পথের সন্ধান করিবার কাজেই সময় নষ্ট করিবে না তাহা হইলে। যাহারা পড়িতে জানে না তাহাদের কুটিরের দাওয়ায় আসন পাতিয়া বসিয়া বুদ্ধিও দান করিবে। অন্নহীনতার সুযোগে যে 'ম্যালোয়ারী' উহাদের সমস্তটা পেট জুড়িয়া বসে তাহার সহিত একটা যুদ্ধও বাধিয়া যাইবে নিশ্চয়ই। কুমারদা যখন আগাইয়া আসিয়াছে তখন যে আর ভয় নাই একথা সতী নিশ্চয় করিয়াই বলিতে পারে। কুমারদা যে ভালবাসিতে জানে!

রাজকুমারই কথা বলিতেছিল, কর্ম্মীদের প্রত্যেকের মুখে নিজ মুখের জ্যোতি ফেলিয়া রাজকুমার বলিয়া চলিয়াছিল, আমাদের শাস্ত্র বলে নর-নারায়ণ। কিন্তু সেই নারায়ণদের যে হাল আমরা করে রেখেছি তা থেকেই নারায়ণের প্রতি আমাদের ভক্তির বহর টের পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষগুলোও দেখি কেবলমাত্র নুড়ির নারায়ণ হয়েই বসে আছে—কাজ তাদের শুধু বিয়ের সাক্ষী থাকার মত, হাত পা নেড়ে কিছু করার উপায়ও তাদের নেই। তাই আমাদের কাজ হচ্ছে নারায়ণদের বস্তা বন্দী করে স্বর্গে তাঁদের স্বস্থানে পাঠিয়ে নর গুলোকে একটু নাড়িয়ে দেওয়া। মহেন্দ্ররা নাড়া খেয়েছে, এবার আমাদের নজর দিতে হবে ইয়াসিন্দের ওপর। ওই বুড়ো ইয়াসিন্ই পাড়ার মোড়ল।

কে একজন বলিল, এযে ম্যালেরিয়া তাড়াবার নামে জমিদারের সঙ্গে লড়াই করা।

রাজকুমার একটু হাসিল, তারপর শান্ত ভাবেই বলিল, ভিখারী যখন হাত পাতে তখন তার হাতে একটা পয়সা দিয়ে আমরা মনে করি সমস্যার

সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু সমস্যাগুলো এত সহজ নয় ভাই। সমস্ত দেশ-টাই ত' প্রায় ভিখারী হয়ে উঠেছে। তাই মূলে অস্ত্রাঘাত করতে হবে। এই অস্ত্রের লড়াইয়ে আমরাই বা পেছিয়ে থাকি কেন?

'কিন্তু তোমাদের সমস্ত জমিদারী যদি অটুট থাকত রাজকুমার'? বলিতে বলিতে সকলকে চমকিত করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন জমিদার যদু ঘোষাল —সতীর ঠাকুর্দ্দা।

ঘরের সকলেই যদু ঘোষালকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দাঁড়াইযা উঠিয়াছিল—হয়ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই যদু নিজেই চৌকির একপাশে বসিয়া পুনরায় পূর্ব্বের কথার জের টানিয়া বলিলেন, তা'হলেও কি তুমি এমনি করেই জমিদারের সঙ্গে যুদ্ধ চাইতে? অথবা নিজের জমি বিলিয়ে দিতে?

যদু আসন গ্রহণ করিলে ঘরের অন্যান্য সকলেই আসন গ্রহণ করিল। এরূপ প্রশ্নের জন্য রাজকুমার প্রস্তুত ছিল না, বিশেষ করিয়া এক্ষেত্রে প্রশ্ন-কর্ত্তা যে স্বয়ং যদু ঘোষাল! তরুণ সঙ্ঘের গৃহে যদু ঘোষালের উপস্থিতি যেন শান্ত নীলাকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব। যাহারা সেই ধূমকেতু দেখিবে তাহাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটিতেই ত' লাগিবে অনেকটা সময়—এই বিস্ময়ের ঘোর না কাটা পর্য্যন্ত কি করিয়া তাহারা উহার ফলাফল বিচার করিয়া দেখিবে? রাজকুমারদের সেই বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নাই, এমন কি পরাণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া ছিলেন। সংঘর্ষ আরম্ভ হইল তাহা হইলে? একদিকে বিত্ত এবং শক্তি অপরদিকে ভালবাসা এবং আদর্শ।

কেহই কোন কথা কহিল না দেখিয়া যদু পুনরায় বলিলেন, নিজের কিছু নেই বলে কি মিথ্যে অন্যের মনে হিংসের বীজ ছড়িয়ে দেবে? মানুষের পার্থিব দুঃখের ত' শেষ নেই, তবে তাদের মনের দুঃখ মিছে কেন বাড়াতে চাও?

এতক্ষণে রাজকুমার কথা বলিল, অত্যন্ত শান্ত ভাবেই সে বলিল, মনকে আমি দেহের ওপরে স্থান দেই দাদু কিন্তু তাই বলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনা যে দেহকে বঞ্চিত করে মন খুসি হতে পারে। অন্নাভাবে যাদের পেটে ম্যালেরিয়া বাসা বেঁধেছে তারা দুর্ব্বল বলেই ভগবানের কাছে নালিশ জানায় আর সেই নালিশ নিশ্চয়ই একদিন তাঁর আসন টলিয়ে দেবে। সেই আসনের কাঁপুনি ফুটিফাটা করে দেবে মাটিকে আর তারই ফলে লুটিয়ে পড়বে ওপর তলার মানুষগুলো।

অসহ্য বিস্ময়ে চাহিয়া থাকেন যদু ঘোষাল। এত কথা শিখিয়াছে! ভুল করিয়াছেন তিনি। দিনকাল পরিবর্ত্তিত হইতেছে—বয়সের প্রতি শ্রদ্ধা ও' কলিকালে থাকিবার কথা নয়।. যাহারা মানিবে না তাহাদের একত্রিত হইতে দেওয়াই তাঁহার ভুল হইয়াছে। অঙ্কুরেই শত্রুর শেষ করিতে হয়। মায়া, সতীর প্রতি মায়াই ত' তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছিল। বোধ হয় এই কারণেই ঋষিরা মায়া ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। তথাপি নিজেকে সংযত রাখিয়াই তিনি বলিলেন, যদি তুমি নিজেও সেই ওপর তলার কেউ হতে?

রাজকুমার বেশ সহজ হইয়া গিয়াছে, শান্ত হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া উঠিল। মৃদু স্বরে সে বলিল, জানিনা তা'হলে আমার মন কোন্ অবস্থায় থাকত। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন নয় বলেই আজ একথাটা জোর করে বলতে পারি যে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে মাটি ফেটে যেত'ই আর আমাকেও তার মধ্যে ঘাড় গু জে পড়তেই হত।

যদু ঘোষাল বুঝিয়া লইয়াছেন। ইহারা অসম্মান করিবে না কিন্তু তাঁহার কথা মানিয়াও লইবে না। অন্য পথ তাঁহাকে অবলম্বন করিতেই হইবে। প্রয়োজন হইলে সাঁড়াসী বাহিনীও সজ্জিত করিতে হইবে বই কি! সাধ

করিয়া কে নিজের গৃহ ভূমিকম্পের মুখে তুলিয়া ধরে? তথাপি যেন এতটুকু বিরক্ত হন নাই এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন, কোন মানুষেরই ক্ষতি করতে নেই কুমার। আমি বলি তোমরা নিজেরা খেটে বনজঙ্গল সাফ কর, পুকুরের পানা পরিষ্কার কর, রাস্তাঘাট মেরামত কর—তবে সব দিক দিয়েই মানুষের উপকার। এতে আমাকেও পাবে তোমাদের সঙ্গে, কিছু টাকা খরচ করতেও আমি রাজী আছি।

রাজকুমার উত্তর করিল, এগুলোও ত' আমাদের কাজের ছকের অঙ্গ। ভিখারীকে পয়সা দিতেও বলি, সেইসঙ্গে তার সমস্যার মূল ধরে নাড়া দিতেও বলি—হু'টো একই যোগে চালান চাই।

যতু মৃতু মৃতু মাথা নাড়িতে লাগিলেন—রাজকুমারের সমর্থনে না নিজের অন্তরের কোন এক বিশেষ চিন্তার সমর্থনে তাহা ঠিক বোঝা গেল না। রাজকুমারের কথা থামিতেই তিনি মুখ ফিরাইয়া পরাণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, সমাজ সংস্কারের অনেক দিকই ত' আছে। কিন্তু তাই বলে তোমরা ওই সব ছোটলোক বাগ্দী-মুসলমানদের কাছে যাবে ধর্ণা দিতে? ওরা যে ডাকলেই ছুটে এসে লুটিয়ে পড়বে! তুমি সঙ্গে থাকতেও এই সব হবে পরাণ? তুমি না গ্রামের পণ্ডিত!

পরাণ একধারে বসিয়া রাজকুমার ও যতু ঘোষালের বিতর্ক শুনিতেছিলেন, যোগ দেন নাই। যতু নিজের সমর্থনে তাঁহাকে আসরে আহ্বান করিলেন। বৃথা আশা। মৃতু হাস্যের সঙ্গেই পরাণ উত্তর করিলেন, আমি যে গ্রামের পণ্ডিত ঘোষাল ম'শায়।

নাঃ, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে। চোখে চোখে না রাখিলে এমনই হয়। অর্থের হিসাব হইতে তুই দিন চক্ষু ফিরাইয়াছ ত' অমনি দেখিবে হিসাবে গণ্ডগোল হইয়া গেছে—একগাদা টাকা লোকসান হইয়া যাইবে। মানুষের

মনগুলি হইতেও দুইদিনের জন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া লও দেখিবে সেখানেও আর হিসাব হাতড়াইয়া পাওয়া যাইতেছে না—লোকসানের খাতায় তাহাদের নামও উঠিয়া গিয়াছে। আর ঢিলা দেওয়া নয়, এইবার সব কিছুই দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিতে হইবে। কণ্ঠস্বরে একটু কঠোরতা মিশাইয়া যদু বলিলেন, আমারই খাস জমিতে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি পণ্ডিত, কথাটা মনে রেখ। তারপর রাজকুমারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুলতে কোন জমিদারই কোন দিন দেয় না রাজকুমার। সর্ব্বশেষে ধীরে ধীরে দৃষ্টি মেলিয়া ধরিলেন সতীর মুখের উপর। জমিদারের ক্ষমতাদীপ্ত দৃষ্টি যেন একটু কোমল হইয়া উঠিল। বড় আদরের নাতিনী, কিন্তু আর মায়া নহে। অটল গাম্ভীর্য্যের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া যদু ঘোষাল ডাকিলেন, বাড়ী চল দিদি।

দাদুর আজিকার এই দৃষ্টি সহ্য করিবার শক্তি সতীর ছিল না। সে বহু পূর্ব্বেই দৃষ্টি নত করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু উঠিয়াই বা সে যায় কেমন করিয়া? তাহাদের আলোচনার মুখেই যে ধূমকেতুর মত প্রবেশ করিয়া সমস্ত ওলোট পালোট করিয়া দিলেন দাদু। দাদু চলিয়া যাইতেছেন, হয়ত' কুমারদা আবার নিজের কথার জের টানিয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিবে। কুমারদার চোখে মুখে যে দীপ্তি সে দেখিয়াছে তাহাকে এত সহজে ছাড়িয়া যাইবে কি করিয়া? ঘরের সকলে যখন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া তখন ওই গম্ভীর জমিদারকে কেমন সুন্দর কথা শুনাইয়া দিয়াছে কুমারদা! জমিদার তাহার দাদু হইতে পারে কিন্তু সেও যে তাহারই কুমারদা! সতী মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মনে যত দাগই কাটুক না কেন অন্যান্য পরিবর্ত্তনকে না মানিয়া যদু ঘোষালের উপায় ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া সতীর সম্বন্ধে কোন
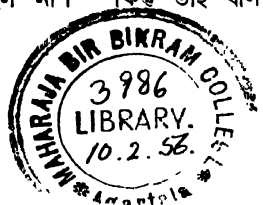
পরিবর্ত্তনকে মানিয়া লওয়া অসম্ভব। সে যে তাঁহার একান্ত নিজস্ব হিসাব। এখানে পরাজয় স্বীকার করিলে জমিদারী বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ঘরের আবহাওয়া থম্‌থম্‌ করিতেছে—সমস্ত শব্দ মরিয়া গিয়াছে। সেই নিস্তব্ধতাকে চিড়িয়া দিল যদু ঘোষালের কঠিন কণ্ঠ। একটু পিছনে সরিয়া গিয়া তিনি বলিলেন, বেলা অনেক হয়েছে উঠে এস সতী।

কিশোরী হইলেও দাদুকে সতী ভাল করিয়াই চিনিত। দিদি না বলিয়া সতী বলিয়া ডাকার অর্থ সে জানে। আর বসিয়া থাকা সম্ভব নহে। তথাপি শেষ অবলম্বন পাইবার ভরসায় সে একবার অসহায়ভাবে কুমারদার দিকে চাহিয়া দেখিল—কুমারের দৃষ্টিও তাহারই দিকে রহিয়াছে বটে কিন্তু সে দৃষ্টিতে ভরসা পাইবার কিছু নাই। তাহার চঞ্চল দৃষ্টি ফিরিয়া গেল পরাণের দিকে। নাঃ, সেখানেও কিছু নাই। ভয়ে ভয়ে সে চাহিল দাদুর মুখের দিকে। সেখানে ভয়ঙ্কর দৃঢ়তা। সতী উঠিয়া দাঁড়াইল, ধীর পায়ে দাদুর পিছন পিছন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আলোচনা আর হইতেই পারিল না। ঈশান কোণে একখণ্ড কালো মেঘ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। একটা তোলপাড় সুরু হইবে বোধ হয়। কে জানে শেষ আঘাত কে হানিবে, ঝড় না ভূমিকম্প? একত্রিত করিয়া গুছাইয়া তোলা ঝড়া পাতাগুলি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে না উহাতে আগুন লাগিয়া তাহারই শিখায় ভস্মীভূত হইবে বিরাট প্রাসাদ?

বহুক্ষণ হইল সতীকে লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন যদু ঘোষাল। কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। সকলেই মনের মধ্যে প্রস্তুত হইবার আহ্বান শুনিতে পাইল। সংগ্রাম সুরু আজ।

*

* *

যদু ঘোষালের মস্তিষ্কে নানা কথা খেলিয়া যাইতেছিল। জমিদারী রক্ষা করিবার অনেকগুলি পথ তাঁহার জানা আছে। ইহাদের কোন্‌টাকে বর্ত্তমানে কাজে লাগাইলে সিদ্ধি লাভ হইবে তাহাই কেবলমাত্র বিবেচ্য। সতীকে সরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না, আবার বাগ্দী-মুসলমানদেরও বাঁধিয়া রাখা চাই। ইহাদের কাহাকেও যদি হারাইতে হয় তবে ধ্বংসের মুখে পা বাড়াইতে হইবে। যদু ঘোষাল অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন। সতীর বিষয়ে পূর্ব্বেই মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। একান্ত আদরের নাতিনীকে ছাড়িয়া দিতেও ইচ্ছা করে না তাই আরও কয়েকটা দিন তিনি তাহাকে দেখিতে চান। মহেন্দ্রকে ধরিয়া কাজে নামিয়াছে তরুণ সঙ্ঘ, মুসলমানদের ধরিয়া কাজে নামিবেন জমিদার। উভয়ের মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতি বজায় আছে তাহা এইবার শেষ করিয়া দিতে হইবে। এই দুইটা শক্তিকে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত করিতে পারিলে আর চিন্তা কি!

যদু ঘোষাল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন মুসলমান বস্তীর উদ্দেশে। তখনও নানা চিন্তা তাঁহার মাথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাহার নিকট যাইবেন তিনি? বৃদ্ধ ইয়াসিন্ সকলের মোড়ল বটে কিন্তু তাহাকে দিয়া কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। লোকটা বড় ধর্ম্মভীরু, অন্য ধর্ম্মের মানুষের প্রতিও কেমন যেন একটা টান তাহার বরাবরই রহিয়া গিয়াছে। বাগ্দীদের বিরুদ্ধে তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তোলা অসম্ভব। ঘোষালের মনে পড়িয়া গেল যে কলিতে বয়সের সম্মান নাই। তাঁহার সম্মানই যখন রাখে নাই তরুণ সঙ্ঘের তরুণেরা তখন ইয়াসিনের সম্মানই কি রাখিবে তাহার বস্তীর তরুণের দল? তবে এই তরুণদের নিকট যাওয়াই শ্রেয়। যদু ঘোষাল মনস্থির করিয়া

ফেলিলেন। তরুণদলের নেতা রফিকের নিকটই যাইবেন তিনি। তবে তাই বলিয়া ইয়াসিন্‌কে অসম্মান করিয়া বসিবেন না—তাহকেও একবার টিপিয়া দেখিতে হইবে বই কি!

যদু ঘোষাল প্রথমেই ইয়াসিনের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। জমিদারকে দেখিয়া বৃদ্ধ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কোথায় যে তাঁহাকে বসাইবে, কি যে পাতিয়া দিবে তাহা সে স্থির করিতেই পারিল না।

একটা মোড়ায় বসিতে বসিতে যদু বলিলেন, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না ইয়াসিন্। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, বহুদিন এদিকে আসিনি, তাই মনে হল একবার সন্ধান নিয়ে যাই।

ইয়াসিন্ সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, হুজুরের দয়া। আপনাদের আশ্রয়েই ত' আমরা আছি। মানুষের কষ্ট আল্লা আপনিই টের পান। আমাদের ভয়ের কথা হুজুর হয়ত' মনে মনে জানতে পেরেছেন।

ভুরু কুঁচকাইয়া ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি থাকতে তোমাদের ভয় কি ইয়াসিন্?

ইয়াসিন্ পাকা দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিল, না, ভয় আর কি কর্ত্তা। তবে এই বাগ্দী পাড়ায় মড়ক লেগেছে বলেই যা একটু ভয়। ওদের যা হয় তা আমাদের ধরে আবার আমাদের যা হয় তা' ওদের না ছুঁয়ে যায় না।

কথাটা খাঁটী সত্য। ঘোষালও তাহা ভাল করিয়াই জানেন। দুইটা দরিদ্র পরিবার এই বিশেষ বিষয়ের আদান প্রদানের কাজে চিরকাল পরস্পরকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। মন্দ নয়, একেবারে নিঃশেষ না হইয়া যদি উহারা চিরকাল ধুঁকিতে থাকে তবে কি আর যদু ঘোষালকে ছুটিয়া আসিতে হয় উহাদের নিকট?

যদু মুখে ভরসা দিয়া বলিলেন, সবই আল্লার মর্জি ইয়াসিন্। তিনি যেদিন টেনে নেবেন সেদিন না যাবার পথ ত' কোনদিকেই খোলা থাকবে না। এই যে তোমাকে চাষী আর আমাকে জমিদার করে তিনি সৃষ্টি করেছেন এও তাঁর একটা খেলা ছাড়া আর কি বল? এর মর্ম্ম আমরা কি বুঝব'?

ইয়াসিন্ মাথা ঝাঁকাইয়া সমর্থন জানাইয়া বলিল, সে ত' একশ' বার কর্ত্তা। খোদার ওপর খোদকারী করা কার সাধ্য?

যদু ভগবানের উদ্দেশে একটা নমস্কার জানাইয়া বলিলেন, তবেই বোঝ মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা কত' অন্যায়। আমি যে জমিদার হয়েছি সে কি আমার ইচ্ছে? সে ত' ওপরে বসে একজন কলকাঠি টিপ্‌ছেন বলেই—যেদিন ওপর থেকে হুকুম আসবে সেদিন-ই ত' আমাকে সরে দাঁড়াতে হবে।

ভাবে ইয়াসিনের দুই চক্ষু বুঁজিয়া আসিয়াছিল—সে তখন ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলাইতেছে। কি কথাই আজ সে শুনিতেছে! আল্লার প্রতিনিধি ত' এইরূপ খাঁটী মানুষেরই হওয়া চাই। ইঁহার জমিদারীতে বাস করিয়া সে ধন্য হইয়া গিয়াছে।

ইয়াসিনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন তাহা ঘোষাল বুঝিলেন। কিন্তু তথাপি ইহাকে দিয়া যে তাঁহার কাজ হইবে না তাহাও তিনি জানেন। আল্লার ভক্তের প্রতিই তাহার ভক্তি—মানুষের উপর যাহারা আঘাত হানিতে চায় তাহাদের সে কোন দিনই শ্রদ্ধা জানাইতে পারে না। তাই আর অধিকক্ষণ তিনি সেখানে অপেক্ষা না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ইয়াসিন্ বলিল, আর একটু বসবেন না কর্ত্তা।

যদু উত্তর করিলেন, আরও কয়েকজনের সঙ্গে একটু দেখা করেই যাই।

তারপর অকস্মাৎ যেন মনে পড়িয়াছে এইরূপ ভাবে বলিলেন, আল্লার টানকে মানুষ ঠেকাতে পারে না কিন্তু তবু আমি-ই যখন তাঁর প্রতিনিধি হয়ে আছি তখন আমার একটা কর্ত্তব্য আছে ত'। আল্লার দোয়ার জন্য পীরের দরগায় সিন্নীর বন্দোবস্ত কর। এই বলিয়া পকেট হইতে দশ টাকার একটা নোট বাহির করিয়া তিনি ইয়াসিনের হাতে দিলেন।

ইয়াসিন বিনয়ে একেবারে নত হইয়া পড়িল।

ইহার পর যদু গেলেন রফিকের নিকট। তাহার রক্ত যেন সব সময়েই টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। অতীতের ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়া বাগ্দীদের বিরুদ্ধে তাহার মন বিরূপ হইয়াই আছে। জমিদারের লাঠিয়াল রূপে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের উপর উহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কত অত্যাচারই না করিয়াছে। জমিদারের উপরও সে খুসী নহে, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ কোন ফলই দিবে না—সুতরাং সে কথা সে মনের মধ্যে চাপিয়াই ফেলিয়াছে। কিন্তু মহেন্দ্রের দলকে সুযোগ পাইলে সে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। আজ অকস্মাৎ সে জমিদারকে সহায়ক রূপে পাইয়া গেল। আর ভয় তাহার কাহাকেও নাই। ঘোষালের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার পরামর্শ হইল। স্থির হইয়া গেল যে প্রয়োজন হইলে সে ব্যয় করিবে তাহার দলের লোকের রক্ত আর জমিদার ব্যয় করিবেন অর্থ। শত্রু সংহারের জন্য ঘোষালকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইয়াছে, কৃপণতার ইহা সময় নহে। পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া তিনি রফিকের হাতে দিয়া গেলেন। ঈশ্বরের দোয়া ভিক্ষার জন্য একস্থানে যাহা দিয়াছেন অন্যত্র তাহারি কয়েক গুণ দিয়া গেলেন তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য।

* * *

## ২

সতীর হইয়াছে মুস্কিল। কয়েকদিন গৃহ হইতে বাহির হওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কাল হইতে দাদুর দৃষ্টি যেন কিছু বেশী কড়া বলিয়া মনে হইতেছে। অন্যদিন দাদু বাহির হইয়া গেলে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্তত সে একবার কুমারদার সহিত তাহার গৃহে অথবা সঙ্ঘের কক্ষে দেখা করিয়া আসিত। কিন্তু এই কয়েক মুহূর্ত্তে যেন তৃপ্তি নাই। ইচ্ছা করে সারাদিন, সারারাত উহার সহিত বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলিতে। সে কথা যাহাই হউক অন্যে শুনিয়া ফেলিলে চলিবে না। কুমারদা, তাহার কুমারদা। এই কথাটা মনে করিতেও বেশ লাগে সতীর। ওই লোকটার কথা মনে পড়িলেই কি একটা খুসীর সঞ্চার যেন হইয়া যায় সমস্ত দেহে-মনে। উহার কথা মনে করিয়া দুঃখ পাইতেও ত' ভাল লাগে! এ কি বোধ সতী তাহা জানে না। বুঝিবার উপযুক্ত বয়সও তাহার হয় নাই।

আজ কুমারদার পাশে দাঁড়াইয়া থাকিবার ইচ্ছা তাহার কত বেশী হইয়া উঠিয়াছে, অথচ আজই দাদুর দৃষ্টি কিছু বেশী তীক্ষ্ণ। তাহাকে আজ তিনি কোথাও যাইতে দিতে চাহেন না বোধ হয়। আজই কুমারদারা যাইবে মুসলমান বস্তীতে—সেখানেও মড়কের ছায়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। দাদুর বাহিরের ঘরে কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও একটা পরামর্শ চলিতেছিল, সে কান পাতিয়া তাহার কিছুটা শুনিয়াছে। যতটুকু শুনিয়াছে তাহাতেই তাহার ভয় করিতেছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মুসলমান বস্তীর তরুণদলের নেতা রফিককে সে

বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছে। লোকটার যেমন ষণ্ডা চেহারা তেমনি বিশ্রী চক্ষু দুইটা। সতী অস্থির হইয়া উঠিল, কুমারদার নিকট একটা সংবাদ পৌছাইয়া দিতেই হইবে। নাই বা গেল মুসলমান বস্তীতে উহারা ঔষধ লইয়া। কুমারদারও যদি মাথা ফাটাইয়া দেয়! না, অবুঝের মত এসব কি চিন্তা করিতেছে সতী।

তরুণ সঙ্ঘের তরুণ দল হয়ত' এতক্ষণ প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের ঔষধের বাক্স লইয়া। বৃদ্ধ পরাণকে নেতা করিয়া হয়ত' এতক্ষণে তাহারা অগ্রসর হইয়াছে। সতী স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে এই তরুণ দলের প্রথম সারিতে রহিয়াছে দাদু, কুমারদা আর দেবু। রফিক যে কথা বলিয়া গিয়াছে তাহাতে ইহাদের রক্ষা পাইবার কোন উপায়ই নাই। কিন্তু উপায় তাহাকে করিতেই হইবে। কুমারদার পায়ে ধরিয়া সে তাহাদের ফিরাইবে। হ্যা, ভাল কাজ হইতেই ফিরাইবে—নহিলে যে তাহার কুমারদার তাজা রক্তও বাহির হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া গোপনে সতী পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দাদু বাহিরের ঘরে বসিয়া আছেন, হয়ত' কিছু জানিতে পারিবেন না। ফিরিয়া আসিবার পর যত শাস্তি ইচ্ছা তিনি তাহাকে দিন, সে এতটুকু দুঃখ না করিয়া মাথা পাতিয়া সমস্তই গ্রহণ করিবে—কিন্তু যাইতে তাহাকে হইবেই।

সতী সোজা আসিয়া উপস্থিত হইল কুমারদার গৃহে। না, অনেকক্ষণ পূর্ব্বে সে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার চিন্তিত মুখের দিকে চাহিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, অমন সুন্দর মুখখানা এমন কালো করে রেখেছ কেন মা?

সেকথার কোন উত্তর না দিয়া সতী জিজ্ঞাসা করিল, কুমারদারা কি কাজে চলে গেছেন কাকীমা?

সতীর প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা অন্নপূর্ণা লক্ষ্য করিলেন। মা হইয়া তিনি যে কিছু না বোঝেন তাহা নহে। অথচ ইহা এমন একটি ব্যাপার যাহাকে বুঝিয়াও স্নেহচ্ছায়ার বৰ্দ্ধিত করা চলে না। তাই না বুঝিয়া থাকাই শ্রেয়। কুমারদাকে না দেখিয়া সতীর ভাল লাগিবার কথা নহে, দাদুর শাসনে আজকাল এই দেখাটা প্রায় হয়ই না তাহাও তিনি জানেন। অন্নপূর্ণা একটা নিশ্বাস চাপিয়া বলিলেন, তোমার কুমারদার কাজের কথা তুমি যত জান তত কি আমি জানি মা?

সতী তাহা জানে। সে বেশ বুঝিয়াছে যে কুমারদারা বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। আজ একটা অঘটন ঘটিয়া বসিবে। অন্নপূর্ণাকে আর কোন কথা বলিতে না দিয়া সে দ্রুত পায়ে বাহির হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া রহিলেন, কাহার মধ্যে যে কোন দুঃখ কখন বাসা বাঁধিয়া বসে তাহা কে বলিতে পারে!

সতী তরুণ সঙ্ঘে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে উপস্থিত সভ্যরা তাহাকে কলকণ্ঠে গ্রহণ করিল—আজকাল তাহাকে বড় একটা দেখা যায় না।

কুমারদারা সাত জন অনেক পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে। সতীর সময় নাই। একদিকে দাদুর নিষেধ অপরদিকে কুমারদার আকর্ষণ—বস্তুজগৎ এবং ভাবজগৎ। একটা নিষ্পত্তি আজ হয়ত হইয়া যাইবে। দ্রুতপায়ে সতী মুসলমান বস্তীর দিকে আগাইয়া চলিল।

ক্রমেই গন্তব্য স্থান নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। আর বেশী দূর নাই। বাতাসে মাঝে মাঝে যেন দুই একটা উচ্চ কণ্ঠধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। তাহার দাদুর প্ররোচনায় রফিকের দল হয়ত' কিছু একটা করিয়া বসিয়াছে। সতী কোন দিকে না চাহিয়া বেগে আগাইয়া চলিল।

দ্রুতগামী রেল গাড়ী সংঘর্ষে একেবারে উল্টাইয়া যায়। এখানেও তেমনি একটা সংঘর্ষ হইয়া গেল। পিছনে কঠিন কণ্ঠে ডাক শুনিয়া সতী পড়িয়া যাইতে যাইতে কোন প্রকারে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল। দাদুর কণ্ঠস্বর—স্বর বজ্রকঠিন।

যদু ঘোষাল নাতিনীর সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, আজ যাহা ঘটবার সম্ভাবনা তাহার মধ্যে তিনি উহাকে কিছুতেই থাকিতে দিবেন না। যদু ঘোষালের এখনও পতনের বাকী আছে। নিকটে আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, ফিরে চল সতী।

সতী দাদুর দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিতে পারিল না, কিন্তু ফিরিয়াই বা সে যায় কেমন করিয়া। তাহার কুমারদার এত বড় বিপদে দাদুর অন্যায় আদেশটাই কি বড় হইয়া উঠিবে? তাহার যে আর সময় নাই।

যদু ঘোষালেরও আর সময় নাই। তাঁহাকে তাঁহার পতন রোধ করিতে হইবে। সতীর অন্তরের সহিত এই সংঘর্ষ তাঁহার শক্তির পরিচয় দিবে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই মূল্যবান—দ্রুতগতিতে এই মুহূর্ত্তগুলিকে গাঁথিয়া ফেলিতে হইবে। কোথাও এতটুকু ঢিলা পাইলে তাহার ফাঁক দিয়া সতী এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জমিদারী গলিয়া যাইবে। মনস্তাত্বিক মূহূর্ত্ত পার হইতে দিলে চলিবে না। আরও একটু আগাইয়া আসিয়া ঘোষাল বলিলেন, আর দাঁড়িয়ে থেক' না চল।

দাদুর প্রচুর স্নেহ পাইয়াছে বলিয়াই বোধ করি তাঁহার কোন আদেশই সতী কোনদিন অমান্য করে নাই। আজও তাহা অমান্য করিবার সাধ্য তাহার হইল না। কি হইবে কুমারদার! সতী যে উপায়হীনা। সতী ফিরিবার জন্য পা বাড়াইল।

অকস্মাৎ মুসলমান বস্তী হইতে প্রচণ্ড এক গোলমালের শব্দ ভাসিয়া আসিল। গোলমালটা থামিতেও চাহিতেছে না। সতী মুহূর্তে ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তারপর বস্তী লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। যদু ঘোষালের উচ্চতম, কঠিনতম, কোমলতম এবং ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বরও ব্যর্থ হইয়া গেল। তাঁহার পায়ের তলা হইতে বোধহয় মাটি সরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু বড় দেরি করিয়া সতী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছে। সে আসিয়া পৌছিলে জমিদারের প্রিয় নাতিনীকে দেখিয়া রফিকও হয়ত' পিছাইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। রফিকের লাঠি ঘায়েল করিয়াছে একজনকে। বাঁচিয়া গিয়াছে কুমারদা, দাদু, দেবু—তরুণ সঙ্ঘের কাহারও গায়ে আঁচড় লাগে নাই। সমস্ত আঘাত মাথায় পাতিয়া লইয়াছে বৃদ্ধ ইয়াসিন্ মিঞা। ইয়াসিনের সহিতই কথা হইতেছিল কুমার-দাদের। কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ যেন তাহার যৌবনের কথা স্মরণ করিয়া তাহাতেই একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল। তখন হিন্দু-মুসলমানে এত ভেদ হইয়া যায় নাই। বাবুরা তাহাদের কুটিরের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় তাহাদের ডাকিয়া কত কথা বলিয়া যাইতেন। রূপনারায়ণ, প্রাণকৃষ্ণ আজ আর বাঁচিয়া নাই। তাহারা এই পথে কতদিন গিয়াছে—ইয়াসিনের সঙ্গে কত কথাই না হইয়াছে! সে মোড়া পাতিয়া তাহাদের বসিতে দিয়াছে, নিজেও বসিয়াছে। তারপর কোথা দিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে তাহা তাহারা জানিতেও পারে নাই। একসঙ্গে তাহারা কত না দৌড় ঝাঁপ করিয়াছে, কত না সাঁতার কাটিয়াছে! আজ আর সে দিন নাই, কিন্তু তাহা মনে করিয়াও কত না সুখ! ইয়াসিন্ সেই দিনেই ফিরিয়া গিয়াছিল,

ইহারা আবার সেদিন ফিরাইয়া আনিতে চাহিতেছে। ইয়াসিনের কি ভালই না লাগিতেছিল।

কিন্তু রফিকের দল ভাল লাগিতে দিবে না। তাহারা আসিয়া নানা ছুতায় গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল। রাজকুমার এবং পরাণ পণ্ডিতকে শিক্ষা দিতে হইবে—জমিদারের আদেশ। এই শিক্ষা দানের সুযোগে মহেন্দ্রের দলকেও একবার দেখিয়া লইবার সুযোগ মিলিতে পারে। এতদিন জমিদার ছিলেন মহেন্দ্রের সাহায্যকারী আজ হইয়াছেন তাহাদের, সুতরাং কোন চিন্তা নাই রফিকের।

ষড়যন্ত্রটা ইয়াসিন্ একেবারে নষ্ট করিয়া দিল। লাঠিটা বেশ জোরেই চালাইয়াছিল রফিক রাজকুমারের মাথা লক্ষ্য করিয়া কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ইয়াসিন্ আগাইয়া আসায় লাঠিটা তাহারই মাথার পড়িল। 'ইয়া আল্লা' বলিয়া বুড়া সেই যে ভূমি শয্যা গ্রহণ করিয়াছে আর নড়ে নাই। মোড়লকে আঘাত করিয়া রফিক দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস পায় নাই—দলবল সহ পলাইয়া গিয়াছিল।

রাজকুমার-পরাণদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইয়াসিন্ আল্লার দোয়াই লাভ করিল, জমিদারের দেওয়া টাকা দশটা খরচ করিয়া তাহাকে পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইল না। রাজকুমাররা ইয়াসিনের শবদেহের পাশে বিমূঢ়ের মত বসিয়াছিল—ঠিক এই সময়েই সতী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন আর করিবার কিছু ছিল না।

*

*  *

মৃত্যুকে বরণ করিয়া বুড়া ইয়াসিন্ অমৃতের সন্ধান দিয়া গেল। রাজকুমারদের কচি মনে আঘাত লাগিল খুব, কিন্তু কাজে উৎসাহ হইল

তাহাতেই বেশী করিয়া। স্পষ্ট না হইলেও বেশ সহজেই তাহারা বুঝিল যে জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ তাহাদের বাধিয়াছে। জমিদার মানে গ্রামের শ্রেষ্ঠতম শক্তি—শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শক্তি জাগ্রত হয়। তরুণ সঙ্ঘের সভ্যদের মনেও শক্তির উদ্বোধন হইল। তাহাদের আত্মপ্রত্যয় শতগুণে বাড়িয়া উঠিল।

কলিকাতার সহিত তাহাদের এইবার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হইয়া গেল। কলিকাতায় বোধ হয় জলোচ্ছ্বাস দেখা দিতেছে—তাহারই ঢেউ লাগিবে গ্রামে গ্রামে। এই ঢেউকে কাজে লাগাইতে হইবে। যাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া প্রয়োজন তাহার সন্ধান যেন সে পায়। তাহার জন্য চাই প্রস্তুতি। অতুলদা তাহারই জন্য পাঠাইতেছেন কয়েকজন কর্ম্মীকে, গ্রামে গ্রামে তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইবে, নূতন বার্ত্তা শুনাইবে প্রতিটি মানুষকে। সেই কর্ম্মীর দল আজ যে-কোন সময়ে আসিয়া পড়িতে পারে। তাহাদের জন্য একটা বন্দোবস্ত করিরা রাখিতে হইবে। বিভিন্ন গ্রামে থাকিবার আস্তানাও ত' চাই। মাত্র কয়েকটা গ্রামে তরুণ সঙ্ঘের ন্যায় সঙ্ঘ গঠন সম্ভব হইয়াছে। সে-সব স্থানে থাকিবার অসুবিধা নাই, কিন্তু অন্যত্র? সঙ্ঘের গৃহে এই বিষয়েই পরামর্শ চলিতেছিল।

অনেক আলোচনার পরও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে না পারায় পরাণ বলিলেন, এ নিয়ে বেশী ভাবনার কিছু নেই। প্রচারের কাজে যারা বেরোয় তারা আস্তানার কথা ভাবে না। গাছ তলাও তাদের কাছে আপত্তিজনক নয়। আসুন তাঁরা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক এই সময় বাহিরের দরজায় একতারা বাজিয়া উঠিল। সঙ্ঘের দরজায় এ পর্য্যন্ত কেহ কোন দিন ভিক্ষা করিতে আসে নাই—পরামর্শকারীরা কথা থামাইয়া কাণ পাতিয়া রহিল।

একতারা বাজাইয়া কোন্ বাউল যেন তখন গান ধরিয়াছে—

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।

একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।

পরাণ রাজকুমারেরা বাহির হইয়া আসিল। বাউলের পোষাক পরিহিত চারিজন যুবক বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেকের মাথায় গেরুয়া রং-এর গান্ধী টুপি, হাতে একতারা। গেরুয়া খদ্দরে তাহাদের অপরূপ দেখাইতেছিল —মুখের শান্ত সমাহিত ভাবে যেন কিসের জ্যোতি রহিয়াছে। শান্ত অথচ দৃঢ়চিত্ত এই যুবকদের দেখিয়া মাথা নত হইয়া আসে। সকলে হাত তুলিয়া তাহাদের নমস্কার করিল—তাহারা চারিজনও নত হইয়া প্রতি নমস্কার জানাইল।

বছর বাইশের ছেলেটি একটু হাসিয়া বলিল, এলাম।

রাজকুমার উজ্জ্বল চক্ষে তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল। প্রচারের কাজে এমনি দৃঢ় সৌম্যদর্শন যুবকদেরই বাছিয়া লওয়া চাই। উহাদের মুখে-চোখে সরলতা, সহৃদয়তার ছাপ স্পষ্ট হইয়া আছে। দলপতির কথা শুনিয়া রাজকুমারের মন খুসীতে ভরিয়া গেল, এ যেন সত্যই 'আসা'—যাহাকে বলা যায় আবির্ভাব। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিত হাস্যে সে বলিয়া উঠিল, আপনারাই ?

দলপতি তাহার একতারাটায় একবার ঝঙ্কার তুলিল, মাথা নাড়িয়া একটু হাসিল কিন্তু কোন কথা বলিল না।

পরাণ তাহাদের আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, ভেতরে এস চারণের দল।

চারণের দল তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। দলপতি উজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনিই দাদু ?

রাজকুমার মাথা নাড়িয়া হাসিয়া উত্তর করিল, সর্দার পাগল।

দলপতি বলিল, পাগলদের জয় হোক্। পরমুহূর্ত্তে সে তাহার সুমধুর কণ্ঠে গান ধরিল—

"আর কতকাল থাক্‌বি বসে,
জ্বালিয়ে চিতা, পাগ্‌লা ভোলা ;
এমন বাঁচার চেয়ে মরণ ভাল,
দে দোল্, দে দোল্ প্রলয় দোলা।"

সকলে ভিতরে প্রবেশ করিল। দলপতির নাম সোমেশ্বর। চৌকিতে একতারাটি রাখিয়া বসিতে বসিতে সে বলিল, গ্রামগুলো সব ঘুমিয়ে আছে। একটা বড় রকম পাগলের দল চাই এদের জাগাতে।

পরাণ হাসিয়া বলিলেন, তাই বুঝি টুপি মাথায়, একতারা হাতে বেরিয়ে পড়েছ ভাই ? তোমরা থাকতে দেশের ভয় কি!

সোমেশ্বর হাসিল, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যথিত স্বরে বলিল, ভয় যে আমাদেরই দাদু। ঘুম ভাঙ্গাতে এসে আমরা বহু দলে লাঠালাঠি করি, ওরা হত বুদ্ধি হয়ে যায়; পথ না পেয়ে আরও অন্ধকারে আত্মগোপন করতে চায়। ভাবে, এ লাঠির ঘা খাবার চেয়ে ঘুমানো অনেক ভাল।

তাহার কথা শুনিতে শুনিতে পরাণ বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, ম্লান ভাবে বলিলেন, না বুঝে না শিখে শুধু পেছনের ইঙ্গিতে চলি বলেই ত' আমাদের এই দশা।

সোমেশ্বর একতারাটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, ফাঁকি দিয়ে নেতা হবার চেষ্টায় কেউ পেছিয়ে নেই। আজ যে ধনী, কূটচক্রী—সেই নেতা। সারা জীবন জাতীয় পতাকা ঘাড়ে নিয়ে যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে সে পথেই পড়ে থাক্‌বে—লাখো টাকার জোর যার সেই পাবে নেতার গদি।

পরাণ ম্লান ভাবেই বলিলেন, এ যে কর্ত্তা ভজার দেশ। তোষামোদ করবার মত কাকেও না পেলে আমাদের চলেই না। আমাদের অনেকের অবচেতন মনেই বিলাসের স্রোতে গা ঢেলে দেবার ইচ্ছে ষোল আনা। আত্মত্যাগের প্রতি বিস্ময় হয়ত' আমাদের আছে কিন্তু ভালবাসা নেই—ভালবাসি ধনীর রথচক্রকে।

ঘরের আবহাওয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। উহাদের সমস্ত কথা মন দিয়া সকলেই শুনিতেছিল। এতক্ষণে রাজকুমার বলিল, রাজনীতিতে কূটচক্রীর দরকার ত' আছেই দাদু—মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ তার প্রমাণ।

সোমেশ্বরের একতারাটা একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দাদু বলিলেন, আছে বই কি। কিন্তু সেই চক্রীর শক্তি থাকাও চাই ভাই। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ শুধু কূটচক্রেই কাজ শেষ করেন নি, তাঁর সুদর্শন চক্রও ছিল, আর ছিল ভীমার্জ্জুন, অভিমন্যু-ঘটোৎকোচ। আমাদের চক্রীরা শুধু চক্রান্ত করতেই পারদর্শী, ক্ষমতা কিছু নেই বলে সেই চক্রান্ত শুধু দলাদলির মধ্যেই থাকে সীমাবদ্ধ।

পরম শ্রদ্ধায় সোমেশ্বরের মন ভরিয়া গেল, ধীরে ধীরে সে বলিল, আপনি সত্যই দাদু—মন দিয়ে দেখেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন।

দাদু হাসিয়া বলিলেন, এইবার প্রশংসা আরম্ভ করবে বুঝি?

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবে আপনারা কাজ আরম্ভ করবেন?

সোমেশ্বর বলিল, আমরা চারজনে দু'টো দলে ভাগ হয়ে গ্রামে গ্রামে বাউল গেয়ে বেড়াব—তার মধ্যে থাকবে আমাদের চারণ কবিদের মত দেশের বীরত্বের ইতিহাস, থাকবে বিদেশীর অত্যাচারের কাহিনী, দেশের ডাক—ঘুমভাঙ্গার গান। বলিতে বলিতে সোমেশ্বরের মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—

জানালা দিয়া বহু দূরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে বলিয়া চলিল, রাজপুতানার পাহাড়ে পাহাড়ে সেই চারণ কবিদের জাগরণী গান, চিতোরের আকাশে বাতাসে বীর্য্যের সুর দুর্দ্ধর্ষ মোগলের পথ রোধ করেছিল। পারবে না সে সুর অত্যাচারীর গর্ব্বকে খর্ব্ব করতে? সমুদ্রের মত্ত তরঙ্গ ত' বিরাট রণতরী-কেও টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলে—সে তরঙ্গ কি আর উঠবে না? সোমেশ্বর জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিল, তাহার চক্ষে কোন্ স্বপ্ন রাজ্যের আলো-ছায়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

ঘরের মধ্যে একটা থম্‌থমে ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। একটু ইতস্তত করিয়া বার দুই কাশিয়া দেবু জিজ্ঞাসা করিল, ভারতবর্ষে গ্রামের ত' অভাব নেই, আপনাদের কয়েকজনের চেষ্টায় কি তার কাজ এগোবে?

সোমেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, কাজ আমাদের অনেক, সংখ্যায়ও আমরা কম অস্বীকার করিনে। কিন্তু তাই বলে নিজের কাজটুকু না করে পেছিয়ে থাকব কেন? আমাদের দেখে আমাদেরই পথে আরও অনেকে এগিয়ে আসবে এই আমাদের বিশ্বাস।

পরাণ মাথা নাড়িয়া তাহার কথার সমর্থন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, মানসিক শক্তি বাড়াবার ইন্ধন আমাদের চাই। মনই আমাদের ভেঙ্গে গেছে, তাকে জোড়া দিতে হবে, জাগাতে হবে—সেই জাগ্রত মনকেই শক্তিশালী করা সম্ভব।

সোমেশ্বর বলিল, এই জোড়া দেবার কাজেই আমরা বেরিয়েছি। বাউলের ভেতর দিয়ে, কথকতার ভেতর দিয়ে জানাতে হবে যে আমরা কি ছিলাম, কি হয়েছি। জানাতে হবে তার কারণ, দেখাতে হবে সেই পথ যা আমাদের গৌরবকে অরও উজ্জ্বল করে ফিরিয়ে আনবে। আমাদের সঙ্গী হবেন দাদু?

দাদু মৃদু হাসিয়া সোমেশ্বরের একতারাটায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, আমি ত' পা বাড়িয়েই আছি। বহু দিন এই গ্রামের মধ্যে এমনি দিনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে সব ভুলে যাচ্ছিলাম। রাজকুমার আর সতী দিদি আমার হারিয়ে যাওয়া আশাকে জাগিয়ে তুলেছে—তোমরা আমায় পথে বের করবে এ আর আশ্চর্য্য কি?

সোমেশ্বর সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, দশ-বিশটা গ্রামের মধ্যে যদি আপনার মত একটা দাদুও থাকে ত' গ্রামগুলো বেঁচে যায়।

বৃদ্ধ হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, নাতির দল প্রশংসা করতেও জানে দেখছি। বুড়োর মন কিন্তু ঝুনো হয়ে গেছে—গলে যাবার সম্ভাবনা নেই।

সকলেই প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিল।

এমন সময় ধীর পায়ে সতী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে ইহাদের সমস্ত সন্ধানই রাখে, মাঝে মাঝে দাদুকে এড়াইয়া সে ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যায়। নূতন দলের আগমন সংবাদ সে পাইয়াছে, তাই দাদুর দিবা নিদ্রার অবসরে সমস্ত চিন্তাকে দূরে ঠেলিয়া সে আসিয়া উপস্থিত হইল সঙ্ঘের গৃহে। বৃদ্ধ হাত বাড়াইয়া বলিলেন, এস দিদি।

সেই দিকে আগাইয়া গিয়া সতী বলিল, এখনও শুধু কথাই বলছেন—কারও খিদে পায় না বুঝি?

রাজকুমার লজ্জিত হইয়া বলিল, তাই ত' এঁরা অনেক দূর থেকে এসেছেন—খিদে পাবার কথাই ত'।

পরাণ সস্নেহ দৃষ্টিতে সতীর দিকে চাহিয়া বলিল, পাগলের দলে এক একটা জগতের মানুষ থাকা ভাল কি বল সতী দিদি?

ম্লান ভাবে সতী উত্তর করিল, আমায় যে দল ছাড়া করেছে দাদু।

বড় ব্যথায় মিশানো প্রসঙ্গ, আর ইহা উত্থাপন করা যায় না। পরাণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এবার ওঠ সব, নইলে আমার সতী দিদি রাগ করবে। আমার বাড়ীতেই যখন নূতন বন্ধুদের ব্যবস্থা হয়েছে—তখন আমিই ডাকছি তোমাদের, চল।

সকলেই হাসিমুখে উঠিয়া পড়িল।

*

* *

গ্রামে গ্রামে প্রচার চলিতে লাগিল। প্রতি গ্রামের কৃষকেরা চঞ্চল হইয়া উঠিল—আবার ভাই ভাই হাত মিলাইবার ডাক আসিয়াছে। মনের মধ্যে সেই ডাক ত' প্রতিনিয়তই আসিতেছে, পরস্পরকে পূর্ব্বের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া, হুঁকায় ছিলিমের পর ছিলিম পুড়াইয়া আসর জমাইয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেকের মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে বই কি! কিন্তু ভরসা নাই, আল্লা আর ঈশ্বর পৃথক হইয়া গেছে। জ্ঞানীদের মুখের কথা সাধারণ লোক হইয়া তাহারা অবিশ্বাস করিবে কি করিয়া ?

রফিকের দলও কাজে লাগিয়া গিয়াছে। জমিদার রহিয়াছেন তাহাদের পশ্চাতে, সুতরাং ভয় কাহাকেও নাই। মানুষগুলিকে দুইটা ভাগ করিয়া দিয়া তবে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইবে। রফিক আর মহেন্দ্র, জমিদার আর রাজকুমার-পরাণ। পার্থক্য চাই, ভেদ চাই—ছোট বড়র একটা দাগ টানিয়া দিতে হইবেই।

জমিদারের চেষ্টায় ইয়াসিন্‌কে হত্যা করিয়াও রফিক বাঁচিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আইনের বিচারে বাঁচিলেও মানুষের মনের বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। ইয়াসিনের ভক্তরা তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল,

তাহার সমস্ত কাজে বাধা দিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর। কেহ কাহারও সহিত হাত মিলাইবে না। অযোধ্যায়, কিষ্কিন্ধ্যায়, লঙ্কায়—কোথায় এই ভেদ ছিল না? রামায়ণ-মহাভারতই বা পথ দেখাইতে পারিল কই ?

একদিন এক সভায় সোমেশ্বর যখন দেশের কোন এক সমস্যার কথা সমাগত ব্যক্তিদের বুঝাইয়া বলিতেছিল তখন রফিকের দল চড়াও হইয়া আসিল। মহেন্দ্র ঠাণ্ডা মানুষ নহে, পরাণ-রাজকুমারের হাত ধরিয়া সে পথে নামিয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু রক্তে তাহার আগুনের নেশা পূরা মাত্রায় বিদ্যমান। রফিকের দলের শয়তানির সন্ধান সে রাখিত। সুতরাং দলবল লইয়া সেও আসিয়া দেখা দিল ঘটনাস্থলে।

রাজকুমার ছুটিয়া আসিয়া মহেন্দ্রর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কাজে বাধা দিয়ো না মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, কাজের পথ আজ সাফ করে দেব।

রাজকুমার শান্ত স্বরেই উত্তর করিল, তুমি যাকে পথ সাফ করা বলে ভাবছ সে যে পথে কত বড় প্রাচীর তুলে দেবে তা' তুমি জান না। ইয়াসিনের রক্ত শয়তানের থেকে মানুষকে আলাদা করেছে, আমাদের রক্ত মানুষগুলোকে দানা বাঁধিয়ে এক করবে ভাই।

মহেন্দ্র শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, তোমাদের রক্ত ?

কোথায় মহেন্দ্রর ঘা তাহা রাজকুমার জানে। মুখের উপর দিয়া একটা ম্লান হাসির রেখা ভাসিয়া গেল। ভালবাসা কত না শক্তিশালী! মহেন্দ্রর মনে আজ যে ভালবাসা একদিক ঘেঁসিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সকল দিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই রাজকুমারের জয়। রাজকুমারকে জয়লাভ করিতেই হইবে। মহেন্দ্রর দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরাইয়া রাজকুমার

মিনতি করিয়া বলিল, লাঠি ধরার সময় আজও আসেনি—ওটা ছাড়। যদি না পার তবে আমাদের ছেড়ে দাও।

মহেন্দ্রর চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল, ম্লানভাবে সে বলিল, আপনাদের মাথা বাঁচাবার জন্যে লাঠি ধরতে পারব না ?

রাজকুমার দৃঢ় স্বরে উত্তর করিল, না। জমিদারী রক্ষা করতে তোমরা লাঠি ধরেছিলে একদিন, তাই জমিদারের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষের অভিশাপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আমাদের মাথা বাঁচাতে লাঠি যদি ধর তবে সমস্ত মানুষের অভিশাপ ঠিক ওই একই উপায়ে নেমে আসবে আমাদেরও মাথার ওপর। কেন আমাদের ক্ষতি করবে মহেন্দ্র ?

মহেন্দ্রর হাত হইতে লাঠি পড়িয়া গেল। রক্ষা করিতে গিয়া মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে সে কুমারদার, পণ্ডিত মশায়ের ? এমন কথা সে শোনে নাই। উহারা অনেক বই পড়িয়া ফেলিয়াছে, উহাদের কথা ত' মিথ্যা হইবার নহে। জমিদারের বিরুদ্ধে সত্যই ত' সমস্ত মানুষের অভিশাপ আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে—তাহারা নিজেরাও ত' যোগ দিয়াছে তাহার সহিত। না, আর সে লাঠি ধরিবে না। বাঁচিয়া থাকুক কুমারদা, পণ্ডিত মশাই—বাঁচাইয়া তুলুক তাঁহারা মানুষগুলিকে।

মহেন্দ্রদের আসিতে দেখিয়া রফিকের দলও পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছিল। মহেন্দ্রর লাঠির জোর তাহার জানা আছে, বিশেষ করিয়া ইয়াসিন্‌কে হত্যার জন্য তাহার দলেও যে ভাঙ্গন ধরিয়া গেছে। কিন্তু সম্মুখ হইতে এই পলায়ন তাহাকে গোপনতার পথে লইয়া গেল।

একদিন পরাণের দল যখন এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতেছিল তখন তাহাদের বাধা দিল রফিক। আজ নিকটে বাধাস্বরূপ মহেন্দ্র নাই, তাহার অপকার্য্য দেখিবার সাক্ষীও কেহ নাই। অন্ধকার রাত্রি

দেখিয়া আকাশে তারাগুলি পর্য্যন্ত উঠে নাই। রফিকের সুবিধা বই অসুবিধা হইল না। কেহ কোথা হইতে দেখিতে পাইতেছে না বুঝিয়া সে তাহার কাজ সারিয়া গেল।

পরাণেরা সকলেই আহত হইলেন। বোধ হয় ইহাদের একটু শিক্ষা দিবার আদেশই দিয়াছিলেন যদু ঘোষাল। তাই কেহই প্রাণে মরিল না। তবে পরাণের উপর আঘাতটা কিছু বেশী হইয়াছিল—বৃদ্ধ বয়সে অনায়াসে এতবড় আঘাত সহ্য করা সম্ভব নয়। তিনি সারিয়া উঠিলেন বটে কিন্তু চক্ষু দুইটি হারাইলেন। দেহের শক্তিও যেন অনেকখানি কমিয়া গেল।

*　　*　　*　　*

## ৩

রাজকুমার একমনে একটা বই পড়িতেছিল। সতী কোথা হইতে অকস্মাৎ ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিয়া বইটা টানিয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। এ রকম ব্যবহার সে কোন দিন করে নাই। রাজকুমার অতি বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু চাহিয়াই চমকিয়া গেল, উজ্জ্বল মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গেছে।

ক্ষণকাল সেইভাবে চাহিয়া থাকিয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে ?

আর কিছু বলিতে হইল না। সতীর দুই চক্ষু বাহিয়া অজস্রধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল—এমন করিয়া সে আর কোন দিন কাঁদে নাই।

রাজকুমার অস্থির হইয়া উঠিল, চক্ষু মুছাইয়া দিবার জন্য সে তাহার হাত ধরিয়া নিকটে আকর্ষণ করিল। সতী একেবারে রাজকুমারের কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তাহাকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। রাজকুমার কিছুই বুঝিতে পারিল না, কি করিবে তাহাও স্থির করিতে না পারিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ সেইভাবেই কাটিয়া গেল। রাজকুমার জোর করিয়া সতীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হল সতী ? তাহার গলাটাও যেন তাহার অজ্ঞাতসারেই একটু কাঁপিয়া গেল।

সতীর চক্ষু পুনরায় জলে ভরিয়া গেল। কোন রকমে নিজেকে সংযত করিয়া সে বলিল, আমাকে ধরে রাখতে পার না কুমারদা ?

রাজকুমারের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সতী যাইতেই ত' বসিয়াছে—একেবারেই চলিয়া যাইবে না কি? সতীর কথাটা ঠিকমত ধরিতে না পারিয়া সে তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সতী ছল্‌ছল্‌ চক্ষে বলিল, আমাকে তোমার কাছে রেখে দাও, জোর করে রেখে দাও।

সতীর কপালের পাশ দিয়া কয়েক গোছা চুল চক্ষের পাশে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেগুলি সযত্নে সরাইয়া দিয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, কে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে ?

কুমারের একটা হাত দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সতী বলিল, দাদাম'শায় এসেছেন ক'লকাতা থেকে—আমাকে নিয়ে যাবেন।

রাজকুমারের বুকে কে যেন হাতুড়ীর ঘা' বসাইয়া দিল—স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া উঠিল। সতীকে তাহার কিসের প্রয়োজন তাহা সে জানে না, কিন্তু সে চলিয়া গেলেও তাহার চলিবে না। রাজকুমার জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, তোমার যাওয়া হবে না, কিছুতেই হবে না—তুমি চলে গেলে—না, তা' হয় না।

সতীও ব্যাকুল স্বরে মাথা নাড়িয়া বলিল, তাই কর আমাকে যেতে দিও না।

যুবক ও কিশোরীর আবেগ কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া অন্নপূর্ণা তাহাদের নিকটে আসিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। এই উচ্ছ্বাসের স্বরূপ যে তিনি না জানেন এমন নয়। এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা তিনি পূর্ব্বেই কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। আজ ইহাদের বাধা দিবার শক্তি কাহারও

নাই। একটু কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিবার নামে উহাদের সচেতন করিয়া তিনি বলিলেন, কোথায় যেতে দেবে না মা ?

যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত করিয়া সতী অন্নপূর্ণার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল, তাহার চক্ষে তখনও জল চিক্ চিক্ করিতেছে। ম্লানভাবে সে উত্তর করিল, আমি এখানেই থাকতে চাই কাকীমা, আমাকে ক'লকাতায় যেতে দিও না।

অন্নপূর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ক'লকাতায় লেখাপড়া শিখতে পাবে, সে ত' ভালই।

সতী মুহূর্তের জন্য রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর পুনরায় অন্নপূর্ণার দিকে ফিরিয়া বলিল, এখানেও ত' লেখাপড়া হয়, কুমারদা আছে, দাদু আছেন।

জননী মৃদু হাসিলেন, সে হাসিতে বিষাদের ছাপই ফুটিয়া উঠিল, সতীকে কতকটা ভরসা দিয়াই তিনি বলিলেন, দুঃখ কি মা, কত নূতন নূতন জিনিষ রোজ সেখানে দেখতে পাবে। কলকাতা যে মস্ত সহর !

মস্ত সহরে এতটুকু সতী যে হারাইয়া যাইবে। সতী তাহা চাহে না, রাজকুমারেরও সে-কল্পনা অসহ্য। সতী এই ছোট্ট গ্রামে থাকিয়াই আনন্দে জীবন কাটাইয়া দিতে চাহে। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, গ্রামই ভাল কাকীমা।

সমস্ত ব্যথা কাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে অন্নপূর্ণা তাহা জানিতেন। এই কিশোরীর অন্তরের এই দিকটা তাঁহার নিকট ঢাকা ছিল না—কিন্তু এমন পরিষ্কার রূপে ধরাও কোন দিন পড়ে নাই। কিশোর বয়সের এই শ্রদ্ধা-প্রীতি ভবিষ্যতে যে কি রূপ ধরিয়া দেখা দিবে তাহা স্পষ্ট চক্ষে তিনি

দেখিতে পাইতেছিলেন। উহাকে দুই হাত পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইবারও উপায় নাই , আবার ঠেলিয়া দেওয়াও ত' চলে না।

রাজকুমারের কোন্ তন্ত্রীতে যেন ঘা পড়িয়াছিল। এই কিশোরীকে ছাড়িয়া থাকা তাহার নিজের পক্ষেও আর সম্ভব নহে বলিয়াই মনে হইতে-ছিল। ইহার কথা সে তেমন করিয়া কোন দিন ভাবিয়া দেখে নাই, উহাকে ছাড়িয়া থাকিবার কথা কোন দিন মনেও উদয় হয় নাই। জল বাতাসের মতই সে তাহার জীবনে একান্ত সহজ ছিল। আজ উহার যাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে লইয়া যাইবে। রাজকুমারের বুকের মধ্যে কাহারা যেন দল বাঁধিয়া একসঙ্গে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, না ইহা হইতেই পারে না। অন্তরের মধ্যে যেন একটা নাড়া খাইয়া সে বলিল, তুমি এখানেই থাকবে সতী।

অন্নপূর্ণা চক্ষের জল সামলাইলেন। তাহাদের সমস্ত ইচ্ছাকে মুহূর্ত্তেই বাতাসে উড়াইয়া দিবে। তিনি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, নিজে ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই সে-স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বাহিরে কে যেন গম্ভীর স্বরে ডাকিল, সতী।

সতী ও রাজকুমার চমকিয়া উঠিল।

পুনরায় সেই স্বর শোনা গেল, আর দেরি কর না দিদি, এস।

সতী বিষাদ পূর্ণ চক্ষে ফিস্ ফিস্ করিয়া কতকটা আপন মনেই বলিল, দাদু।

তাহার অশ্রু আর বাধা মানিল না। অকস্মাৎ সে রাজকুমারের হাত দুইটা ক্ষণকালের জন্য মুখে চাপিয়া ধরিল, তারপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, ধরে রাখতে পারলে না কুমারদা ?

রাজকুমার কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, দূরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

যদু ঘোষাল পুনরায় ডাকিলেন, গাড়ীর সময় হয়ে এল দিদি, বেরিয়ে এস।

সতী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, শাড়ীর আঁচলের আড়াল হইতে দুইটা খাতা বাহির করিয়া রাজকুমারের হাতে দিয়া বলিল, এ দুটো তোমার কাছেই থাক কুমারদা।

রাজকুমার খাতা দুইটা হাতে লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

ওই বয়সেও এই দৃষ্টির অর্থ সতী বুঝিল, ম্লান ভাবে বলিল, পাঠশালার দিনে তোমার কাছে বসে বই না দেখে যে খাতা দুটো লিখেছিলাম, সে দুটো। আর কোন কথা না বলিয়া রাজকুমারকে প্রণাম করিয়া সতী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। রাজকুমার কোন কথা বলিতে পারিল না, সতীর গমন পথের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কের মত খাতার পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ হইল সতী বাহির হইয়া গিয়াছে, রাজকুমার তখনও সেই দিকে চাহিয়া—কোন কিছুতেই বোধ করি তাহার মন ছিল না। কতক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারে নাই। অকস্মাৎ মায়ের ডাকে সে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, সতী চলে গেল?

রাজকুমার কোন কথা না বলিয়া কেবল মাত্র ঘাড় নাড়িল। জননী পুত্রের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজকুমার খাতাগুলির দিকে চাহিল। গোটা গোটা হরফে খাতার পাতাগুলি ভরিয়া রহিয়াছে। রাজকুমার পড়িয়া দেখিল—'সদা সত্য কথা

বলিবে,' 'চুরি করা বড় দোষ।' সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খাতা দুইটা সযত্নে নিজের ভাঙ্গা কাঠের বাক্সে তুলিয়া রাখিল।

*

* *

সতী চলিয়া গিয়াছে। রাজকুমারের মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। সতী চলিয়া যাওয়ায় যে কেবলমাত্র কাজেরই ক্ষতি হইবে এমন নহে, মনের মধ্যেও কেমন যেন একটা দৈন্য সে অনুভব করিতেছে। একটু সান্ত্বনা লাভের জন্য সে পরাণের গৃহের দিকে চলিতে লাগিল।

সেই আঘাতের পর হইতে পরাণ অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, হাঁটিয়া বেড়াইতেও তাঁহার বেশ কষ্ট হইত। সেইজন্য তিনি আর গৃহ ছাড়িয়া বড় একটা বাহিরে আসিতেন না। সঙ্ঘের কাজ তাঁহার গৃহেই সমাধা হইত। অন্ধ পরাণ বোধ হয় ভবিষ্যতের অনেক কিছুই দেখিতে পাইতেন। থাকিয়া থাকিয়া কি যেন কান পাতিয়া শুনিতেন, অকস্মাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, তারা কি এসেছে?

এই তাহারা যে কাহারা তাহা শত সহস্রবার প্রশ্ন করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে জানিবার উপায় ছিল না, তিনি নিজেও হয়ত সে-সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তথাপি তাঁহার মনে এসম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না যে তাহারা একদিন আসিবেই।

পরাণ বিছানায় চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, কি যেন দেখিবার জন্য তাঁহার মুখে একটা গভীর আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমারের পদশব্দে তিনি চমকিয়া সেইদিকে চাহিয়া বলিলেন, এলে, তোমরা সবাই এলে? পরাণ উত্তেজনায় হাত দুইটা সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজকুমার পরাণের প্রসারিত হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বিছানায় বসাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না দাদু, চলে গেল।

পরাণ বোধ করি কাঁপিয়া উঠিলেন, বলিলেন, চলে গেল? চলে ত' যাবে না তারা। তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তোমার ভুল হয়েছে দাদা, চলে যাবার জন্যে ত' তারা আসবে না। তারা আসবে ঝড় তুলে, ঢেউ তুলে—সে ত' থাম্‌বে না। ধীরে ধীরে বেড়ে বেড়ে সব ধুয়ে নিয়ে যাবে, স—ব।

অন্ধ হইবার পর হইতে পরাণ এমনি অনেক কথাই বলিতেন যাহার অর্থ কেহই ধরিতে পারিত না। অন্তরের কোন্ স্বপ্নকে তিনি এই কথার ভিতর দিয়া রূপ দিতেন তাহা কে বলিতে পারে!

রাজকুমার বলিল, সতীকে আজ কলকাতায় নিয়ে গেল দাদু।

পরাণ মুখ ফিরাইলেন, চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিলেন, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, কি করেই বা রাখবে বল? ঝড় তোলার কাজ ত' বেদেদের, যাদের কোথাও কেউ নেই—আর যদি থাকেই ত' মরবে সে না খেয়ে। ধনী সখ মেটাতে পারে, আত্মহত্যা করতে পারে না। সতী-মাকে পথ ছেড়ে দেওয়া ত' যদু ঘোষালের আত্মহত্যার মতই। পরাণ আপন মনেই মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল।

রাজকুমার বলিল, সতী চলে যাওয়ায় কাজের কিছুটা অসুবিধা হল দাদু।

পরাণ বলিলেন, কাজের সুবিধেই চিরকাল হয় না ভাই—অসুবিধার ভিতর দিয়েই পথ কেটে কেটে চলতে হয়। বাঁধা পথে চলা সহজ হতে পারে, কিন্তু নিজের হাতে কাটা পথে চলেই আনন্দ।

রাজকুমার বলিল, শক্তি কোথায় এত'?

পরাণ মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, শক্তি যার নেই এ পথ তার নয়। সংশয়ের স্থান নেই—সমস্ত বিপদকে বরণ করে নিতে হবে, কিন্তু তার জন্যে কোন প্রশংসাও নেই। এ পথটা বড় অদ্ভুত, না আছে আরাম না আছে যশ। তারপর একটু থামিয়া রাজকুমারকে স্পর্শ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, তবে খু—ব শান্তি আছে, আছে মনের আনন্দ। মনটা যেন আপনা আপনি খুব বড় হয়ে ওঠে ভাই, সমস্ত পৃথিবীটা তার মধ্যে তখন স্থান পায়, বোধ হয় আকাশও ছুঁতে পারে।

রাজকুমার বলিল, আমার মনও যেন আকাশ ছুঁতে পারে আর্শীর্বাদ করুন।

পরাণ হাসিয়া বলিলেন, অশীর্ব্বাদের কোন শক্তি নেই। শক্তি আছে তোমার মনে। মন দিয়ে দেখবার শিক্ষাই সব চেয়ে বড় শিক্ষা। ভালবেসো সকলকে—এইত' চরম কথা।

রাজকুমার ম্লান ভাবে বলিল, ভালবাসার শিক্ষা আমার কিছু নেই।

পরাণ একটু নড়িয়া বসিয়া বলিলেন, শিক্ষা? ইয়াসিনের কথা মনে করে দেখ। কি শিক্ষা তার ছিল? মানুষে মানুষে ভেদ নেই এই বোধ-টুকুই তাকে জিতিয়ে দিল। ইয়াসিন যদি আমাদের শিক্ষা না দিয়ে থাকে ত' কে দেবে!

রাজকুমার আর কোন কথা বলিল না, অন্যমনস্কের মত বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। পরাণও আর কোন কথা বলিলেন না, মৃদু মৃদু মাথা নাড়িতে লাগিলেন মাত্র।

প্রায় মাস খানেক কাটিয়া গিয়াছে। সতীর কোন সংবাদ আসে নাই—রাজকুমার বইয়ের পাতায় কিছুতেই মন বসাইতে পারিতেছিল না। সতীর সংবাদ লইবার জন্য, তাহাকে চিঠি লিখিবার জন্য মাঝে মাঝে মনের মধ্যে

একটা অদম্য ইচ্ছা জাগে। কিন্তু কিছুতেই তাহা পারে না, কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে। সতীই বা কেমন করিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছে! সে কি তাহার কুমারদাকে একেবারে ভুলিয়া গেল! কলিকাতা কি মানুষকে এমনি করিয়াই গ্রাস করে! না, তাহা হইতে পারে না, রাজকুমার কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না যে সতী তাহাকে ভুলিয়াছে।

হাতের বইটা লইয়া সে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। এইটা সে অনেক বার পড়িয়াছে---খুব ভাল লাগিয়াছে তাহার বইটা, নিজে পড়িয়াছে, সতীকে পড়িয়া শুনাইয়াছে। কিন্তু আজ বইটা কিছুতেই তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছিল না--বরং বেশী করিয়া সতীর কথা মনে করাইয়া দিতেছিল।

মা আসিয়া বলিলেন, খেয়ে নিয়ে পড়তে বস বাবা।

রাজকুমার একটু চমকিয়া গেল, তারপর ম্লান ভাবে বলিল, আর একটু পরে মা।

মাতা পুত্রের মন দর্পণের ন্যায় দেখিতে পাইতেছিলেন, তাই আর কোন কথা না বলিয়া একটা নিশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন। রাজ-কুমার পুনরায় বইয়ে মন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ সদর দরজার বাহিরে ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে পরাণ ডাকিয়া উঠিলেন, দাদু, দাদু—শিগগীর ভাই।

রাজকুমারের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সেই ব্যাকুল কণ্ঠ যেন কাহাদের আগমন বার্ত্তা তাহাকে শুনাইয়া দিল—মনে হইল দাদু যাহা-দের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহারা যেন আসিয়াছে। আসিয়াছে দুর্দ্দমনীয় ভাবে সমস্ত কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইতে। মুহূর্ত্তে রাজকুমারের জড়তা কাটিয়া গেল, হাতের বই ফেলিয়া দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। যাঁহার

হাঁটিতে কষ্ট হয় তিনি যে-আবেগের টানে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছেন সেই আবেগ তাহাকেও স্পর্শ করিল।

উত্তেজিত পরাণ পুনরায় ব্যাকুলভাবে ডাকিলেন, দেরি করো না ভাই—সব চলে যেতে দিও না, বেরিয়ে পড়—ডাক এসেছে। তাঁহার গলার স্বর কাঁপিয়া কাঁপিয়া যাইতে লাগিল।

রাজকুমার ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। পরাণ বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন—উত্তেজনায় তাঁহার দেহ মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, যে লাঠি ভর দিয়া তিনি অতিকষ্টে হাঁটিতে পারেন সেই লাঠিটা পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি ধ্যানস্থের মত তাঁহার অন্ধ চক্ষু দুইটি সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া কি যেন দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

রাজকুমার পরাণের ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এসেছি দাদু।

পরাণ বোধ করি তখনও স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, এসেছ ভাই, চল—ওদের সঙ্গে চল।

রাজকুমার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কাদের সঙ্গে যাব?

পরাণ মাথা ঝাঁকাইয়া বলিলেন, দেখতে পাচ্ছ না তারা এসেছে—শুনতে পাচ্ছ না তাদের ডাক?

রাজকুমার পরাণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ডাক শুনিবার আগ্রহে বৃদ্ধ বোধ করি স্বপ্নের দেশে চলিয়া গিয়াছেন। হয়ত'—রাজকুমার ভাবিতে পারিল না, সকলে মিলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া গেলে তাহার চলিবে কেন?

পরাণ কান পাতিয়া কি যেন শুনিবার চেষ্টা করিলেন, তারপর রাজকুমারের হাত নাড়িয়া দিয়া বলিলেন, চল, এগিয়ে চল—ওদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসি চল।

রাজকুমারও কান পাতিয়া রহিল, এতক্ষণে মনে হইল বহু দূরে কোথায়

যেন কি হইতেছে, তাহারই একটা মৃদু আভাস বাতাসের মধ্য দিয়া ধরা পড়িতেছে। রাজকুমার সোজা হইয়া দাঁড়াইল, দাদুর স্বপ্ন বোধ হয় সফল হইতে চলিয়াছে—বুকের মধ্যে পুরাদমে নিশ্বাস লইয়া সে বলিল, আপনি অপেক্ষা করুন আমি দেখে আসি তারা সত্যিই এলো কি না।

পরাণ জোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, আমিও যাব।

রাজকুমার পরাণের দিকে চাহিয়া বলিল, লাঠি না নিয়ে পথ চলবেন কি করে?

পরাণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, লাঠির চেয়েও বেশী জোর পেয়েছি আজ মনে।

আর কোন কথা না বলিয়া তাহারা হাঁটিতে আরম্ভ করিল—পরাণের একটা হাত তখনও রাজকুমারের হাতের মধ্যে ধরা ছিল।

বেশী দূর যাইতে হইল না। একটা শোভাযাত্রা মন্থর গতিতে আগাইয়া আসিতেছে। রাজকুমার সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রহিয়াছে একটি তরুণী, তাহার রূপের ছটায় বোধ হয় সমস্ত জনতা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। রাজকুমারও বিস্মিত ভাবে বার বার চাহিয়া দেখিল। তরুণীটিও এই অতি সুন্দর তরুণটির দিকে দৃষ্টি না ফিরাইয়া পারিল না।

শোভাযাত্রা নিকটে আসিয়া পড়িল, গাঁয়ের আরও অনেকে ভীড় করিয়া আসিয়াছে—কোথায় যেন ঝড় উঠিয়াছে, তাহারই ঝাপ্টা গাঁয়ে লাগিল বলিয়া। এই এতগুলি লোকের সম্মুখে, বিশেষ করিয়া ওই পরম রূপবান যুবকটির সম্মুখে তরুণীটি না থামিয়া পারিল না। হাত তুলিয়া শোভাযাত্রাকে সে থামিতে ইঙ্গিত করিল।

শোভাযাত্রার সম্মুখের সারি থামিয়া গেলেও পশ্চাৎ হইতে চাপ পড়িতে

লাগিল—ভিতরের অংশ যেন ঝড়ে কম্পমান বৃক্ষশাখার ন্যায় দুলিতেছে। শোভাযাত্রা জনতায় পরিণত হইয়া উঠিল।

নেতৃবৃন্দ জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বৃথা—তাহারা কথা শুনিতে চাহে না, থামিয়া থাকিতে চাহে না। চলার প্রয়োজন কি তাহা তাহারা বোঝে না—কেবল নেশাগ্রস্ত হইয়া পথ চলে।

রাজকুমার সেইদিকে চাহিয়া বলিল, এ যে জনতা হয়ে উঠল, এরা কি করবে?

কে একজন বলিয়া উঠিল, ভিতরের আবেগ এদের উত্তেজিত করেছে—কাজ শেষ না করে এরা তাই থামতে চায় না। ওরা যে সৈনিক!

জনতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছিল—সারি ভাঙ্গিয়া গেল, সকলেই এক-সঙ্গে আগাইয়া আসিয়া দেখিতে চায় থামিবার কারণ কি। নেতারা সারি ঠিক রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে সামান্য ধাক্কা-ধাক্কিও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

রাজকুমার সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া শান্ত ভাবে বলিল, সৈনিকেরা বোধ হয় এবার সেনাপতিদের আক্রমণ করবে।

কোন উপায় না দেখিয়া নেতাদের একজন তরুণীটিকে বলিল, আপনিই শেষ চেষ্টা করে দেখুন সুরভী দেবী।

নিকটেই একটা উঁচু স্থান ছিল—বোধ হয় পুরানো দিনের কোন এক দরিদ্র কৃষকের ভিটা। কয়েকজন তরুণ ব্যস্ত হইয়া পথ দেখাইয়া সুরভীকে সেইখানে লইয়া গেল। সুরভী সেই স্থানটায় উঠিয়া সমস্ত জনতার দিকে চাহিয়া দেখিল, রূপের একটা হিল্লোল তুলিয়া হাত নাড়িয়া সে সকলকে শান্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। জনতা কি বুঝিল কে জানে—সকলে জোরে জোরে করতালি দিয়া উঠিল।

সুরভী রুমাল বাহির করিয়া একবার মুখটা মুছিল, করতালি ধ্বনি কমিয়া আসিলে গলা পরিস্কার করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, বন্ধুগণ, আজ আমরা··· তাহার আর কোন কথা শোনা গেল না—পুনরায় করতালি ধ্বনিতে সমস্ত চাপা পড়িয়া গেল।

সুরভী নামিয়া আসিল—তাহার কোন কথা শুনিতে না পাইলেও কেবল-মাত্র তাহাকে দেখিয়াই জনতা অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছিল।

রাজকুমার ও পরাণের পিছন হইতে কে যেন স্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, উচ্ছৃঙ্খল জনতা নিয়ে কোথায় যুদ্ধে চলেছেন সুরভী দেবী?

সুরভী, রাজকুমার, পরাণ সকলেই সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিল। রাজকুমারের হাতে একটা চাপ দিয়া পরম খুসীতে পরাণ বলিয়া উঠিলেন, সোমেশ্বর না?

সুরভী বিস্মিত ভাবে কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া বলিল, আপনি!

রাজকুমার কোন কথা না বলিয়া সেই দিকে একটা হাত বাড়াইয়া দিল।

গেরুয়া আলখাল্লা পরিহিত সোমেশ্বর আগাইয়া আসিয়া রাজকুমারের হাত ধরিল, পরাণের দিকে ফিরিয়া বলিল, কেন্দুয়া থেকে আমি এইমাত্র এসেছি দাদু। তারপর সুরভীর দিকে ফিরিয়া পুনরায় সে প্রশ্ন করিল, কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম?

সুরভী মৃদু হাসিয়া বলিল, রাজার বিরুদ্ধে আর তার প্রতিভূ জমিদারের বিরুদ্ধেও। গাঁয়ের লোকদের সোজা করে আমাদের কথাগুলো বোঝাবার জন্যেই বেরিয়েছি আমরা।

শান্ত ভাবে সোমেশ্বর বলিল, তাই এই বাঁকা পথে এলেন বুঝি?

সুরভী কথাটা বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার জন্য মাথাও ঘামাইল না।

শোভাযাত্রা পুনরায় ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিতেছিল। অনেকদূর হইতে সকলে হাঁটিয়া আসিতেছে। সুরভী কোনদিন এতখানি পথ হাঁটে নাই, চলিতে চলিতেই একটু হাসিয়া বলিল, আঙ্গুলগুলো ব্যথা হয়ে গেল—দু'চার দিন বোধ হয় আর নড়াচড়া করা যাবে না।

একটি যুবক আগাইয়া আসিয়া বলিল, জুতো জোড়া খুলে দিন্ না, খালি পায়ে হাঁটলে আঙ্গুলের ব্যথা সেরে যাবে।

স্নিগ্ধ চক্ষে সেই দিকে চাহিয়া সুরভী বলিল, খালি পায়ে হাঁটা, বাবাঃ, সে আমায় কেটে ফেললেও হবে না।

পরাণের মুখের হাসি সম্পূর্ণ নিভিয়া গিয়াছে, শুষ্ক কণ্ঠে তিনি বলিলেন, সবই অভ্যাস মা। যাদের জন্যে পথে বেরিয়েছ তারা যে কাটা পড়েই আছে।

সুরভী একটু জোরে হাসিয়া বলিল, আমরা ত' জুতো খোলাবার দলে নই, জুতো পরাবার দলে।

পরাণ আর কোন কথা বলিলেন না। পা দুইটা তাঁহার টলিয়া টলিয়া যাইতে লাগিল, রাজকুমারের হাতটা তিনি বেশ শক্ত করিয়াই ধরিলেন।

সোমেশ্বরের দিকে ফিরিয়া রাজকুমার বলিল, তুমি যে হঠাৎ তোমার কেন্দ্র ছেড় চলে এলে সোমেশ্বর ?

কি এক চিন্তায় সোমেশ্বর ডুবিয়া গিয়াছিল, কুমারের প্রশ্নে সচেতন হইয়া সে উত্তর করিল, অতুলদা চিঠি দিয়েছেন, ক'লকাতায় যেতে হবে। সেখানে নাকি ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছে—সহরের পৌরুষকে গ্রামের মানুষের কাজে কতটা লাগান যায় তাই দেখতে হবে। তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে, সম্ভব হলে তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে তিনি যেতে বলেছেন।

কলিকাতার কথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া সুরভী রাজকুমারকে বলিল, দেখে

আসুন গিয়ে ক'লকাতায়, কি উৎসাহের বন্যা নেমে এসেছে সেখানে। সব ঢেউয়েই জাহাজ ভাঙ্গে না সত্যি, কিন্তু জাহাজ ভাঙ্গতে ঢেউও ত' চাই।

কলিকাতার কথায় মনে পড়িয়া গেল একটি সুন্দর কচি মুখ। তাহার চোখমুখ যেন কি এক আকুল আগ্রহে এই গ্রামেরই দিকে চাহিয়া আছে—মুখে যে হাসির জ্যোতি তাহা এ জগতের নহে। রাজকুমার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

সুরভী তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। ভাবিল, বুঝি কলিকাতা যুবকের মনে এক স্বপ্নরাজ্যের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে তাই পুনরায় বলিল, দেখবেন সেখানে কত আবেগ, কত চাঞ্চল্য—জীবন যেন সেখানে নদীস্রোতের মত বয়ে চলেছে।

রাজকুমার বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিল—সুরভীর আবেগ কম্পিত স্বর তাহাকে চমকিত করিয়াছে। এই অতি সুন্দরী তরুণীর মুখের দিকে সে ফিরিয়া দেখিল। কলিকাতার গতিবেগের ছাপ যেন সেখানেও লাগিয়া রহিয়াছে। কিন্তু যে মুখটির কথা সে ভাবিতেছিল? সে যে পল্লীর অচল শান্ত শ্রী!

সভার কাজ শেষ হইয়া গেল। এই শোভাযাত্রার আগমনে গ্রামে বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। যথেষ্ট অত্যাচার এবং অন্যায় যে তাহারা সহ্য করিতেছে একথা প্রত্যেক গ্রামবাসীই বোঝে। বক্তৃতা হইতে ঠিক পথের সন্ধান না মিলিলেও লড়াইয়ের একটা কৌশল সম্বন্ধে সকলেই যে কিছুটা জ্ঞানলাভ করিয়া ফিরিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সভার শেষে শোভাযাত্রীদল চলিয়া গেল। সুরভী রহিয়া গেল সেদিনকার মত—পরের দিন ভোরে সে ও সোমেশ্বর কলিকাতায় যাইবে। বক্তৃতার ফলে

হয়ত গ্রামে কিছু হইতে পারে তাই এ সময় রাজকুমারের যাওয়া সম্ভব নয়।
সুরভীর ইচ্ছা হইতেছিল উহাকে কলিকাতায় লইয়া যায়। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অপরূপ যুবক ইতিপূর্ব্বে সে আর দেখে নাই। উহার মধ্যে যে প্রতিভার একটা অস্ফুট আভাস আছে তাহা ঠিকমত বুঝিতে না পারিলেও সুরভীর মন বলিতেছিল যে তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু রহিয়াছে যাহা অন্যের মধ্যে নাই।

পরাণের গৃহে উপস্থিত হইয়া সুরভী বলিল, আজকের রাতটা কুমার বাবুর মায়ের কাছেই কাটাব। তারপর রাজকুমারের দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, আপনার কোন আপত্তি নেই ত' ?

রাজকুমার ম্লানভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাহার আপত্তি আছে।

সুরভী বিস্মিত হইল, তথাপি হাসিয়াই বলিল, ভয় নেই, মায়ের ওপর ভাগ বসাব না।

পরাণ বলিলেন, ভাগ বসাতে না পারাটাই ত' ভয়ের মা।

রাজকুমার মৃদুস্বরে বলিল, আমার বাড়ীতে নানা দিক দিয়ে অসুবিধে আছে।

তাহার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সুরভী বলিল, সমস্ত অসুবিধেই আমি মেনে নেব, কুমার বাবু।

রাজকুমারের মুখে গভীর ব্যথার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, শারীরিক অসুবিধার কথা আমি ভাবি না সুরভী দেবী। আপনার মনটাও হয়ত সেখানে কঠিন ঘা খাবে।

সুরভী রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চক্ষে তখন রাজ্যের মমতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পরাণ বলিলেন, রাজকুমারের বাবা নেশাখোর, মাথারও ঠিক নেই—কখন কি করে বসে, কাকে কি বলে বসে তা বলা যায় না, ওর ভয় সেই জন্যেই।

তেমনি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়াই সুরভী বলিল, হোক্, আমি কুমার বাবুর বাড়ীতেই থাক্‌ব।

সোমেশ্বর এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, এইবার মৃদু হাসিয়া বলিল, ওকে আমি জানি, বড় একগুঁয়ে মেয়ে—ধনী বাপের বেশী আদর পেলে যা হয়!

সকলেই হাসিল। সুরভী হাসিমুখে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলিয়া সোমেশ্বরকে প্রহারের ভয় দেখাইল।

*

* *

অন্নপূর্ণা রান্না করিতেছেন—রাজকুমার ও সুরভী তাঁহার নিকটে বসিয়া।

রান্না করিতে করিতেই অন্নপূর্ণা বলিলেন, তোমাকে বাড়ীর লোকে ছেড়ে দেয় কি বলে মা?

সুরভী মৃদু হাসিয়া বলিল, ছেড়ে না দিলে যে আমি থাকি না।

রাজকুমার বলিল, ক'লকাতার এই অবস্থাই বুঝি আজকাল?

কলিকাতার কথা উঠিতেই সুরভীর যেন কি মনে পড়িয়া গেল, একটু আব্দারের সুরেই অন্নপূর্ণাকে লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, ছেলেকে আমাদের সঙ্গে ক'লকাতায় পাঠিয়ে দিন না মাসীমা। সহরটা একবার দেখে আসুক।

ম্লানভাবে অন্নপূর্ণা বলিলেন, সময় হলে যাবে বই কি!

বাহিরে গোকুলের কণ্ঠ শোনা গেল। জড়িত স্বরে সে আপন মনেই

বলিতে বলিতে আসিতেছিল, যাক্‌ বাবা এতদিনে নিশ্চিন্ত, সব জমিগুলো শেষ হল। দশ বার বিয়েই যেন রাবণের বংশ বাবা—শেষ আর হয় না। এবার মর, টেনে বাড়ীর বাইরে ফেলে দেবে, ব্যাস্‌। জজ ম্যাজিষ্টর হবে, মানুষ হবে!

রান্নাঘরে উপবিষ্ট তিনটি প্রাণীই সচকিত হইয়া ওঠে। রাজকুমারের জননীর মুখ শঙ্কায় কালো হইয়া যায়। সুরভির সহিত চকিতে রাজকুমারের দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। গোকুল গত তিন চারিদিন গৃহেই ফেরে নাই—আজ যখন ফিরিয়াছে তখন কোন না কোন অনর্থ সে করিবেই।

গোকুল টলিতে টলিতে উঠানে আসিয়া সেইখানেই ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, ভাত দাও বাবা, আর দিন কয়েক দাও। এবার বাড়ীতে টান পড়বে— নাড়ীতে টান পড়বে, নাড়ী ছিঁড়ে যাবে হা, হা। সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা দ্রুত পদে বারান্দায় একটা আসন পাতিয়া গোকুলের নিকট গিয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিলেন, খেতে বসবে চল।

গোকুল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, ভালবাসা! আর কেন, এবার ত' টেনে ফেলে দেবে।

যে মেয়েটি আজ এ বাড়ীতে অতিথি হইয়াছে তাহাকে আজ গোকুলের নিকট হইতে আড়াল করিয়া রাখিতেই হইবে। যদি তাহাকে কোন প্রকারে দেখিয়া ফেলিয়া সে কোন কিছু বলিয়া বসে তাহা হইলে লজ্জা রাখিবার আর কোন স্থান তাহাদের থাকিবে না। বহুদিন পরে অন্নপূর্ণা আপনা হইতেই আজ গোকুলের হাত ধরিয়া বলিলেন, ওপরে উঠে এস।

গোকুল টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। রান্নাঘরের পাশ দিয়া যাইবার সময় হঠাৎ রাজকুমারকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায়

জোরে জোরে হাসিয়া উঠিল। রাজকুমারের জননী শত চেষ্টা করিয়াও আর তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না। জোর করিয়া স্ত্রীর হাত হইতে নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া গোকুল রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া গিয়া বলিল, এই যে কুমার বাহাদুরও আছেন দেখছি। তারপর মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, খাজনা বন্ধ করবে, না? যত্ন যোগাল সবার হাতে দড়ি দেবে। ধিঙ্গী মেয়েও আবার জুটেছে দলে!

রাজকুমারের কান দুইটা লাল হইয়া উঠিল, বুক কাঁপিতে লাগিল। স্বামীকে রান্নাঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া অন্নপূর্ণা তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। বাধা দেওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া গোকুল তাহাকে ঠেলিয়া দিল। আকস্মিক ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের সিঁড়ির উপর পড়িয়া গেলেন—মাথা কাটিয়া অজস্রধারে রক্ত গড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জ্ঞান হারাইলেন।

রাজকুমার এবং সুরভী উভয়েই দ্রুতপায়ে ঘর হইতে একই সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। পুত্র জননীর মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইল, সুরভী তাহার মুখে-চোখে জলের ছিটা দিতে লাগিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় গোকুল প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, এতক্ষণে বোধ করি তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল, সুরভীর দিকে চাহিয়া জোরে জোরে হাসিয়া হাত উল্টাইয়া সে বলিল, ধিঙ্গী মেয়েটা যে! রাজপুত্তুরের বউ হবে নাকি? নিজের রসিকতায় সে নিজেই হাসিতে হাসিতে টলিতে লাগিল এবং সেই ভাবেই সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্নপূর্ণার চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিজেকে সামলাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। মুহূর্তের জন্য রাজকুমারের চক্ষুর সহিত

সুরভীর চক্ষুর মিলন হইল। দূর হইতে তখনও গোকুলের হাসি অস্পষ্ট ভাবে ভাসিয়া আসিতেছিল।

*

* *

পরের দিন সোমেশ্বর-সুরভী বিদায় লইল। যাইবার সময় সুরভী আর একবার রাজকুমারকে কলিকাতায় যাইবার অনুরোধ জানাইয়া গেল। পরাণ এবং রাজকুমার তাহাদের গ্রামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিল।

ফিরিবার পথে পরাণ কতকটা আপন মনেই বলিলেন, ওরা ফিরে গেল!

রাজকুমার পরাণের বিষণ্ণ মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তারপর দূর আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, এ ফিরে যাওয়া মিলিয়ে যাওয়া নয় দাদু।

পরাণ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তাই যেন হয়।

দৃঢ়স্বরে রাজকুমার বলিল, হবেই। মিলিয়ে যাওয়ার আর কোন উপায়ও নেই। ওরা নিজেরা যদি হারিয়েও যায় ত' ওরা যা এনেছে তা কোন দিন মুছে যাবে না। একদিন তার শেষ শোধ দিতেই হবে।

পরাণ দৃষ্টিহীন চক্ষে একবার রাজকুমারের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তার-পর পুনরায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তাই যেন হয়।

রাজকুমার বলিল, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে চলতে বিশেষ করে শেখানো দরকার এখন থেকেই। বিশৃঙ্খল জনতা যুদ্ধে হারবেই। শৃঙ্খলাবদ্ধ গুটিকয়েক লোকও সহস্রকে অতিক্রম করতে পারে।

পরাণ বলিলেন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন কর। সেবকরা ত' সব স্বেচ্ছায়েই এসেছে—তাদের চলতে শেখাও একসঙ্গে।

রাজকুমার ক্ষণকাল চুপ করিয়া বহুদূরের দিকে চাহিয়া মনের মধ্যে কিসের

ছবি যেন আঁকিতে চেষ্টা করিতেছিল। পরাণের গৃহের নিকটে তখন তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। রাজকুমার খুব ধীরে ধীরে বলিল, ক'লকাতায় গিয়ে একবার দেখে এলে হয় সব।

পরাণও ধীরে ধীরেই বলিলেন, তাই কর।

পরাণকে গৃহে পৌছাইয়া দিয়া রাজকুমার বাহির হইয়া গেল দেবুর উদ্দেশ্যে। সঙ্ঘের সকলকে একসঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে শিখাইতে হইবে। দেহ ও মনের শৃঙ্খলা সকলের বজায় রাখা চাই। অন্যথায় সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইবে।

দেবুর সঙ্গে কাজের ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাজকুমার গৃহের পথ ধরিল। দেশের সম্মুখে যে বিশেষ মুহূর্ত্ত আসিতেছে তাহা সে বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। তাহা না হইলে ধনীর দুলালী অমন করিয়া দল বাঁধিয়া গ্রামে গ্রামে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া ফিরিত না—অতুলদাও সোমেশ্বরকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেন না। কলিকাতার কাজ শেষ করিয়া সোমেশ্বর পুনরায় গ্রামেই ফিরিয়া আসিবে। শতকরা নব্বুই ভাগ লোকের বাস এই গ্রামে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন। গ্রামের সঙ্গে যদি যোগই না থাকিল তবে তাহার অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় স্থির হইবে কি করিয়া!

রাজকুমার চিন্তিত ভাবে পথ চলিতেছিল। পথে গ্রামের পিয়নের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। সে তাহার চিঠির থলি লইয়া বহুদূরের পথে চলিয়াছিল, রাজকুমারকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, তোমার আজও একটা চিঠি এসেছে দাদা।

পিয়ন বহু পুরাতন লোক—গ্রামের সকলের চক্ষের সম্মুখ দিয়াই সে তাহার চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছে, সকলকেই সে চেনে। কিশোর হইতে

আরম্ভ করিয়া অতি বৃদ্ধকেও সে দাদা বলিয়াই সম্বোধন করে। গোকুলকেও দাদা বলে, রাজকুমারকেও সেই সম্বোধন করিতে ছাড়ে না।

রাজকুমার বিস্মিত ভাবে বলিল, আমার চিঠি?

পিয়ন দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, হ্যাগো তোমারই চিঠি—ক'লকাতার বিডন ষ্ট্রীট থেকে।

রাজকুমার চমকিয়া উঠিল। সতীর চিঠি! সতী এতদিন পরে তাহাকে চিঠি দিয়াছে! ইতিপূর্ব্বে সে কি তাহাকে লিখিতে পারিত না! রাজকুমার হাত বাড়াইল, হাতটা একটু কাঁপিয়াও উঠিল, বলিল, দাও চিঠিটা।

পিয়ন বলিল, আমার কাছে নেই—মাষ্টার বাবুর কাছে যাও।

রাজকুমার আর মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়াইল না। সতীর চিঠি আসিয়াছে—কত' না আনন্দের কথা! কয়েক মাস ধরিয়া সতীকে তাহার কত বার না মনে হইয়াছে! সতী তাহাকে মনে করে কি! রাজকুমারের মন বলিতে লাগিল, সতী নিশ্চয় তাহাকে মনে করিয়া রাখিযাছে, নিশ্চয় সে তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না।

পোষ্ট অফিসের ভাঙ্গা চালার মধ্যে প্রবেশ করিয়াই রাজকুমার ব্যগ্র ভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল, সতীর চিঠিটা দিন মাষ্টার কাকা।

মাষ্টার কাকা চশমার উপর দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কেবলমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন।

রাজকুমার বুঝিল যে তাহার ব্যাকুলতা প্রকাশ করা ঠিক হয় নাই—সতীর চিঠি বলাও অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। ক্ষণকাল মাষ্টার কাকার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, আমার চিঠিটা দিন।

মাষ্টার বাবু তখনও তাহার মুখের দিকে সেই ভাবেই চাহিয়া ছিলেন,

আরও কিছুক্ষণ সেইরূপ দৃষ্টি দিয়া রাজকুমারকে দেখিয়া লইয়া তিনি বলিলেন, তোমার আবার চিঠি কিসের?

রাজকুমার যেন একটু ঘা' খাইয়া কাঁপিয়া উঠিল, পুনরায় অতি ধীরে বলিল, ক'লকাতার চিঠি।

মাষ্টার বাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া নিজের কাজ করিতে করিতে বলিলেন, তোমার কোন চিঠি নেই।

রাজকুমার ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল, কোন প্রকারে নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, হরুদা যে বললে! প্রাণ পণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার গলা বেশ কাঁপিয়া গেল।

মাষ্টার ম'শাই বিরক্তি ভরে মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, হরু কি জানে? সে পিয়ন আর আমি তার মনিব। চিঠি থাকে ত' হরুর কাছ থেকেই আদায় কর গিয়ে।

ইহার উপর আর কোনো কথা চলে না। হয়ত' হরুদা ভুল করিয়াছে। কিন্তু বিডন ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত মিলিয়া গিয়াছিল যে! রাজকুমারের মন একটা সংশয়ের দোলায় দুলিয়া উঠিল। এমন ভুল হইবে কেন? আর সেখানে না দাঁড়াইয়া রাজকুমার গৃহের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

গৃহে পৌঁছিয়া সে সোজা নিজের ঘরে প্রবেশ করিল এবং সতীকে চিঠি লিখিতে বসিয়া গেল। কোন দিকে তখন তাহার দৃষ্টি ছিল না। মায়ের সংবাদও লইল না। সতীর চিঠি আসিয়াছে মনে করিয়া সে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল—সেই চিঠিই না পাইয়া সে যেন আর নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না। নিশ্চয় সতী তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—কলিকাতা মহানগরীতে চারিদিকের বৈচিত্র্যের মধ্যে কুমারদা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে কে জানে! মনের সমস্ত অভিমান সে তাহার চিঠির

মধ্যে ঢালিয়া দিল, জানাইল যে সেও একদিন কলিকাতায় যাইবে এবং মহানগরীর মায়ারাজ্যে নিজেকে আত্মগোপন করিয়া ফেলিবে—সতীর কথা কিছুতেই মনে করিবে না, যতই না সে মাথা কুটিয়া মরুক।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও আর অপেক্ষা না করিয়া সে তাহা ডাকে দিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। ডাক বাক্সে চিঠিটা ফেলিয়া দিয়াও তাহার মনে শান্তি ফিরিয়া আসিল না। চিঠি পাইয়া সতীর কি অবস্থা হইবে তাহাই সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল। কুমারদা আর তাহাকে মনে রাখিবে না। যে মহানগরীর মহানন্দে পুরাতন কথা সব ভুলিয়া যায় তাহাকে মনেই বা রাখিবে কেন! রাজকুমার অন্যমনস্কের মত চলিতে চলিতে পরাণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে সে কিছুটা সান্ত্বনা পায়।

সমস্ত শুনিয়া পরাণ বলিলেন, হয়ত' চিঠি সত্যিই এসেছে।

রাজকুমার ম্লান ভাবে বলিল, তা হলে কি আর মাষ্টার কাকা দিতেন না?

পরাণ একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর নিজের মুখে একবার হাত বুলাইয়া বলিলেন, মানুষ সব পারে, আমার মনে হয় সে চিঠি গেছে যদু ঘোষালের কাছে। আমি এর আগেও সতীর কথা ভেবে দেখেছি—সে আমাদের কিছুতেই ভুলতে পারে না।

মুহূর্ত্তেই রাজকুমারের কাছে একটা দিক যেন স্পষ্ট হইয়া গেল। যদু ঘোষাল নিশ্চয় প্রিয় পাত্রীর সহিত তাহাদের কোন যোগ রাখিতে দিতে চাহেন না। সতীর উপর সে ত' তাহা হইলে অন্যায় করিয়াছে—যে চিঠি সে সতীকে লিখিয়াছে তাহা ফিরাইয়া আনিবারও ত' আর কোন উপায় নাই। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। আজ একটার পর একটা আঘাত

আসিয়া লাগিতেছে। আজকের দিনটা বোধ হয় তাহার পক্ষে ভাল নহে।

রাজকুমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। মায়ের সন্ধানে রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল যে স্নেহময়ী জননী মেঝের উপর লুটাইয়া রহিয়াছেন। সে চমকিয়া ব্যস্ত ভাবে মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিয়া উঠিল, মা। তাহার কণ্ঠস্বর তখন কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

মাতা অনেক কষ্টে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। দৃষ্টি দেখিয়া রাজকুমার ভীত হইয়া পড়িল। এমন রক্তবর্ণ চক্ষু ইতিপূর্বে আর কখনও সে দেখে নাই।

রাজকুমার জননীকে ধরিয়া বসাইল। মাথায় হাত পড়িতেই সে ভীত ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত মাথাটা অনেকখানি ফুলিয়া গিয়াছে। গত রাত্রিতে মায়ের মাথার যে স্থানটা কাটিয়া গিয়াছিল সেখানটা বোধ হয় বিষ হইয়া উঠিয়াছে। দুই হাতে সে মাতাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল। আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সে গ্রামের একমাত্র আশা ভরসা স্থল ডাক্তার বাবুর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বুঝিলেন যে এ রোগীকে বিনা পয়সাতেই চিকিৎসা করিতে হইবে। ঔষধের দামও হয়ত' মিলিবে না। কিন্তু কি মনে করিয়া রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি তাহার সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন।

রোগীকে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বিষ হয়ে গেছে—খুবই কঠিন অবস্থা, বাঁচবার আশা নেই। ঔষধ তিনি একটা দিয়া গেলেন কিন্তু দুই দিনও টিঁকিবে বলিয়া ভরসা দিতে পারিলেন না।

রাজকুমার মাতার নিকটেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখের জল তখন শুকাইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর এই অন্যায় অবিচারের মধ্যে নাই:রা থাকিলেন তাহার জননী।

আজ রাজকুমারের অনেক কথাই মনে হইতেছিল, পুত্রের মঙ্গলের জন্য কি তাঁহার ব্যাকুলতা। জননীর আকাঙ্ক্ষা হয়ত' সে পূর্ণ করিতে পারে নাই। তাহার পিতার ব্যাঙ্গোক্তিতে, অত্যাচারে জননী কোনদিন বিচলিত হন নাই, একদিনের জন্যও রাজকুমারের জিজ্ঞাসু মনকে বাধা দেন নাই। রাজকুমার সমাজ সেবার যে পথ গ্রহণ করিয়াছিল সে পথ হইতে তাহাকে তিনি সরিয়া যাইতে বলেন নাই। বলেন নাই অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসারের সুখ ফিরাইয়া আনিতে। দেহ অপেক্ষা মনকে—সুখ অপেক্ষা আনন্দকে তিনি অনেক বড় করিয়া দিখিয়াছেন।

স্নেহময়ী জননী চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবেন। এই এতবড় পৃথিবীতে মাথা কুটিয়া মরিলেও তাঁহার সন্ধান মিলিবে না। যাহাদের আশ্রয় দিবার জন্য একদিন তিনি বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন তাহাদের নিরাশ্রয় করিয়াও তাঁহাকে যাইতেই হইবে। রাজকুমার জানে জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাহার জননীকে চিরদিনের জন্য জগতেই ধরিয়া রাখিতে পারে। স্নেহ-ভালবাসার জোর কি কিছুই নয়! তথাপি রাজ-কুমার সেই স্নেহময়ীকে ধরিয়া রাখিতে চাহে না—অনেক কিছুই তিনি সহ্য করিরাছেন। সহ্য করিয়াছেন স্বামীর অনাদর-অত্যাচার, প্রতিদিনই সেই অত্যাচার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে তাঁহার বুকে, মনে, দেহে। সান্ত্বনার স্থল ছিল রাজকুমার। কিন্তু সে-ই বা তাহার জননীকে কি দিয়াছে!

পৃথিবী আজ যে অবস্থায় অসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিরাট ভালবাসার

স্থান নাই—বিরাট মন লইয়া আসিলে অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতে হইবে, অবিচার-অন্যায়ের ছাপ দেহের অলঙ্কার করিয়া লইতে হইবে। এখানে স্নেহময়ী জননীকে ধরিয়া রাখিয়া লাভ নাই, সে ধরিয়া রাখিতে চাহেও না।

*

* *

দুই দিন হয় গোকুল গৃহে ফেরে নাই। জননীর শেষ নিশ্বাস ফেলিতে আর বড় বেশী বিলম্ব ছিল না। মাতার এই শেষ সময়ে পিতার উপস্থিতি রাজকুমার মনে মনে কামনা করিয়াছিল। অনুসন্ধান করিয়া পিতাকে ধরিয়া আনিবার সময়ও বোধ হয় নাই, মাতার শয্যাপার্শ্ব হইতে কোথাও যাইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না। পরাণ একটু দূরে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন, আজ তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল সেদিনের কথা যেদিন অন্নপূর্ণা তাঁহার শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। সেদিন জননীর মনে কত না আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল !

দেবু প্রভৃতিও ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছিল। রাজকুমার আজ আর একা নহে তথাপি বার বার কেন জানি তাহার মনে হইতেছিল যে সে একা হইয়া যাইবে। একা হইয়া যাইবার এক গোপন ইচ্ছাও কেমন করিয়া যেন তাহাকে পাইয়া বসিল। সংসারের বাহিরে, লোকালয়ের বাহিরে নিজের মনকে লইয়া কি থাকা যায় না!

দরজার বাহিরে গোকুলের স্বর শোনা গেল। মহা খুসীতে সে হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। এতদিন পর সে যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছে—আর কোন দিকে তাহার কোন শত্রু নাই।

রাজকুমার সচকিত হইয়া উঠিল। তাহার মনের ইচ্ছা সফল হইয়াছে। মাতার শেষ মুহূর্ত্তে অত্যাচারী হইলেও পিতার উপস্থিতি সে চাহিয়াছিল।

গোকুল ভিতরে প্রবেশ করিল, রাজকুমার আপনা হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইল। যাহা সে কোনদিন করে নাই তাহাই করিয়া বসিল—আগাইয়া গিয়া পিতার হাত ধরিল।

গোকুল জোরে হাসিয়া উঠিল, নিজেকে কিছুমাত্র সংযত না করিয়া বলিল, আর আদরে লাভ নেই, কাজ শেষ করে এসেছি। তারপর অকস্মাৎ কি মনে হইতেই পুত্রের হাত ঠেলিয়া দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, চিঠি লেখা, যদু ঘোষালের সঙ্গে চালাকি! হাতে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে—যাক্ নিয়ে। রাজপুত্তুর কি না!

রাজকুমার পিতার কথা ঠিক ধরিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, চিঠি!

গোকুল টানিয়া টানিয়া হাসিতে হাসিতে আগাইয়া চলিয়াছিল, পুত্রের কথাটা কানে যাইবামাত্র সে থামিয়া পড়িল, পুনরায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, রাজ্যের রাজা-ই ত' যদু ঘোষাল, পোষ্ট অফিস তার হাতে। ফাঁকি দেবেন রাজপুত্তুর। গোকুল পুনরায় আগাইয়া চলিল।

রাজকুমার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা তাহার নিকট এখন জলের মত সহজ হইয়া গিয়াছে। পরাণ ঠিকই বলিয়াছিলেন। তাহার লেখা চিঠিও সতীর নিকট কোনদিনই পৌছাইবে না।

গোকুল একেবারে স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। টানিয়া টানিয়া হাসিতে হাসিতে মনের খুসী প্রকাশ করিয়া বলিল, স-ব বিক্রী করে দিয়েছি, আর ভাবনা নেই বাবা—কাল পরশুই বাড়ীর বার করে দেবে যদু ঘোষাল। ব্যাস্, মর তখন রাজপুত্তুরের হাত ধরে। আমার আর কি। গোকুল তেমনি ভাবেই হাসিতে লাগিল।

পরাণ তখনও চুপ করিয়া একধারে বসিয়াছিলেন, গোকুলের হাসি এবং কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন, চুপ কর গোকুল। তোমার ভিটে ছাড়াবার অপেক্ষাতেই বউ বসে নেই, সে তার আগেই চলে যাচ্ছে। এই শেষ সময় ওকে শান্তিতে ঘুমুতে দাও।

গোকুল যেন চমকিয়া গেল, উত্তেজিত ভাবে মাথার চুলগুলি টানিতে টানিতে বলিল, তাড়াবার আগেই যাচ্ছে! আমাকে হারিয়ে দিয়ে গেল, শেষ সময়েও হারিয়ে দিয়ে গেল! গোকুল কাঁপিতে কাঁপিতে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল—ক্ষণকাল সেইভাবে স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া গৃহের বাহিরে যাইবার জন্য ধীরে ধীরে আগাইয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু বেশীদূর যাইতে পারিল না। পুনরায় স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া আসিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। চোখ দিয়া ফোঁটা কয়েক জল গড়াইয়া পড়িল।

রাজকুমার ফিরিয়া আসিয়াছিল। পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া গেল। মাতার শয্যার এক পার্শ্বে সে গিয়া চুপ করিয়া বসিল। গোকুল তেমনি স্তব্ধ ভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া আসিল, যাও। চক্ষু বাহিয়া তখনও অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। আর দাঁড়াইয়া না থাকিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

রাজকুমার তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। পিতা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে সেইদিকেই চাহিয়াছিল। মাতার সমস্ত দেহটা একবার কাঁপিয়া ওঠায় সে যেন সচকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। ফিরিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল যে সে মুখে কোন জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন মাত্র নাই। সমস্ত মুখ প্রশান্ত হাসিতে

ভরিয়া গিয়াছে। রাজকুমার মায়ের আরও নিকটে আগাইয়া গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া একেবারে মায়ের বুকে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন—আর কোন দিন আসিবেন না, পুত্রের দুঃখ কষ্ট দূর করিয়া দিবার জন্য কোন দিন বক্ষেও ধারণ করিবেন না। যে জড় দেহটা পড়িয়া রহিয়াছে তাহা আর যাহাই হোক্ মা নহে।

তেমনি করিয়া পড়িয়া থাকিয়াই ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে রুদ্ধকণ্ঠে রাজকুমার ডাকিল, দাদু!

পরাণ একটু নড়িয়া চড়িয়া হাত দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমি এখনও আছি ভাই।

রাজকুমার বেশীক্ষণ সেই ভাবে পড়িয়া থাকিল না। তাহার মন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া ছিল। এই পৃথিবীর শোক দুঃখের মধ্যে মাকে বাঁধিয়া রাখিয়াই বা কি হইবে! যথেষ্ট অত্যাচার ওই স্নেহময়ী নারী সহ্য করিয়াছেন। তাহাকে মানুষ করিবার ইচ্ছাতেই এতদিন হয়ত' তিনি নিজেকে পৃথিবীর সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন—আর সে যোগ রাখিবার ত' কোন কারণ নাই। রাজকুমার বড় হইয়াছে, তাহার জননীর আর কিছুই করিবার নাই। রাজকুমারের অনুযোগ করিবারও কোন কিছুই ছিল না। সে স্তব্ধ হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

*

*   *

শ্মশানে রাজকুমার চুপ করিয়া বসিয়াছিল। মাতার শেষ কার্য্য শেষ হইয়া আসিয়াছে। চিতার আগুনও নিভিয়া আসিতেছে। রাজকুমার সেই দিকে চাহিয়াছিল। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় দেহটা ভস্মীভূত হইয়া

গিয়াছে। যে বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত তাহা আর কোনদিন তাহাকে আশ্রয় দিবে না। কি তাহা যাহার অভাবে মৃত্যু হয়? অবিনশ্বর আত্মা বলিয়া কি সত্যই কিছু আছে? তাহা কি শূন্যে শূন্যে ঘুরিয়া বেড়ায়? তাহার মাতা কি তাহারই চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন?

রাজকুমারের পাশেই পরাণ বসিয়াছিলেন। তিনি বহুক্ষণ কোন কথা বলেন নাই, কথা বলিবার মত মনের অবস্থাও বোধ হয় তাঁহার ছিল না। সেই পরম মুহূর্ত্ত তাঁহার জীবনেও আসিতেছে—মৃত্যুকে যেন বধূর মতই তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। জগতে বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার বড় বেশী নাই। রাজকুমার, সতী, দেবু, সোমেশ্বরদের জন্যই ত' কৌতূহলী মন কেবলই ঘুরিয়া ফিরিয়া পৃথিবীর কথা মনে করে। মৃত্যুকে যাহাতে ভয় না হয় মনে মনে সেই প্রার্থনাই তিনি করিতে লাগিলেন।

গোকুল স্ত্রীর শেষ মুহূর্ত্তে সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছিল আর ফিরিয়া আসে নাই। দেবু একবার সন্ধান লইতে গিয়াছিল, কিন্তু গোকুলের নড়িবার ক্ষমতাও তখন ছিল না। নেশায় সে তখন একেবারে জ্ঞানহীন, মাঝে মাঝে আপন মনে কি সব বিড় বিড় করিয়া বকিতেও ছিল।

চিতা নিভিয়া গেল। দেবু নিকটে আসিয়া বলিল, এইবার শেষ কাজটুকু করে বাড়ী চল কুমার।

রাজকুমার চক্ষু তুলিয়া দেবুর মুখের দিকে চাহিল, তারপর ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কোন কথাই বলিল না। কাজ শেষ করিয়া সে যেখানে বসিয়াছিল পুনরায় সেইখানে এক গাছতলায় গিয়া বসিল।

দেবু বলিল, আর না কুমার, সন্ধ্যা হয়ে আসছে—পথও অনেকখানি, চল। দেরি হলে দাহুর কষ্ট হবে। দেবুর কণ্ঠস্বরে রাজ্যের স্নেহ-মমতা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

রাজকুমার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য—পর মুহূর্ত্তেই সে তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া বহুদূরে অস্ত গমনোন্মুখ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিল। ওই সূর্য্য নিয়মিত আসিতেছে এবং যাইতেছে, মানুষের জীবনও কি সেইরূপ যাতায়াত করে নব নব রূপে? সেই নূতন রূপের ভিতর হইতে তাহার পুরাতন রূপের সন্ধান কি মিলিতে পারে না?

পরাণ এতক্ষণ রাজকুমারের পাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, এইবার তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, বাড়ী ফিরে যাবে না দাদা?

রাজকুমার পরাণের একটা হাত দুই হাতের মধ্যে শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল, তারপর ধীরে ধীরে আল্‌গা করিয়া দিয়া বলিল, আপনারা যান আমি একটু পরে যাব।

দেবু ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, তা কি হয় কুমার, তোমাকে ফেলে আমরা যাই কি করে?

রাজকুমার ম্লান ভাবে হাসিয়া বলিল, আমি হারিয়ে যাব না দেবু।

দেবু দৃষ্টি অবনত করিয়া বলিল, তোমাকে হারালে আমাদের চলবে না।

রাজকুমার বিষণ্নভাবে একটু হাসিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যদি হারিয়ে যেতেই চাই ত' আটকাবে কি করে? তারপর সেই বিদায় কালীন রক্তবর্ণ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কতকটা আপন মনেই বলিল, তোমাদের কাছ থেকে চিরদিনের মত সরে যেতেও

চাই না আমি, যেখানেই যাই এখানে ফিরে আসবার জন্যে অস্থির হয়ে থাকবই —তোমাদের সঙ্গে যে আমার নাড়ীর যোগ।

দেবুর চক্ষে জল আসিয়া পড়িল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সে অশ্রু গোপন করিল। রাজকুমারের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভারী গলায় পরাণ বলিলেন, তাই হোক, তুমি পরেই এস, দেশ যখন তোমায় ডেকেছে তখন তার কাছে তোমাকে ধরা পড়তেই হবে।

পরাণ আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেবুর হাত ধরিয়া তিনি ফিরিবার পথ ধরিবার জন্য পা বাড়াইলেন। দেবু শেষ বারের মত রাজকুমারের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল—রাজকুমার তখনও সেই দূরের দিকেই চাহিয়াছিল।

পরাণ, দেবু প্রভৃতি চলিয়া গিয়াছে। রাজকুমার তথাপি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই খানেই বসিয়া রহিল। রক্তবর্ণ সূর্য্য বিদায় লইয়া বোধ করি বিশ্রাম করিতে গিয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে দূরের এবং নিকটের বৃক্ষগুলি যেন অসীম মায়া ছড়াইতেছে। অন্ধকারে গোপনতার সুযোগ লইয়া এ উহাকে ইঙ্গিতে কি যেন বলিতেছে। সমস্ত প্রকৃতি ফিস্ ফিস্ করিয়া পরস্পরের সহিত কথা বলিয়া চলিয়াছে। অন্ধকারের গোপনতায় বৃক্ষতলে উপবিষ্ট একটি মানুষের নিকট যে সমস্ত রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইতেছে তাহা বোধ করি রহস্যময়ী প্রকৃতি বুঝিতেও পারে নাই। বুঝিতে পারিলে লম্বা ঘোমটা টানিয়া সে নিশ্চয়ই নিজের মুখ আবৃত করিয়া ফেলিত।

কতক্ষণ সে এই ভাবে বসিয়াছিল জানে না, অকস্মাৎ যেন জাগিয়া দেখিল যে সমস্ত প্রকৃতি হাসিতেছে। রাজকুমার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাঁদের

দিকে ফিরিয়া চাহিল। পূর্ণিমার চাঁদ! বৃক্ষশাখাগুলি পাতা দোলাইয়া কি পরস্পরকে ইহারই আগমন বার্ত্তা জানাইতেছিল? প্রকৃতি স্তব্ধ আগ্রহে কি ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল? রাজকুমার কি এক রহস্যের সন্ধান পাইল। মানুষে মানুষে এক হইয়া পরস্পরকে ভাল বাসিয়া যদি পূর্ণিমার চাঁদকে, আনন্দকে আহ্বান করে তবে জ্যোৎস্না বিলাইয়া সে চাঁদ আসিবেই। পৃথিবীর বুকে সে চাঁদের উদয় কি হইবে না?

রাজকুমার ফিরিয়া চাহিল তাহার মাতার দেহ যে চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে সেই দিকে। তারপর ধীরে ধীরে সেইখানে উঠিয়া আসিল। দেহের কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নাই। দুই এক টুক্‌রা অঙ্গার তখনও মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য রাজকুমারের চক্ষু দুইটা জ্বালা করিয়া উঠিল। ক্ষণকাল সেইখানে অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে অন্যমনস্কের মত পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিকট দিয়াই উঁচু বাঁধের মত রাস্তাটা সোজা চলিয়া গিয়াছে কলিকাতার দিকে—উহারই এক প্রান্তে, পনের কুড়ি মাইল দূরে কলিকাতা মহানগরী। সুরভী তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে। এই চন্দ্রালোকে ওই দূর পথ রাজকুমারকে আহ্বান করিতে লাগিল। রহস্য, চারিদিকেই যেন রহস্য দানা বাঁধিয়া আছে। সেই রহস্য ভেদ করিবার জন্য সেই পথ আভাসে ইঙ্গিতে তাহাকে অগ্রসর হইয়া আসিতে বলিতেছে। রাজকুমারের গৃহে ফিরিবার ইচ্ছা হইল না।

গৃহে পরাণ, দেবু প্রভৃতি হয়ত' তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। রাজকুমারকে তাহারা হারাইতে পারিবে না—তাহাকে তাহাদের চাই-ই। রাজকুমার অন্যমনস্কের মত গৃহের উদ্দেশ্যে পা বাড়াইল, অন্যমনস্কের মতই পথ চলিতে লাগিল। বার বার গৃহের কথা মনে হইতেছিল—স্নেহময়ী জননী আর নাই, সমস্ত ঘরগুলি খালি পড়িয়া আছে। জননীর বিশেষ চিহ্ন

রহিয়াছে তাহার মনে। অকস্মাৎ একটা কথা তাহার মনে হইতেই সে থম- কিয়া দাঁড়াইল। ওই গৃহ ত' তাহার পিতা যদু ঘোষালের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। প্রতি ঘরে ঘরে মায়ের পদচিহ্নের যে স্মৃতি রহিয়াছে তাহা যদু ঘোষাল বিলুপ্ত করিয়া দিবে। সে গৃহে মাথা রাখিবার এতটুকু স্থানও তাহার মিলিবে না—জোর করিয়া সেই গৃহের বাহিরে ঠেলিয়া দিবে। বিতা- ড়িত হইবার পূর্ব্বেই বিদায় লওয়া কি ভাল নহে? রাজকুমার আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কি করিবে তাহা স্থির হইয়া ভাবিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। অন্যমনস্কের মতই ফিরিয়া সে ওই সোজা কলিকাতার দিকে চলিয়া যাওয়া পথের দিকে চলিতে লাগিল।

রাজকুমার গৃহে ফিরিল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া দেবু চঞ্চল হইয়া পরাণকে বলিল, কুমার ত' এল না দাদু।

পরাণের মুখ দিয়া কেবল মাত্র বাহির হইয়া আসিল, এল না!

দেবু ভাঙ্গিয়া পড়িল। কুমারকে সে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। এক- দিন তাহার উপর অনেক অত্যাচার সে করিয়াছে সত্য কিন্তু তখন তাহার মন বলিয়া কিছু ছিল না। আজ কুমারের সহিত তাহার অন্তরের মিল হইয়া গিয়াছে—তাহাকে আর নিজের সহিত পৃথক করিয়া সে দেখিতে পারে না। রুদ্ধকণ্ঠে সে যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়া উঠিল, ও কি আমাদের ছেড়ে চলে গেল?

পরাণ বোধ করি চমকিয়া উঠিলেন, নিজেকেই সান্ত্বনা দিবার মত করিয়া বলিলেন, না, ও আমাদের মধ্যেই থাকবে।

কি কথা মনে হইতে দেবু বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই বৃদ্ধের মুখে তখন সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলিবার চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রাজ-

কুমার যে তাঁহার কতখানি তাহা দেবু জানিত, আরও স্পষ্ট ভাবে ওই মুখ তাহাকে সে কথা জানাইয়া দিল। বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাই সে বলিয়া উঠিল, তাই হোক্ দাদু।

পরাণ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তাই হবে ভাই, তাই হবে।

বাহিরে গোকুলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। দরজার সম্মুখে আসিয়া সে কি যেন একটু ভাবিল, একবার মুখ তুলিয়া ভিতরের দিকে চাহিল তারপর ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া চলিল। তখনও তাহার জড়িত স্বর কানে অসিতেছিল, গেছে ত', যাক্। আমিও যাব—সব যাবে।

পরাণ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, দেবু সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল।

*　　*　　*　　*

## ৪

কলিকাতা মহানগরী। প্রাণ চাঞ্চল্যে চঞ্চল। কিন্তু এ চাঞ্চল্য কেবল মাত্র যান বাহনের চলায়, পথিকের দ্রুত পদক্ষেপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কোন্ নাড়ীতে যেন টান পড়িয়াছে—কলিকাতার যৌবন শিহরিয়া উঠিয়াছে। আবাহনী গানে মুখর মহানগরী—বহু আকাঙ্ক্ষিত কোন্ অপরিচিত এক মহাকামনার ধনকে যেন সকলে মিলিয়া আহ্বান করিতেছে। রাজকুমার নিজের ধমনীতেও কিসের এক শিহরণ অনুভব করিল।

রাজকুমারের মন্থর গতি একটু দ্রুত হইল। সারাটা রাত সে পথ চলিয়াছে, আহারের কথা তাহার মনেও ছিল না। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সঙ্গে একটা পয়সাও নাই যে কিছু আহার করিয়া সুস্থ হইযা লয়। সুরভী বা সোমেশ্বরের ঠিকানা সে জানিয়া রাখে নাই—জানা থাকিলে চিন্তার কোনই কারণ থাকিত না। তথাপি একথাও মনে হইল যে সুরভী বা সোমেশ্বরের ভরসায় ত' সে কলিকাতায় আসে নাই। সে তাহাদের সংবাদ লইবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিল না। পথের উপর তাহার মৃত্যু হইলেও আপনা হইতে গিয়া সে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইতে পারিবে না।

সারাটা দিন রাজকুমার কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইল। পথের কল তাহার তৃষ্ণা দূর করিল—অনাহারে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে

চাহিলেও সে হাত পাতিয়া কাহারও সাহায্য চাহিতে পারিল না। মন তাহার দেহকে সোজা করিয়া ধরিয়া রাখিল।

কলিকাতার মনে যে শিহরণ দেখা দিয়াছে তাহা সে নিজের মন দিয়া অনুভব করিতে পারিতেছিল। একদিকে শঙ্কিত ত্রস্ত মানুষ—আর অন্যদিকে উন্মাদনা। খবরের কাগজে দৈনন্দিন ঘটনার বিরাট তালিকা। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, সভা আর শোভাযাত্রা—হাসপাতাল আর জেল। মানুষের হীনতা ও মহত্ত্বের মহামিলন ক্ষেত্র। রাজকুমার যেন কাহার আহ্বান শুনিতে পাইল—সেও যাত্রা করিবে। শোভা বর্দ্ধিত হউক আর নাই হউক যাত্রাপথে তাহাকে পদক্ষেপ করিতে হইবে বই কি!

এক পার্কের গাছের ছায়ায় সে দুপুরটা কাটাইয়া দিল। স্থানটার নাম শুনিয়াছে ভবানীপুর। ১৪৪ ধারা অমান্য করিবার জন্য বালীগঞ্জে এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দেশপ্রিয় পার্কে সভা হইবে এমনি একটা কথা লোকের মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—রাজকুমার সেই শোভাযাত্রায় যোগ দিবে স্থির করিল। সময় মত সে পার্ক হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পথে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শোভাযাত্রা যে দিক হইতে আসিবে সে সেই দিকে চলিতে লাগিল। বহুদূর চলিয়া আসিবার পর সে দেখিতে পাইল যে কুড়ি পঁচিশ জন লোকের এক শোভাযাত্রা মন্থর গতিতে আগাইয়া আসিতেছে। সে দ্রুত সেইদিকে চলিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শোভাযাত্রার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। পতাকাধারীর দিকে চাহিয়াই সে পুলকিত হইয়া উঠিল—সুরভী দেবী! তাহারই একপাশে সোমেশ্বর এবং অপর দিকে চশমাধারী সুশ্রী এক যুবক। রাজকুমার এই অতি সূক্ষ্ম খদ্দরধারী যুবককে চিনিতে না পারিলেও একজন নেতা বলিয়াই বুঝিতে পারিল—তাহার চলার মধ্যে সেই ভাবটা স্পষ্ট ফুটিয়াও উঠিতেছিল।

সোমেশ্বর স্থির সমাহিত ভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া অগ্রসর হইতেছিল, সুরভী এবং অপর নেতাটির দৃষ্টি চঞ্চল ভাবে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। রাজকুমার তাহাদের দিকে দ্রুত গতিতে আগাইয়া চলিল। সুরভীর চঞ্চল দৃষ্টির সহিত তাহার শান্ত দৃষ্টি মিলিত হইল। সুরভী মুহূর্তের জন্য চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুসীতে প্রায় উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, রাজকুমার বাবু!

সোমেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া সুরভীর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে পাইল—আপনা হইতেই তাহার দুইটি হাত সম্মুখের দিকে প্রসারিত হইয়া গেল, মনে হইল এমনি কোন ব্যক্তিকেই যেন এই সময় সে মনে মনে কামনা করিতেছিল।

চশমাধারী যুবক নেতা চাপা মৃদু স্বরে সুরভীকে জিজ্ঞাসা করিল, অমন উত্তেজিত হচ্ছ কেন, ছোক্‌রা কে? যুবকের ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হইয়াও গেল।

রাজকুমার আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেল—সোমেশ্বর একটু সরিয়া গিয়া সুরভীর পাশে তাহার স্থান করিয়া দিল।

সুরভী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, নিজেকে সংযত করিতেও যেন পারিতেছিল না, পতাকাটা আরও একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, কবে এলেন ক'লকাতায়?

রাজকুমার উত্তর না দিয়া একটু হাসিল। চশমাধারী যুবক সুরভীকে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে এই ছেলেটি?

সুরভী যেন এতক্ষণে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল—চশমাধারী নেতাটির সহিত রাজকুমারের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, ইনি হচ্ছেন মনোতোষ বাবু, অল্প

কিছুদিন হল বিলেত থেকে এসেছেন, ব্যারিষ্টার—কোর্টে যান, তবে দরকার হয় না কারণ টাকার কোন অভাব নেই। সুরভী মৃদু হাসিল।

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দুই হাত একত্র করিয়া মনোতোষ বলিল, দেশের কাজকেই নিজের কাজ বলে বরণ করে নিয়েছি কুমার বাবু। আমরাও যদি এগিয়ে না আসি ত' দেশটা বাঁচবে কি করে বলুন ত'! সুরভী দেবীর বাবা বলেন তাঁর ব্যবসায় যোগ দিয়ে তাকে আরও বড় করে দেশের লোকের উপকার করতে। বুঝি, সেটা খুবই ভাল কাজ, অনেক বেকারকে কাজ দেওয়া যায়—যা'হোক মজুরী করেও অনেক লোক তবু খেতে পায়। কিন্তু দেশের কাজ নানা ভাবেই ত' করা যায়! দেশের কাজে হাজার পাঁচেক টাকা খরচ করেছি—কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়ে কিছু কাজ করবারও সুযোগ পেয়েছি। টাকা আমাদের আছে, পেটের চিন্তাও করতে হয় না—দেশের কাজ করবার অধিকার নিয়ে জন্মেছি বলা যায়। মনোতোষ এক নিশ্বাসে অনেকগুলি কথা বলিয়া একটু দম লইল।

আর কোন কথা হইল না। শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। সোমেশ্বর এবং রাজকুমারের মুখে একটা শান্ত সমাহিত ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে। সুরভীর এই স্তব্ধতা ভাল লাগিতেছিল না, সে দুই একবার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল—উহাদের মধ্যে কোন সাড়া আনিতে পারিল না। মনোতোষের মুখ কালো হইয়া গিয়াছিল, নিজেকে সে কিছুতেই প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না—এমন কি সুরভীর কথায়ও সাড়া দিবার মত মনের অবস্থা তখন তাহার ছিল না।

শোভাযাত্রা তখন দেশপ্রিয় পার্কের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। পথের আশে পাশে বেশ ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে—দুই পাশের বাড়ীগুলির দোতলার বারান্দা হইতে অনেক নারী এবং পুরুষ শোভাযাত্রার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

কেহ বা মজা দেখিতেছে, কেহ বা বীর শোভাযাত্রীদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। সকলের মনই এক আসন্ন ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। নারীরা উৎকণ্ঠিত ভাবে পতাকাধারী নারী শোভাযাত্রীর দিকে চাহিয়াছিল—কিছুক্ষণ পরেই হয়ত' এমন একটা কিছু ঘটিয়া যাইবে যেখানে নারীকে তাহারা দেখিতে চাহে না। সোমেশ্বর এবং রাজকুমার ব্যতীত সমস্ত শোভাযাত্রী এবং দর্শকদের মুখেই আসন্ন ঝড়ের জন্য উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওই দুই জন ঘটনা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয় কোন-রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। একলা চলার গান যে তাহারা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

অকস্মাৎ সম্মুখে রাস্তার দুই পাশের জনতা ত্রস্ত ভাবে দৌড়াইতে লাগিল —কোন বিশেষ দিক নির্ণয় করিয়া তাহারা দৌড়াইতেছিল না—সম্মুখের দিক ব্যতীত যে যেদিকে পারিল পা চালাইয়া দিল। শোভাযাত্রা মুহূর্তের জন্য থামিয়া গেল এবং কিসের ধাক্কায় যেন একবার দুলিয়া উঠিল। কিন্তু সে কেবলমাত্র মুহূর্তের জন্যই—সোমেশ্বর এবং রাজকুমার দৃঢ়পদে আগাইয়া চলিল —অন্য শোভাযাত্রীরা ইতস্তত করিবার সুযোগ পাইল না, তাহাদের অনু-সরণ করিল।

মনোতোষ চারিদিকে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

সুরভীও তেমনি ফিস্ ফিস্ করিয়াই বলিল, বোধ হয় পুলিস। তাহার গলাটাও একটু কাঁপিয়া গেল, হাতের পতাকাও মুহূর্তের জন্য একবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

জনতার মধ্য হইতে কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল, পুলিস—পালাও।

দূরে পুলিসের গাড়ী দেখা গেল। শোভাযাত্রা পুনরায় থমকিয়া

দাঁড়াইল। মনোতোষ চীৎকার করিয়া উঠিল, কি সর্ব্বনাশ, এত পুলিস—বিলেতে—।

চারিদিকের গোলমালে তাহার কথা আর শোনা গেল না। যে যেদিকে পারে দৌড়াইতেছিল। পুলিসের গাড়ী নিকটে আসিয়া থামিয়া গেল। গাড়ী হইতে একদল পুলিস এবং কয়েকটা সার্জ্জেণ্ট লাফাইয়া নামিয়া পড়িয়া হাতের লাঠির শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিল। সার্জ্জেণ্টগুলি উন্মত্ত ভাবে চারিদিকের জনতাকে তাড়া করিতে লাগিল, হাতের বেটন এবং পায়ের বুট কোন কিছুই তাহারা বাদ দিল না।

শোভাযাত্রার শৃঙ্খলা আর বজায় রাখা গেল না—অনেকে ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কুড়ি পঁচিশ জনের মধ্যে মাত্র সাত আটজন কোন মতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সার্জ্জেণ্টরা এইবার শোভাযাত্রীদের আক্রমণ করিবার জন্য দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। সুরভীর সমস্ত দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মনোতোষ চীৎকার করিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে থাকা পাগলামী—পালাও সব। সুরভীর হাত ধরিয়া সে আকর্ষণ করিল। সুরভীর হাত হইতে পতাকা পড়িয়া যাইতেছিল—রাজকুমার সেটা ধরিয়া ফেলিল। সুরভী মূর্চ্ছাহতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, দেহ এলাইয়া পড়িতেছে, মুখে এতটুকু রক্তের চিহ্নও আর নাই। মনোতোষ তাহাকে টানিয়া লইয়া নিকটস্থ একটা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সোমেশ্বর, রাজকুমার এবং আর দুইটি মাত্র যুবক ব্যতীত সকলেই পলায়ন করিয়াছে। এই চারিজন অল্প বয়স্ক যুবককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সার্জ্জেণ্টগুলিও মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্ত পরেই দ্বিগুণ উৎসাহে তাহারা ইহাদের আক্রমণ করিল। রাজকুমারের হাত হইতে পতাকা কাড়িয়া লইবার জন্য সমস্ত পুলিস বাহিনীর সে কি আপ্রাণ চেষ্টা!

কিন্তু পতাকাটা রাজকুমার বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছে, যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে পতাকা কেহই টানিয়া লইতে পারিল না। কিন্তু বেশীক্ষণ তাহার জ্ঞানও ছিল না।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল হাসপাতালে। রাজকুমার, সোমেশ্বর এবং আরও দুইজনকে হাসপাতালে সুস্থ করিয়া তুলিয়া বিচারের জন্য চালান দেওয়া হইল।

বিচারালয়ে সুরভী এবং মনোতোষ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উকিল নিযুক্ত করিতে চাহিল, রাজকুমারেরা তাহা অস্বীকার করিল।

সেদিনকার পলায়নের জন্য সুরভী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিল, তাই মাথা নীচু করিয়া সে রাজকুমারকে বলিল, সেদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না কুমার বাবু, আমার সাহস নেই।

রাজকুমার তাহার অবনত মস্তকের দিকে চাহিয়া বলিল, সাহস পাওয়া শক্ত সুরভী দেবী।

মনোতোষ কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই, সে মৃদুস্বরে একটু উদারতার ভাব দেখাইয়াই বলিল, এসব কি মেয়েদের কাজ! আজ ওঁদের সঙ্গে বেশ মজা করে আমিও জেলে যেতে পারতুম কিন্তু তোমাকে রক্ষা করতে গিয়েই সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলুম। তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কতকটা আপন মনেই বলিল, যাক্, তা নিয়ে দুঃখ করব না—সকলের কাজ ত' এক নয়। কেউ দেশের কাজ করবে জেলে গিয়ে, কেউ বা সেই কাজই করবে কর্পোরেশনে ঢুকে, কাউন্সিলে ঢুকে। জেলে যেতে পারলুম না বলে তাই দুঃখ নেই।

রাজকুমার বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক ভাবে তাহার মুখের উপর দৃষ্টি

স্থাপিত করিয়া সোমেশ্বরের দিকে ফিরিয়া চাহিল—সোমেশ্বরের মুখ তখন একটা শান্ত হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে।

বিচারে ছয় মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইল—সশ্রম কারাদণ্ড। রাজকুমারদের মুখে হাসি খেলিয়া গেল। মনোতোষ হাত নাড়িয়া উৎসাহের সঙ্গে বলিল, যান জেলে, কিন্তু আমিও কাজে পেছিয়ে থাকব না, আমার সমস্ত টাকা খরচ হয়ে গেলেও না।

জমাদার আসিয়া রাজকুমারদের কাঠগড়া হইতে নামাইয়া লইল। মনোতোষের উৎসাহ তখনও কমে নাই, তাহাদের নিকটে আগাইয়া আসিয়া বলিতে লাগিল, কর্পোরেশনে, কাউন্সিলে আমরা এভাবে ১৪৪ ধারা প্রয়োগের এবং বিচারের প্রহসনের—সার্জ্জেন্টদের নির্দ্দয় প্রহারের প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গ্রহণের চেষ্টা করব। তারপর একটু থামিয়া অকস্মাৎ সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিবার মত করিয়া বলিয়া উঠিল, দেশ স্বাধীন না হলে কিছুই হবে না, বুঝলেন ?

জমাদারের সঙ্গে রাজকুমারেরা আগাইয়া গেল। দূর হইতে সুরভী বিদায় গ্রহণ করিল—মনোতোষ রুমাল নাড়িতে লাগিল। একটা বাঁক ঘুরিযা তাহাদের দৃষ্টির আড়াল হইবামাত্র সোমেশ্বরের দিকে চাহিয়া রাজকুমার অত্যন্ত বিরক্তি ভরে জিজ্ঞাসা করিল, কত টাকার জোরে ওই লোকটা নেতা হয়েছে ?

রাজকুমারের ক্রোধ দেখিয়া সোমেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, আমাদের মধ্যে যতদিন কাঙ্গালপনা থাকবে ততদিন ওরা নেতৃত্ব করবেই ভাই।

সুবিধাবাদের কাঙ্গালপনা—আদর্শহীনতা !

*　　*　　*　　*

৫

পরাণ নত মস্তকে বসিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন, দেবু আসিয়া বলিল, সে তাহলে এলই না দাদু।

পরাণ চমকিত হইয়া মস্তক উঠাইলেন, তারপর পুনরায় চিন্তার জগতে ফিরিয়া গেলেন, কোন কথাই বলিলেন না। একটু থামিয়া দেবু আবার বলিল, সে আসবে না, আপনি কথা বলবেন না—আমরা তাহলে কি করব দাদু?

পরাণ ম্লান ভাবে বলিলেন, অনেক কাজ করতে হবে আমাদের। যে কাজ আরম্ভ হয়েছে তা যেন থামে না। চাষীরা গণ-আন্দোলনের কম বড় হাতিয়ার নয়।

দেবু পূর্ণোদ্দমে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান চাষীরা একযোগে তাহার সঙ্গে চলিবার জন্য প্রস্তুত। পরাণ রহিয়াছেন সমস্ত কাজের বুদ্ধিদাতা রূপে। এই বৃদ্ধের ত্যাগের কথা তাহারা সকলেই জানে। জানে তাঁহার অন্ধত্ব তাহাদেরই জন্য—এবং আরও জানে যে দরিদ্র জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ওই বৃদ্ধের প্রিয় ইয়াসিন্ প্রাণ দিয়াছে জমিদারের লাঠিয়ালের হাতে। জমিদারদের অত্যাচার অসহ্য। জমিতে কোন কাজ না করিয়াও কি করিয়া যে তাহারা জমিদার হইয়া বসিয়াছে তাহা ভাবিতে এই অজ্ঞ চাষীদের অবাক লাগে। রৌদ্রে পুড়িয়া ও জলে ভিজিয়া দৈনিক

দশ বার ঘণ্টা খাটিয়া যে ফসল তাহারা ফলায় তাহার ভাগ নাগরিক সভ্যতায় বৰ্দ্ধিত ও আরাম কেদারায় শায়িত ব্যক্তিকে কেন যে দিতে হয় তাহা তাহারা ভাবিয়া পায় না। তাই দেবতার দোহাই দিয়া সান্ত্বনা লাভের একটা পথ তাহারা খুঁজিয়া ফেরে।

দেবু এই ভুল ভাঙ্গাইবার কাজে লাগিয়া গেল। ধর্ম্মভীরু, ভগবানে বিশ্বাসী চাষীদের দেবু বুঝাইয়া বলে যে বিলাসে মগ্ন জমিদারকে কখনও তাহাদের ভগবান ভালবাসিতে পারেন না, তাঁহার প্রতিনিধি নিজের সুখ খুঁজিয়া মরে না—দরিদ্রের সঙ্গে সমান ভাবে চলিয়া তিনি ঈশ্বরের জয়গানই করেন। ভাবিয়া দেখ ব্যাস-বাল্মীকি-বশিষ্ঠের কথা—চাহিয়া দেখ বিবেকানন্দ-গান্ধীর দিকে।

দেবুর কথাগুলি দরিদ্র চাষীদের মনে দাগ কাটিয়া বসিয়া যাইতে লাগিল —অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া তাহাদের বিশ্বাস পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সাহস করিয়া সর্ব্বপ্রথম সেই কথা কেহ বলিতে পারে নাই। দেবুর কথায় প্রত্যেকেরই মনের গোপন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রকাশিত হইয়া গেল যে ঈশ্বরের নাম করিয়া তাহাদের আর ভুলাইয়া রাখিবার উপায় নাই। স্বার্থপর মানুষ যে সাধারণ মানুষের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া ওই একটি বস্তুর অন্তরালে বসিয়া নিজেদের ভোগের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়া আসিতেছে তাহা আর গোপন করিয়া রাখার কোন পথ রহিল না। এইবার সম্মুখ যুদ্ধ। সেই স্বার্থপর মুষ্টিমেয় কয়েক জনের শক্তি কোথায়? জনসমুদ্র তাহাদের মুহূর্ত্তে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। এই জনসমুদ্রকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটা প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলিতে পারিলেই হইল। সমস্ত ভাসাইয়া লইতে মাত্র একটি তরঙ্গের অপেক্ষা। দেবু সেই তরঙ্গ তুলিবার কাজে মহা উৎসাহে লাগিয়া গিয়াছিল। জনসমুদ্র মনে মনে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, তাহাদের

দুর্ব্বলতা ভীরুতা ধীরে ধীরে একদিন কাটিয়া যাইবেই। উহা কাটাইবার জন্যই কাজের প্রয়োজন।

দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের একত্র চলা আশেপাশের ছোটখাট জমিদারদের এতটুকুও মনঃপূত হয় নাই। তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিবার জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কাহাকেও বা লোভ দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু দেবু এবং পরাণের আপ্রাণ চেষ্টায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল না।

যদু ঘোষাল পর্য্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারই দুই প্রজা যত অনর্থের মূল! অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একান্ত স্নেহের পাত্রী সতীর বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল—পাত্রও এক রকম স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সতী কিছু দিনের মধ্যেই কলিকাতা হইতে দেশের বাড়ীতে আসিবে। সে আসিয়া পৌছাইলে অনর্থের মূল উৎপাটনে বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। পরাণকে যে সতী কত নিকট আত্মীয় বলিয়া মনে করে তাহা তিনি জানিতেন। সতী হয়ত' আসিয়াই উহাদের দলে যোগ দিবে, হয়ত' অনর্থ বাড়াইয়া তাহার সর্ব্বনাশই করিয়া বসিবে। মনে মনে যদু ঘোষাল এক সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলেন।

*

*            *

হরিমোহন কন্যা সুরভীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আজ কালকার কথা কিছুই বলা যায় না! তাঁহার ন্যায় কোটীপতির কন্যা হইয়াও হয়ত' একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া জনগণের স্বদেশী করিয়া বসিবে।

হরিমোহনের সে কথা ভাবিতেও সমস্ত দেহে জ্বালা ধরিয়া যায়। এই সব বাজে কাজের জন্য ত' রাস্তাঘাটে কত লোক রহিয়াছে—কত বেকার

কাজের জন্য ঘুরিয়া মরিতেছে। এই কাজে কিছু দিন লাগিয়া থাকিলেই ত' জেলের ভাত জুটিয়া যাইবে—অর্থাৎ কয়েক মাসের জন্য বেকার সমস্যার সমাধান! তাহারও যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিছুদিনের মধ্যেই সাবান-সেণ্টের কারখানাটা দ্বিগুণ আকার ধারণ করিয়াছে—কাপড়ের কল দুইটা আরও কয়েক বিঘা স্থানে প্রসার লাভ করিয়াছে, কাঁচ কল, চট কল বেশ ফাঁপিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের লোকের মনে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতেছে বলিয়া তিনি নেতাদের দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, সময়ে অসময়ে দুই চার হাজার টাকা দিয়া দেশপ্রেমিক বলিয়া নামও করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি অতি আদরের কন্যাকে—না, তাহা হইতেই পারে না।

সুরভীর জন্য তিনি মনে মনে মনোতোষকে পছন্দ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধনীর পুত্র মনোতোষ, দেখিতে বেশ সুশ্রীও বটে। পাতলা খদ্দরের পোষাকে একেবারে ভারতের অন্যতম প্রধান নেতা বলিয়া মনে হয়। বিদ্যা আছে, বিশেষ করিয়া আছে অর্থ—কলিকাতার মেয়র রূপে শ্রেষ্ঠ নাগরিক বলিয়া একদিন নিশ্চয় সে সম্মান লাভ করিবে। কিছু টাকা ঢালিতে পারিলে ভবিষ্যতে আরও কত কি হইবার সম্ভাবনাও ত' রহিয়াছে!

মনোতোষের একমাত্র দোষ এই যে সে কিছুতেই ব্যারিষ্টারী ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নয়—ব্যারিষ্টারীতে অর্থ তাহার হয় না, প্রয়োজনও নাই। দেশের নেতা হইতে গেলে বড় ব্যারিষ্টার, উকিল, ডাক্তার বা ওই ধরণের একটা কিছু না হইলে নাকি হয় না।. নজিরও রহিয়াছে যথেষ্ট। কিন্তু না, মনোতোষকে বিশ্বাস করা যায়—সে মূর্খ হইবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতারা যেমন নেতৃত্ব ও অর্থ উভয়ই বজায় রাখেন সে তাহাদেরই মত সব দিক রাখিয়াই চলিতে পারিবে—চাই কি সমস্ত বজায় রাখিয়া প্রথম শ্রেণীর নেতা

হইয়া পড়াও তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। বেশ বুদ্ধিমান ছেলে ওই মনোতোষ।

কন্যার বিবাহের জন্য একটু বেশী ব্যস্ত হইবার একটা বিশেষ কারণও ছিল। মনোতোষ একদিন একটু চিন্তিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাজকুমার নামে কাউকে জানেন ?

হরিমোহন অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিয়া বলিয়াছিলেন, না।

মনোতোষের মুখ দিয়া কেবলমাত্র 'হুঁ' শব্দটা বাহির হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত মুখ বিষাদে একেবারে কালো হইয়া উঠিয়াছিল।

হরিমোহনের তাহা ভাল লাগে নাই—ওই 'হুঁ'র মধ্যে বিপদের ইঙ্গিত পাইয়া তিনি সচকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মনোতোষের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ছেলেটি কে ?

মনোতোষ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিয়াছিল, জানিনা, স্বদেশী করে—ছ'মাসের জন্যে জেল হয়েছে।

হরিমোহন চক্ষু বুঁজিয়া কি যেন একটু ভাবিয়া লইয়া পুনরায় চক্ষু খুলিয়া সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ছেলেটি দেখতে কেমন ?

এ প্রশ্নের জন্য মনোতোষ প্রস্তুত ছিল না, সে বেশ একটু চমকিয়া গিয়াছিল কিন্তু মিথ্যা বলিতে পারে নাই, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু স্বরে বলিয়াছিল, অপরূপ! অমন রূপ, নাক চোখ, রং আমি বোধ হয় বিলেতেও দেখিনি। মনোতোষ আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে নাই—ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গিয়াছিল।

ছেলেটির রূপ আছে জানিয়া হরিমোহনের মন্দ লাগে নাই। অর্থবান কোন ব্যক্তির হাতে না হইলে সুরভীকে দিতে পারিবেন না এমন কথাও কোন দিন তিনি মনে করেন নাই। কিন্তু যে জেলে যাইতে এতটুকু

ইতস্তত করে না তাহার হাতে কোনদিনও তিনি সুরভীকে তুলিয়া দিতে পারিবেন না। বিশেষ করিয়া এক্ষেত্রে মনোতোষ সুশ্রী এবং তাহার ভবিষ্যৎও যথেষ্ট উজ্জল—হয়ত একদিন সমস্ত ভারতময় তাহার প্রশংসাধ্বনি শোনা যাইবে, শ্বশুরের মুখও হয়ত একদিন তাহার প্রভায় ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিবে।

রাজকুমারের রূপ তাই ভয়ের কারণ হইয়াই দেখা দিতে পারে। রাজকুমার কয়েক মাসের জন্য তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া জেলে গিয়াছে—বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই সুরভীর বিবাহ কার্য্য শেষ হইয়া যাওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় কার্য্য হরিমোহন কোনদিন ফেলিয়া রাখিতেন না। স্বাধীন ভাবে বড় হইয়া ওঠা কন্যার মনোভাব জানিবার জন্য একদিন তিনি তাহাকে নিকটে ডাকিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, আমার বয়েস হয়েছে, তোমার মা-ও নেই। সবদিক আমাকেই ত' দেখতে হয় মা।

সুরভী কোন কথা বলিতে পারিল না, পিতা কি বলিবার জন্য ডাকিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় তাহার কান দুইটা একটু লাল হইয়া উঠিল, সে ঈষৎ মাথা নীচু করিল।

হরিমোহন সুরভীকে একটু সময় দিলেন, তারপর পুনরায় বলিতে লাগিলেন, আর ত' আমার অপেক্ষা করা উচিত হয় না মা। তারপর একটু থামিয়া কন্যার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, মনোতোষকে আর কতদিন-ই বা অপেক্ষা করিয়ে রাখব। কন্যাকে একটু ভাবিয়া উত্তর করিবার সুযোগ দিবার জন্য হরিমোহন থামিলেন।

সুরভী তথাপি কোন কথা বলিতে পারিল না—চক্ষু খুলিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিবার শক্তিও তাহার ছিল না।

সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া হরিমোহন বলিলেন, কই জবাব দিলে না মা?

সুরভী ইতস্তত করিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল, আর কিছুদিন পরে বাবা।

হরিমোহন মনে মনে শঙ্কিত হইলেন, মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, অনেকদিন থেকেই ত' সে অপেক্ষা করে আছে—নিজে কোন কথা কোন দিন বলেওনি। কিন্তু আমাদেরও ত' একটা ভদ্রতা করবার আছে। বিয়ে না হয় দু'মাস পরে হবে কিন্তু পাকা কথাটা ত' দিয়ে দেওয়া যায়।

চক্ষু পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ রাখিয়াই সুরভী বলিল, কথাটাই ত' সব বাবা।

হরিমোহন এবার সত্যই ভয় পাইয়া গেলেন কিন্তু এতদিনের পাকা ব্যবসায় বুদ্ধি লইয়া কন্যার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, মনোতোষ আমার কথায় অপেক্ষা করতে পারবে—তার মধ্যে ভদ্র মন আছে। কিন্তু তোমার মা থাকলে কিছুতেই তিনি অপেক্ষা করতেন না। অমন ছেলেকে জামাই করে তিনি গর্ব্বিত হতেন। ভবিষ্যতে সে অনেক বড় হবে। ওর শ্বশুর হতে পারলে আমারও বুকে জোর বাড়ে। যেন দম লইবার জন্যই তিনি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন। কথাগুলি কন্যার মনের উপর কি ভাবে ছাপ রাখিয়া যায় তাহাই দেখিবার জন্য তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন, তারপর মনে মনে কিছুটা প্রসন্ন হইয়া শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া অতি ধীরে যেন অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেছেন এই ভাবে থামিয়া থামিয়া বলিলেন, তবে তোমার যদি তাকে অপছন্দ হয়—আমি ত' না করতে পারব না, সে যত কষ্টই আমার হোক না কেন। তোমার মা তাহলে কোনদিন আমাকে ক্ষমা করবেন

না—স্বর্গবাসিনীর প্রতি আমি হাত জোড় করে থাকব, তবু তোমাকে ত কষ্ট দিতে পারব না মা।

সুরভীর সহের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, দুই চক্ষু তাহার ভারী হইয়া উঠিল, মাথা নীচু করিয়া শান্তস্বরে সে বলিল, তোমার ইচ্ছায় অমত করব না বাবা।

হরিমোহন জয়লাভ করিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই ভাবপ্রকাশ না করিয়া কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, আমার মুখের দিকে চেও না মা, নিজের মনের দিকে চাও।

নিজের মনের মধ্যে সুরভী কোন দিন বিশেষ করিয়া কোন কিছু দেখে নাই। রাজকুমারের উজ্জ্বল মুখ তাহার ভাল লাগিত—সে যেন বীর নায়ক, মুক্তির দূত রূপে স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। তাহার একান্ত নিকটে বসিয়া তাহার সেবা করিবার কল্পনা একেবারে কোনদিনও জাগে নাই এমন নহে কিন্তু তাহার অতি নিকটে বসিয়া থাকিবার শক্তি কোন দিনও তাহার হইবে বলিয়া মনে হয় নাই। মনোতোষের মুখের উপর যে আত্মসমর্পণের ভাব সে দেখিয়াছে তাহাকে বশ করাই তাহার পক্ষে সম্ভব। সেই মুখে একটা চাতুর্য্যের দীপ্তিও রহিয়াছে—জগতের সমস্ত সম্মান আত্মসাৎ করিয়া লইবার একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষাও তাহাতে বেশ দেখা যায়। সুরভী জগতকে ভাল-বাসে, দেবদূতকে স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা তাহার নাই। তথাপি রাজকুমার তাহার মনের মধ্যে একটা স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে—আরও কিছুদিন নির্জ্জনে একাকী থাকিয়া সে দেখিতে চাহিতেছিল যে সেই স্পন্দনের গতি কোন দিকে। কিন্তু সে সুযোগ তাহার মিলিল না। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল, যাইবার সময় মৃদুস্বরে বলিয়া গেল, তোমার ইচ্ছাই আমার সব বাবা।

হরিমোহনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বসিয়া বসিয়া তাহাই তিনি উপভোগ করিতে লাগিলেন—মনোতোষ বৃথাই ভয় পাইয়াছিল।

*

*　　*

পরাণের গৃহে আগুন লাগিয়াছে। তিনি বাহিরে আসিয়া হাতের লাঠিতে ভর করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ফট্ ফট্ করিয়া বাঁশ ফাটিবার শব্দ হইতেছে—আগুনের ক্রুদ্ধ শিখা সন্ সন্ করিয়া চারিদিকে ছুটিতেছে, পরাণ তাঁহার অন্ধ দৃষ্টি সেইদিকে প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

তখন গভীর রাত্রি। শব্দ শুনিয়া অনেকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—চারিদিক লাল হইয়া ওঠায় সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। গ্রামে আগুনকে বড় ভয়! সহরের ন্যায় দমকল নাই, পুকুরে জলও সামান্য—যে কোন সময়ে নিকটস্থ গৃহে আগুন লাগিয়া যাইবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে দেবুর দলও আসিয়া পড়িল। পরাণ তখন একটা গাছের গুঁড়ির পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, দেবু তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল স্বরে পতনোন্মুখ ঘরটার নিকটে গিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, দাদু।

সেই ব্যাকুলতা মাখা ডাক শুনিয়া পরাণ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, বেঁচে আছি ভাই।

দেবু পরাণের নিকটে আসিয়া বলিল, কিছুই ত' বাঁচবে না দাদু।

পরাণ স্মিত হাস্যে বলিলেন, ইয়াসিন্ যে প্রাণেও বাঁচেনি!

এই কথার উত্তর দিবার ক্ষমতা দেবুর ছিল না, সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার দৃষ্টি তখন জ্বলন্ত ঘরগুলির দিকে নিবদ্ধ হইয়া ছিল।

তাহার দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনিয়া পরাণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, দুঃখ করোনা, এতদিন মাথা গুঁজে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, এবার পথ নিজেই হাত ধরে নিয়ে যাবে। তারপর একটু থামিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে বলিলেন, সামনের আর কারও ঘরে আগুন লাগবার ভয় নেই ত' ?

আর কাহারও গৃহে আগুন লাগিয়া যাইবার আর তখন কোন আশঙ্কা ছিল না। সকলের চেষ্টায় পরাণের গৃহের আগুন প্রায় নিভিয়া আসিয়াছিল —অবশ্য গৃহেরও কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আশে পাশের অন্যান্য বাড়ীর ঘরগুলির চালা ভিজা কাপড় এবং কাঁথা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দেবু রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এ কিসের শাস্তি ?

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া পরাণ বলিলেন, শাস্তি নয়, পুরস্কার।

দেবু পরাণের কথা বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল, পরাণ তাহার এই স্তব্ধ হইয়া যাওয়ার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কতকটা আপন মনেই বলিলেন, এতদিন মন ঘরের মেঝেয় মাথা খুঁড়ে মরেছে—এবার সমস্ত পৃথিবীই আমার ঘর হয়ে গেল।

দেবু তাঁহার কথার অর্থ ঠিকমত ধরিতে পারিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার বাড়ীতে চলুন দাদু।

পরাণ স্মিত হাস্যে বলিলেন, তা আর হয়না দেবু। তারপর দেবুর মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, তুমি একাই তোমার ঘর জ্বালাতে পারবে ভাই, আমাকে কোন দরকার হবে না।

অকস্মাৎ একধার হইতে মিষ্টি নরম স্বরে কে যেন ডাকিল, দাদু।

দেবু ফিরিয়া চাহিল, পরাণ চমকিত হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিলেন, কে, সতী দিদি ?

পরাণের প্রসারিত হাত ধরিয়া সতী ম্লান ভাবে বলিল, আমার সঙ্গে চলুন দাদু।

পরাণের মুখের উপর হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তিনি বলিলেন, কবে এলে দিদি ?

সতী বলিল, হঠাৎ আজ রাত্রেই ফিরেছি। তারপর একটু থামিয়া বলিল, কিন্তু এ কি হয়ে গেল দাদু ?

পরাণ সতীর হাতটা বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, অনেকদিন পর নিশ্চিন্ত হলুম।

সতী পরাণকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, কুমারদাদের বাড়ীতে আপনি সংসার উঠিয়ে নিয়ে চলুন।

পরাণ বলিলেন, সে বাড়ীও যদু ঘোষালের।

সতী হাসিয়া বলিল, সেও ত' আমারই দাদু।

পরাণ সুন্দর ভাবে হাসিয়া বলিলেন, চোখ দু'টো আমার নেই, আগুনের শিখাও দেখতে পাইনি—তাই বুঝতে পারিনি দিদি যদু ঘোষালের রাগ কতখানি হয়েছিল।

ইঙ্গিতটা সতী ধরিতে পারিল, আর একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না—সে স্তব্ধ হইয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

ভোর হইয়া আসিতেছিল, কাকের ডাকে পরাণ তাহা বুঝিতে পারিয়া সতী এবং দেবুকে অশীর্ব্বাদ করিয়া লাঠি ভর দিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া পথ বাহিয়া চলিলেন।

দেবুর দিকে চাহিয়া অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে সতী বলিল, দাদুকে ফেরাও।

দেবু কেবলমাত্র ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

* * * *

## ৬

জেলে রাজকুমারদের প্রায় তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। জেলের অভিজ্ঞতা রাজকুমারের অনেক দিন মনে থাকিবে, বিশেষ করিয়া প্রথম দিনের কথা সে কোন দিন ভুলিতে পারিবে না।

ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, কোর্ট পুলিস তাহাদের জেল কর্তৃপক্ষের হাতে পৌছাইয়া দিয়া গেল। নূতন অভিজ্ঞতা করিতে চলিয়াছে তাহারা।

জেল গেটে প্রবেশ করিতেই দেশী ওয়ার্ডার আসিয়া তাহাদের জোড়া জোড়া করিয়া বসাইয়া দিল। চোর, পকেটমার প্রভৃতির সঙ্গে স্বাধীনতাকামীরা একই সারিতে বসিয়া গেল। সার্জ্জেণ্ট হাঁকিয়া বলিল, কয়ঠো চালান আয়া ?

কোর্ট পুলিসের জমাদার কতকগুলি কাগজ সার্জ্জেণ্টের হাতে দিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। চালানের কাগজ বোধ হয় !

রাজকুমারের হাসি পাইতেছিল—তাহারা চালানি মাল নাকি ? তাহাদের কত মূল্য একবার জিজ্ঞাসা করিয়া লইলে হইত না !

সার্জ্জেণ্ট কাগজগুলি উল্টাইয়া একে একে নাম ডাকিতে লাগিল, প্রথমেই ডাকিল, রাজকুমার ঘোষাল।

সার্জ্জেণ্টের ভাবভঙ্গী দেখিয়া রাজকুমারের বেশ মজা লাগিতেছিল, সে কেবল মাত্র ঘাড় নাড়িয়া নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিল। সার্জ্জেণ্ট চোখ তুলিয়া তাহার দিকে একবার চাহিয়াই হাঁকিল, বাপ কা নাম ?

রাজকুমার কোন উত্তর না করিয়া মৃদু হাসিল। সেই হাসি দেখিয়া সার্জ্জেণ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া টেবিলে একটা ঘুঁসি মারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বাপ কা নাম কেয়া ?

রাজকুমার চুপ করিয়াই রহিল, সার্জ্জেণ্ট হাতের কাগজটার দিকে চাহিল, কি একটু দেখিয়া লইয়া বিরক্তি ভরে কতকটা আপন মনেই বলিল, হুঁ, বোগুেমাটরম্। কাগজটাকে একপাশে ফেলিয়া রাখিয়া সে আর একটা কাগজ তুলিয়া লইল।

সকলের নাম ডাকা হইয়া গেলে এক দেশী ওয়ার্ডারের সঙ্গে তাহাদের ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া সার্জ্জেণ্ট নিশ্চিন্ত হইল।

ওয়ার্ডার রাজকুমারের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কতদিন মেয়াদ দিয়েছে বাবু ?

তাহার কথার মধ্যে একটা সম্ভ্রমের সুর অনুভব করিয়া রাজকুমার একটু বিস্মিত হইয়াই বলিল, ছ' মাস।

ওয়ার্ডার তাহার সঙ্গীদের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পিকেটিং করেছিলেন বুঝি ?

রাজকুমার মাথা নাড়িয়া বলিল, না, শোভাযাত্রা করেছিলাম ১৪৪ ধারা অমান্য করে।

ওয়ার্ডার সকলকে লইয়া ঘন্টিঘরের নিকট উপস্থিত হইল। ডান পাশে ঘন্টিঘর—তাহার উপব জলের ট্যাঙ্ক, সমস্ত জেলে ওই ট্যাঙ্ক হইতেই জল সরবরাহ করা হয়। ট্যাঙ্কের একপাশে একটা বড় ঘণ্টা টানান, একজন প্রহরী সব সময়েই সেই খানে থাকিয়া পাহারা দেয় এবং ঘণ্টা বাজাইয়া সময় নির্দ্দেশ করে। ঘন্টিঘরের উপর হইতে সমস্ত জেলটাই দেখা যায়।

তাহারা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেই বড় জমাদার হাঁকিয়া আদেশ করিল, বড়া হাজত, দো নম্বর উপরমে লে যাও।

যে জমাদারের উপর তখনকার কার্য্যভার ছিল সে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, স্বদেশী বাবুদের ভি !

বড় জমাদার বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, লিখা হো গয়া।

দুই নম্বর বড় হাজতে সেদিনকার মত অন্যান্য সকলের সহিত রাজকুমাররা স্থান পাইল। পাতিয়া শুইতে এবং মাথায় দিবার জন্য দুইটা করিয়া অত্যন্ত অপরিষ্কার কম্বল তাহাদের দেওয়া হইল। থালাবাটী আর সেদিন মিলিল না এবং সেই সঙ্গে মিলিল না কোন আহার্য্য। রাজকুমারদের আহারের ইচ্ছাও ছিল না।

রাজকুমারদের সঙ্গে যাহারা আসিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই এই হাজত হইতে বিচারালয়ে গিয়াছিল। অনেকেরই তারিখ পড়িয়াছে—মাস ছয় ধরিয়া বিচারের তারিখই পড়িতেছে এমন লোকেরও অভাব নাই। দুই চারিজনের মেয়াদ হইয়া গিয়াছে। নূতন আমদানীও কিছু হইয়াছে।

তাহারা প্রবেশ করিতেই কলরব পড়িয়া গেল। বাহিরের সংবাদ আর একবার সকলে নূতন করিয়া ঝালাইয়া লইতে চায়। প্রতিদিনই ইহার পুনরাবৃত্তি হয় বটে কিন্তু তাহাতে কাহারও বিরক্তি নাই। ইহারা যেন অন্য জগতের জীব। কোন্ ভুঁড়িওয়ালা দারোগা কবে স্বীকারোক্তি করাইবার জন্য কাহার উপর অত্যাচার করিয়াছে, কোন্ দারোগা হাত আড়াল দিয়া ঘুষ লইয়া পরমুহূর্ত্তে গোঁফে চাড়া দিয়া জোয়ান সিপাহীদের দিয়া জুতা মারাইয়াছে ইহা লইয়াই তাহাদের আলোচনা।

পরস্পরের সহিত আলাপ শেষ হইলে হাঁপানী রোগীর ন্যায় শুক্‌নো

চেহারার দাগী চোর দাশু রাজকুমারদের দিকে চাহিয়া বলিল, ওরা আবার কারা? দেখতে ত' বেশ রাজপুত্তুরের মত, সরিয়েছে কি?

রাজকুমারদের সহিত যাহারা আসিয়াছিল তাহাদের একজন বলিল, দেখছিস্ না স্বদেশী বাবু—ধুতি জামার দিকে চেয়ে দেখ্ না।

সকলের চক্ষেই একটু সম্ভ্রমের ভাব ফুটিয়া উঠিল। স্বদেশী বাবু! দাশু মাথা নাড়িয়া বলিল, বেশ আছে এই স্বদেশী বাবুরা, সার্জেন্টগুলো ওদের প্রাণ খুলে মারে আবার ভয়ও করে।

কে একজন বলিল, ওদের এখানে পাঠিয়েছে কেন?

রমজান বলিল, বদ্‌মায়েসী, একদিন না খাইয়ে মিছে কষ্ট দেওয়া। অন্য স্বদেশী বাবুদের কাছে পাঠালে যে এই রাত্রেই খাবার দিতে হবে— নইলে পাগলা ঘন্টির ব্যাপার হয়ে পড়বে। স্বদেশী বাবুরা কি সহজ রে বাবা!

দাশু দার্শনিকের মত মুখ ভঙ্গী করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া বলিল, বাবুদের কপাল ভাল, জেলে ঢুকতে না ঢুকতেই ফাঁসী দেখতে পাবে। আমি ত' বাবা সাত বার ঘুরে গেলাম একটা মাত্র দেখেছি। একেই বলে কপাল!

ফাঁসীর কথা বোধ হয় অনেকেই কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিল। দাশু কথাটা মনে করাইয়া দেওয়ায় কয়েকজন জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। মঞ্চ প্রস্তুত হইয়া আছে, কয়েক ঘণ্টা পরে একটা প্রাণ সে হরণ করিয়া লইবে। সে প্রাণ বাঁচাইবার আর কোন উপায় নাই, শত সহস্র বার মাথা কুটিয়া মরিলেও তাহাকে সময়ের অতিরিক্ত পাঁচ মিনিটও কেহ বাঁচাইয়া রাখিবে না। জেলের ঘণ্টা প্রতি ঘণ্টায় বাজিয়া উঠিয়া তাহার বুকের রক্ত হিম করিয়া দিতে থাকিবে। অবশিষ্ট জীবন সে জগতের মঙ্গলের

জন্য ব্যয় করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দিলেও কেহ তাহাকে বাঁচাইতে আসিবে না। কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, কি এক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া সে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে—সেই মুহূর্ত্তের অপরাধ ধুইয়া ফেলিবার শত ইচ্ছা থাকিলেও আর তাহার সুযোগ মিলিবে না।

দাশু সকলের অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়া রাজকুমারদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, এখানে থাকবেন না বাবু, আমাদের কাছে আপনাদের থাকা ভাল দেখায় না।

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন তোমরা কি ?

লোকটা দাঁত বাহির করিয়া একটু হাসিল, তারপর অত্যন্ত সহজ ভাবেই বলিল, আমরা হচ্ছি বাবু সব দাগী, খারাপ লোক, আর আপনারা হচ্ছেন গিয়ে স্বদেশী বাবু। আমাদের কাছে কি আপনাদের থাকা চলে কখনও ?

সোমেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, অন্য স্বদেশী বাবুরা কোথায় থাকে ?

দাশু যেন মুখস্থ হইয়া গিয়াছে এই ভাবে বলিল, দশ, এগার, বার, সিক্লিগেসন, মেসডেম—সব স্বদেশী বাবু। স্বদেশীর কাজ খুব হচ্ছে কিনা এখন —রোজ আসছে ত' আসছেই। বাবুদের রাখতে হলে আমাদের সব ছেড়ে দিতে হবে একদিন। দাশু হা, হা করিয়া জোরে জোরে হাসিয়া উঠিল।

জানালার নিকটে গিয়া যাহারা ফাঁসীর মঞ্চের দিকে চাহিয়াছিল দাশুর হাসি শুনিয়া তাহারা সকলে ফিরিয়া চাহিল। স্বদেশী বাবুদের সঙ্গে সে বেশ জমাইয়া বসিয়াছে দেখিয়া অনেকে ঈর্ষান্বিত—হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যাহারা একটু পুরাতন তাহারা আগাইয়া আসিয়া নিকটে বসিল।

রমজান বলিল, স্বদেশী হয়ে কি হবে বাবু?

সোমেশ্বর বলিল, দেশটা আমাদের হলে অনেক কষ্ট দুর হবে, গরীবরা ভাল করে খেয়ে পরে বাঁচবে। পুলিসের জুলুমও কমবে।

আন্দু বলিল, কমবে বাবু! আঃ, বেটারা বড় কষ্ট দেয়, কানে আমার ঘা করে দিয়েছে—সাহুল্লার নাম বলব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুন বাবু, তিনটে সিপাহী বুট দিয়ে বুক মাড়িয়ে দিয়েছে—মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়, বাইরে বেরিয়ে সেই দারোগা বেটার—। ক্রোধের উত্তেজনায় সে কথা শেষ করিতে পারিল না, মুষ্টি বদ্ধ হাত শূন্যে তুলিয়া একবার আন্দোলিত করিল মাত্র।

দাশু বলিল, আপনারাই তখন দারোগা পুলিস হবেন ত' বাবু, আমাদের একটু দয়া করবেন —গরীব বেচারাদের জেলের খাওয়াটা আর একটু ভাল করে দেবেন। তরকারীতে খালি ঘাস আর বুড়ো বেগুন, এক টুকরো আলুর দেখাও মেলে না। সপ্তাহে যে মাছ মাংসের বরাদ্দ আছে তা বিঁড়ি ঘুষ না দিলে এক টুকরোও পাতে পড়ে না, এগুলো একটু দেখে যাবেন। স্বদেশী হলে আমরা যেন সেই আগের মতই না থেকে একটু ভাল ভাবে থাকতে পাই বাবু।

রাজকুমার বলিল, কেন, তোমরা ভাল হবে না?

রমজান বলিল, আমাদের কি আর ভাল হবার বয়েস আছে! এই শেষ বয়েসে আর ওসব কেন? বউ ছেলে চোখের সামনে মরেছে তবু ভাল হতে পারিনি, যে রকম আছি সেই রকমই কাটিয়ে যাই—একটু ভাল খাবার পেলেই আমাদের হল।

আন্দু বলিল, স্বদেশীদের একটা বড় দোষ আছে বাবু।

কথাটা যেন একটু নূতন বলিয়া মনে হইল। স্বদেশী বাবুদের নিকট এতক্ষণ অনুরোধ উপরোধ-ই চলিতেছিল, তাহাদের দোষের কথা কেহ বলে নাই। আন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া সোমেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, কি দোষ?

আন্দু একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, নেশা করতে মানা করেন কেন?

সকলেই একবাক্যে আব্দুকে সমর্থন করিল। স্বদেশী বাবুদের এই নিষেধ তাহারা কিছুতেই মানিয়া লইবে না। নেশা না করিলে আর আমোদ কোথায়!

সোমেশ্বর-রাজকুমার শত চেষ্টা করিয়াও তাহাদের বুঝাইতে পারিল না। বোধ হয় তাহাদের এই বুঝাইবার চেষ্টার প্রতিবাদ স্বরূপই কিছুক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে নেশা করিবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। গাঁজা, চরস, ভাঙ্গ এমন কি মদ পর্য্যন্ত! তিন নম্বর শ্রেণীর হাজতীরা দৈনিক মাত্র পাঁচটা করিয়া বিঁড়ি আনিতে পারে এবং যাহারা মেথরের কাজ করে তাহারা জেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যহ মাত্র চারিটা করিয়া বিঁড়ি পায়। ইহা ব্যতীত অন্য শ্রেণীর নেশা জেলে প্রবেশ করিবার নিয়ম নাই। কিন্তু সহজ পথে যাহা আসিতে পায় না বাঁকা পথে তাহা অতি সহজেই আসিয়া পৌছায়—কিছু বেশী অর্থ ব্যয় হয় এই মাত্র। এই সব দাগী কয়েদীরা অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত নহে। অনেকেরই গলার থলিয়াতে গিনি পর্য্যন্ত থাকে, যাহাদের অর্থ নাই তাহারা ইহাদের তাঁবেদারী করে—হাত পা টিপিয়া দেয়। এই ভাবেই জেলের মধ্যেও বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়, পরস্পরের মধ্যে রেশারেশিও চলে। বাহিরের জগতেও সেই দলগুলি টিকিয়া থাকে। জেল ইহাদের শিক্ষাকেন্দ্র।

রাজকুমার-সোমেশ্বরেরা বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ সেই উন্মত্ত মানুষগুলির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর তাহারা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শুইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। এই সময় সিপাহী বদল হয়। বদলী সিপাহী আসিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, এই হাল্লা বন্ধ্ কর।

নয়টার পর আর কথা বলিবার নিয়ম নাই। দেখিতে দেখিতে চারিদিক স্তব্ধ হইয়া গেল। স্বদেশী বাবুদের চীৎকার এবং গান মাঝে মাঝে ভাসিয়া

আসিতেছে—তাহারা ত' আর আইন মানে না! রাজকুমারেরা শুইয়া পড়িয়াছিল, দাশু চুপি চুপি নিকটে আসিয়া বলিল, খুব ভোরে উঠবেন—একটা মজা দেখতে পাবেন তাহলে।

রাজকুমার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কি মজা?

দাশু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, ফাঁসী।

রাজকুমারের বুক কাঁপিয়া উঠিল, চারিজনেই চমকিয়া উঠিয়া বসিল। আত্মহারার মত শূন্য দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া রাজকুমার অন্যমনস্কের মত বলিয়া উঠিল, ফাঁসী!

দাশুর তখন নেশা জমিয়া উঠিয়াছিল, খুব মজা হইবে এইরূপ ভাব দেখাইয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিল, হ্যাঁ, ভারী মজা, ব্যাটা যেমন অন্যের বুকে ছুরী চালিয়েছে নিজেরও তেমনি হবে—হাত বেঁধে পা ছড়িয়ে দিব্যি মজা করে দুলবে। দাশু এতটুকু শব্দ না করিয়া হা, হা করিয়া হাসিল।

সোমেশ্বর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কি করেছিল সে?

দাশু নেশার ঘোরে মিটি মিটি হাসিতেছিল কিন্তু জ্ঞান তাহার পূরা মাত্রায় রহিয়াছে। সহজভাবেই ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, যেমন হয় সব। না খেতে পেয়ে বউ ছেলেকে কেটে থানায় গিয়ে ধরা দেয়। ব্যাটা আচ্ছা বোকা, নিজে স্বীকার না করলে কি আর ফাঁসী হতে পারে, হাকিমের সামনে পর্য্যন্ত সব স্বীকার করলে!

তাহারা চারিজনেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল—অনাহারের করুণ ইতিহাস! ঘরে ঘরেই এই কাহিনী—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ইহারাই ত' ইন্ধন জোগাইতেছে। লোকটার মনের জোর আছে। পাপে ভরা এই পৃথিবীতে সে স্ত্রী পুত্রকে বাঁচিয়া থাকিতে দিল না—নিজেকেও সেই সঙ্গে বলি দিয়া গেল।

দাশু তেমনি হাসিয়াই বলিল, ওর বোকামীর শাস্তি কাল খুব ভোরেই পাবে—ঠিক ছটার সময়। জগৎটা সেয়ানা হয়ে গেছে, বোকাদের সে আর স্থান দেবে না।

রাজকুমার অন্যমনস্কের মত বলিল, বিচারক ওকে মাপ করলে না ?

দাশু যেন হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িতে চাহিল, বলিল, হয়ত' মাপ করত কিন্তু ও নিজেই তা' করতে দিলে না—হাত জোড় করে বার বার এই শাস্তিই চেয়ে নিলে, মরুক্ গে বোকাটা।

তাহারা চারিজনেই চুপ করিয়া রহিল। জেলে আসিয়া প্রথম প্রভাতেই একটা মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তাহাদের দেখিতে হইবে।

দাশু কি বুঝিল সেই জানে, হাত মুখ নাড়িয়া বলিল, কিছু ভাববেন না, ঠিক ভোরে আমি আপনাদের তুলে দেব। একটা বড় অভিজ্ঞতা বাবু।

অভিজ্ঞতাই বটে! জীবন্ত টাট্‌কা তাজা মানুষকে অবধারিত মৃত্যুর সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া প্রথম কিছুদিন মজা করা, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহার বুকের রক্ত জমাট বাঁধাইয়া শেষ মুহূর্ত্তে একটা অর্দ্ধ মৃত মনুষ্য দেহকে বদ্ধ ভূমিতে লইয়া গিয়া ঘড়ির কাঁটা মিলাইয়া বিচারকের আদেশ পালনের প্রহসন—এ কি কম অভিজ্ঞতা! সেই ঘড়ি হয়ত' কত' হিসাব করিয়া মিলাইয়া রাখা হইয়াছে রেডিওর ঘড়ির সঙ্গে। এক মিনিট পূর্ব্বে যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া না যায়—এক মিনিট বেশীও যেন তাহাকে না বাঁচাইয়া রাখা হয়। এই এক মিনিটের জন্য হয়ত' আইন চোখ রাঙাইয়া কত প্রশ্ন করিয়া বসিবে! এক মিনিটকে লইয়া কত না সাবধানতা! কিন্তু বধ্য ভূমিতে যে প্রাণ দিতে যাইতেছে ওই মিনিটের চুল চেরা বিচার লইয়া তাহার ত' কোন মাথা ব্যথা নাই। প্রাণটা দিতে পারিলেই বোধ হয় সে বাঁচিয়া যায়, অনেক চিন্তা, অনেক কাঁপুনির হাত হইতে সে রক্ষা পায়। কয়েক দিন পূর্ব্বে চূড়ান্ত ভাবে

ফাঁসীর আদেশ না শুনাইয়া ঠিক সময় মত বধ্য ভূমিতে লইয়া গিয়া কার্য্য সমাধা করিলে আর কিছু না হইলেও পাগল হইয়া জ্ঞান হারা ত' তাহাকে হইতে হয় না। সোমেশ্বর, স্বকুমার এবং তারক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িল—রাজকুমার বাহিরের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, বোধ হয় তখন তাহার বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল।

দাশু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল, তারপর সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ভয় কি বাবু, আপনারা হচ্ছেন গিয়ে স্বদেশী। ও একটু ভয় প্রথম প্রথম সকলেরই হয়, সব ঠিক হয়ে যাবে। ভূত টুত কি আর আছে কিছু, ও সব গল্প। আমরা এতগুলো লোক—ভয় কি।

রাজকুমার তথাপি কোন কথা কহিল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া দাশু বলিল,শুয়ে পড়ুন—খুব সকালে ডেকে দেব। দাশু আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশব্দে নিজের শয্যার দিকে চলিয়া গেল।

রাজকুমার তখনও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ কাটিয়া গেল সে জানিতে পারে নাই। কে যেন হাত বাড়াইয়া তাহার একখানি হাত ধরিল। রাজকুমার চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—সোমেশ্বর তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, শুয়ে পড় কুমার।

সোমেশ্বরকে রাজকুমারের নিকটতম বন্ধু বলিয়া বোধ হইল—সে ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

কখন তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল জানিতেও পারে নাই—অকস্মাৎ কে যেন তাহাদের ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিল। অত্যন্ত চমকিয়া তাহারা চারিজনেই উঠিয়া বসিল।

দাশু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, আর বেশী দেরী নেই, ওই খানে বসেই এই জানলাটা দিয়ে চেয়ে দেখুন—বেশ স্পষ্ট দেখতে পাবেন।

নিজেদের অজ্ঞাতসারেই দৃষ্টি বাহিরের দিকে পড়িল—বধ্যভূমির মঞ্চের দুইধারে দুইটা লণ্ঠন টানাইয়া রাখা হইয়াছে। কপিকলের ভিতর দিয়া দড়িটা পাক খাইয়া উঠিয়াছে—একদিকে একটা ফাঁস এবং অপরদিকে একটা মোটা গেঁট। অমাবস্যার অন্ধকার—অন্ধকার সামান্য ফিকা হইয়া আসিতেছে, দুই দিকে ঝুলান দুই লণ্ঠন এক রহস্য লোকের সৃষ্টি করিয়াছে। পাক খাওয়া দড়িটা যেন হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, কি এক আকর্ষণ তাহাকে মোহময় করিয়া তুলিয়াছে। সেই মোহে ভুলিয়া যে নিকটে যাইবে তাহাকেই সে দংশন করিবে—মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য, কিন্তু এই মৃত্যুর আকর্ষণ বড় কম নহে। রাজকুমারের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—সে এক দৃষ্টিতে সেই পাক খাওয়া দড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল।

কে একজন ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, দড়িটাকে অনেকগুলো কলা আর মাখন মাখিয়ে খু-ব পেছল করে রেখেছে, কোথাও আট্‌কে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

সমস্ত ঘরটা এত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল যে সেই ফিস্ ফিস্ ধ্বনীও বেশ স্পষ্ট ভাবেই শোনা গেল। ঘরের মধ্যে আর কোথাও কোন শব্দ নাই, বাহিরের রহস্যের স্পর্শ ঘরের ভিতরেও লাগিয়া গিয়াছে।

অতি নিরীহ, গরীব অত্যন্ত সাধারণ এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার কি সে উদ্যোগ! একদল সিপাহী আসিয়া বদ্ধভূমির চারিপার্শ্বের প্রাচীর ঘিরিয়া দাঁড়াইল—বন্দুকধারী কয়েকজন সিপাহী প্রস্তুত হইয়া রহিল। রঙ্গ মঞ্চের যে নায়ক তাহার ঘরে লোহার গরাদ লাগান দরজার মাথায় একটা তীব্র বাতি জ্বলিতেছে—প্রতি রাত্রেই বাতিটা সেরূপ তীব্র ভাবে জ্বলিয়া তাহাকে পাহারা দেয়, নায়কের মৃত্যুর পর আর কোন নায়ক না আসা পর্য্যন্ত উহার আর জ্বলিবার প্রয়োজন হইবে না।

সেই ঘরের সম্মুখে কয়েকজন দাঁড়াইয়া ছিল—ভিতরে পুরোহিত তখন উচ্চৈস্বরে ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া মৃত্যু-পথ-যাত্রীকে শুনাইতেছে। এ জগতে যে পাপ সে করিয়াছে বিচারকের ন্যায়-বিচারের সঙ্গে ধর্ম্মের কথা তাহা ধুইয়া দিবে, একেবারে স্বর্গে না হইলেও স্বর্গের দুয়ারের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ান বোধ হয় তাহার পক্ষে তেমন শক্ত হইবে না।

ধর্ম্ম কথা শুনান শেষ হইল—মৃত্যু-পথ-যাত্রীর দুই হাত পিছনে দিয়া হাতকড়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে সে মৃত্যুকে বাধা দিতে না পারে। তারপর তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল বধ্য ভূমিতে। জল্লাদ প্রস্তুত হইয়া আছে—লোকটার মৃত্যু ঘটাইতে পারিলেই তাহার প্রাপ্য অর্থ এবং মদ মিলিবে, চক্ষু দুইটা তাহার তখনও লাল হইয়াই ছিল।

লোকটা অকম্পিত পদে মঞ্চে আরোহণ করিল। দড়ির ফাঁসটা আসামীর গলায় লাগাইয়া গায়ের জামাটা দিয়া তাহার মুখ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। তারপর আর দেরি হইল না। ঘড়ির কাঁটা মিলাইয়া ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদ তাহার কাজ শেষ করিল—লোকটার দেহ মঞ্চের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রাজকুমারের সমস্ত শরীর টলিতেছিল, লোকটা নীচে ঝুলিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই সেও চেতনা হারাইয়া সোমেশ্বরের কোলের মধ্যে ঢলিয়া পড়িল। সোমেশ্বর চীৎকার করিয়া উঠিল।

সকলে আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ঘটিয়া যাওয়া দৃশ্যটা দেখার পর কাহারও মুখে কোন কথা আর ছিল না। দাশু একটু ঘাড় নাড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, বাবু বড্ড ভয় পেয়ে গেছে।

রমজান মৃদু স্বরে বলিল, স্বদেশী বাবু যে, মনটা খু-ব নরম।

আব্দু বলিল, ঠিক যেন রাজপুত্তুর!

সকলে মিলিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

*

*　　*

মাস চারেক কাটিয়া গিয়াছে। জেলের অভিজ্ঞতা বেশ ভাল করিয়াই হইয়াছে রাজকুমারের। রাজনৈতিক মামলা গুলিকে ঘোরালো করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট অজস্র অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে বটে কিন্তু বিচারে সাজা হইবার পর একবার জেলে প্রবেশ করিলে কর্ত্তৃপক্ষ ঘাড় বাঁকাইয়া বলে, রাজনৈতিক কয়েদী বলিয়া কোন শ্রেণী বিভাগ করা নাই—অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর আসামী হইলে চোর, পকেটমার, ডাকাতদের সহিত এক খোঁয়াড়ে পুড়িয়া দিবে। আবার তাহারা যদি দলে ভারী হয় তবে কতকটা ভয়ে ভয়েই তাহাদের আলাদা রাখিবার ব্যবস্থা হয়—রাজনৈতিক শ্রেণী বিভাগ তখন আপনা হইতেই হইয়া যায়। তাই অনেক সময় আত্মসম্মান বাঁচাইতে রাজনৈতিক কয়েদীদের সংঘাত বাধাইতে হয়। লাঠি চলে, গুলিও চলে। রাজকুমার বুঝিয়া লইয়াছে ইহারই মধ্যে অনেক কিছু।

আর একটা কথা রাজকুমারের মনে দাগ কাটিয়া বসিয়াছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া জেলে আসিলেই মানুষ কিছু দেশভক্ত হয় না, মহৎ হয় না। সাধারণ কর্ম্মীদের কথাই শুধু নহে, অনেক নাম করা নেতাও যে অতি সাধারণ তাহা সে বেশ বুঝিয়াছে। ইহাদের অনেকের নীচতা সে অত্যন্ত বেদনার সহিত দেখিয়াছে। সামান্য আহার লইয়া বিবাদ করিতেও ইহাদের বাধে না। মতবাদের নামে বৃথা দলাদলিও ইহারা কম করে না। চেলাদের উস্কাইয়া দিয়া ঘুঁসাঘুঁসি পর্য্যন্ত করাইতে ছাড়ে না।

সময় এবং সুবিধামত জ্ঞান অর্জ্জন করা রাজকুমারের চিরকালের কাম্য। জেলের প্রচুর অবকাশ সে বৃথা ব্যয় করিল না। অনেকে যখন পাশা-

দাবা-তাস লইয়া ব্যস্ত সে তখন বইয়ের পর বই শেষ করিয়া চলিয়াছে। জেলে এই জিনিষটার বড় অভাব হয় না। আরও একটা কাজ এইখানে করা সম্ভব। পণ্ডিতলোকও জেলের মধ্যে পাওয়া যায়—তাঁহাদের ধরিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ এখানে আছে। রাজকুমার-সোমেশ্বর ইঁহাদের নিকট বসিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল।

আর বেশীদিন জেলে থাকিতে হইবে না—দেড় মাসও আর নাই বোধ হয়। এই ছোট্ট জগৎ ছাড়িয়া আর কয়দিন পরেই বড় জগতে প্রবেশ করিতে হইবে, সেখানে তাহার কোন স্থান নাই। স্নেহময়ী জননী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, পিতা কোন দিনই সংবাদ লয় নাই। পরাণ, দেবু হয়ত' তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, হয়ত' ভবিষ্যতের পথ রচনা করিবার জন্য তাহারা তাহারই মুখের পানে চাহিয়া থাকিবে। কিন্তু কতটুকু তাহার শক্তি! কি সে করিতে পরিবে! সমস্ত ভারতময় যে বিক্ষোভ তাহারই সূত্র কি সে নিজের গ্রামে টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না?

গ্রামের কথায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া মনে পড়ে সতীকে। কি উজ্জ্বল, কি উৎসাহ দীপ্ত সেই মুখ! গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রাণ কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল সে। কতদিন তাহাকে সে দেখে নাই। সে কি কলিকাতার জনারণ্যে হারাইয়া যাইবে? গ্রামে ফিরিয়া সে কি তাহার কুমারদার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে না? রাজকুমারের মন বলিল, সকলে চলিয়া গেলেও সে তাহার অজস্র মধু ভরা বক্ষ লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবেই। সে পাশে থাকিয়া উৎসাহ দিলে তাহার সামান্য শক্তিও বহুগুণ বর্দ্ধিত হইবে—ভারতের অগ্রগতির সহিত যোগসূত্র বজায় রাখিয়া চলাও তাহা হইলে তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

আজ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেকের কথাই মনে হইতেছিল। ধনীর কন্যা

সুরভী হয়ত' এতদিনে মনোতোষের গৃহ আলো করিয়াছে। সুরভীর মধ্যে একটা সরলতা আছে ; কিন্তু মনোতোষের ? সুরভীর জন্য তাহার দুঃখ হয়— তাহার একদিকে সহজ সরলতা, অপরদিকে সম্মানলাভের উদগ্র কামনা। এই দুইটি বিরোধী ভাব একদিন হয়ত' তাহাকে চুরমার করিয়া দিবে।

রাজকুমার বসিয়া বসিয়া বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। আর বেশী-দিন নাই, জীবন সংগ্রামে এইবার তাহাকে নামিয়া পড়িতে হইবে। তাহার ঘর-বাড়ী নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই। তাই বলিয়া কাহারও নিকট আশ্রয় ভিক্ষা সে করিবে না। কাহারও স্নেহও কি সে পাইবে না! তাহার অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

* * * *

## ৭

আজ কারাগার হইতে মুক্তির দিন। সকলের নিকট রাজকুমারেরা বিদায় গ্রহণ করিল। বাহিরের জগত এই কয়মাসে কত খানি পরিবর্তিত হইয়াছে কে বলিতে পারে!

ফটক পার হইয়া তাহারা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সোমেশ্বর, সুকুমার এবং তারকের আত্মীয়েরা তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে, আজ তাহাদের গৃহে কত না উৎসব! মাতা পুত্রকে বক্ষে ফিরিয়া পাইবে—ছোট ছোট ভাই-বোনেরা উৎফুল্ল মুখে চাহিয়া থাকিবে দাদার মুখের দিকে। রাজকুমারের কেহ নাই, কে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবে?

বাহিরে আসিয়াই সোমেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল, রাজকুমারকে একা ফেলিয়া রাখিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে সে পারিবে না। আগাইয়া গিয়া সে তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিল।

রাজকুমার তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিল। তাহা হয় না, আজ সে কিছুতেই তাহার সহিত যাইতে পারিবে না। সমস্ত বাড়ী সোমেশ্বরকে বুকে পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, সে গিয়া রসভঙ্গ করিতে পারিবে না।

রাজকুমারের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল, সোমেশ্বরের হাতটা নাড়িয়া দিয়া সে বলিল, এস এবার, আবার পরে দেখা হবে—আমি আজই দেশে রওনা হব।

সোমেশ্বর কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু রাজকুমারের হাতটাও ছাড়িয়া দিতে পারিল না।

সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়া একটা সুদৃশ্য বিরাটাকার মোটর আসিয়া নিকটেই থামিয়া গেল। মোটর থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই ত্রস্ত পদে নামিয়া আসিল এক সুন্দরী তরুণী। রাজকুমার ও সোমেশ্বর একসঙ্গেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল—একই সঙ্গে তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, সুরভী দেবী!

সুরভী নিকটে আসিয়া স্মিত হাস্যে উভয়ের দিকে চাহিয়া দুই হাত একত্র করিয়া নমস্কার করিল, তাহারাও প্রতি নমস্কার করিতে ভুল করিল না।

রাজকুমার সুরভীর দিকে চাহিয়াছিল, অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার। রাজকুমার দেখিল চঞ্চলা নারীর চঞ্চলতা কিছু কমিয়াছে, মাথায় সাড়ীর অঞ্চল উঠিয়াছে এবং সীঁথিতে সিন্দুর জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। রাজকুমার বুঝিল যে তরুণী বাঁধা পড়িয়াছে—মনোতোষের ঘরণী হইয়াছে নিশ্চয়ই।

রাজকুমারের চক্ষের দিকে চাহিয়া সুরভী হাসিয়া বলিল, কি দেখছেন?

রাজকুমার সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, মনোতোষ বাবুর খবর কি?

সুরভী লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিল, ভালই। তারপর যেন সমস্ত কথার শেষ করিয়া দিয়া বলিল, চলুন আমাদের ওখানে।

সোমেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, সকলে?

সুরভী জোরে মাথা দুলাইয়া বলিল, নিশ্চয়ই।

রাজকুমারের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়াই সুরভীকে লক্ষ্য করিয়া সোমেশ্বর বলিল, কুমারকে নিয়ে যান, আমরা বাড়ী যাই—পরে দেখা করব।

পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া সকলে নিজ নিজ গৃহের দিকে চলিল। রাজকুমার চলিল সুরভীর সঙ্গে তাহার গৃহে। সুরভীর আগমন অপ্রত্যাশিত —স্বপ্নেও তাহার আসিবার সম্ভাবনা কেহ কল্পনা করে নাই।

গাড়ী চলিতে লাগিল। সুরভী একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া রাজকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, কি ভাবছেন ?

রাজকুমার যেন স্বপ্ন দেখিতেছে এই ভাবেই বলিল, আপনার অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনার কথা।

মৃত্থ স্বরে সুরভী বলিল, একটুও কি আশা করেন নি ? সুরভীর স্বরে কি যেন ছিল, রাজকুমার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,তারপর সহজ ভাবেই বলিল, না।

তাহার ওই ছোট্ট না কথাটা সুরভীর অন্তরে গিয়া বিঁধিল, একটা নিশ্বাস কোনমতে রোধ করিয়া সে বাহিরের দিকে পুনরায় ফিরিয়া চাহিল।

গাড়ী দ্রুত বেগে চলিতেছে, চিন্তার রাশিও দ্রুতবেগে অসিতেছে, যাই-তেছে। ত্বইজনেই বোধ হয় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, দৃষ্টি ফিরাইয়া সুরভী বলিল, বাইরের কথা আপনাদের কি একটুও মনে হত না ?

রাজকুমার দৃষ্টি ফিরাইয়া সুরভীর দিকে চাহিয়া মৃত্থস্বরে বলিল, খুব হত। মনে হত দাত্থর ক।া, সতীর কথা—আপনার কথা।

সুরভীর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, সতী কে ?

'রাজকুমার বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল, আমার বাল্য বন্ধু।

অনেকক্ষণ কেহই কোন কথা বলিল না। সুরভী বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল, আমাদের কথা কি মনে হত' ?

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, সব ত মনে নেই। তারপর অকস্মাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, মনোতোষ বাবুর সঙ্গে কতদিন আপনার বিয়ে হয়েছে?

মৃদুস্বরে সুরভী উত্তর করিল, আপনারা জেলে যাবার কিছুদিন পরেই।

আর কোন কথাই হইল না। গাড়ী আসিয়া এক প্রকাণ্ড গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিল। বেয়ারা দৌড়াইয়া আসিয়া মোটরের দরজা খুলিয়া দিতেই উভয়ে নামিয়া পড়িল।

সম্মুখেই প্রকাণ্ড হল ঘর, নানা আসবাব পত্র এবং পাথরের মূর্ত্তি দিয়া ঘরটা সাজান। রাজকুমারের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সুরভীর মুখের দিকে সে একবার অতি সঙ্গোপনে চাহিয়া দেখিল। তাহার একটা দিক ইহাদের স্পর্শে সঞ্জিবীত হইয়াই থাকিবে। অন্যদিকটা হয়ত' তাহাকে মাঝে মাঝে কষ্ট দিবে—রাজকুমার সেই দিকটার মৃত্যু কামনা করিল।

মনোতোষ বাহিরে গিয়াছিল। সুরভী রাজকুমারকে লইয়া উপরের গানের ঘরে উপস্থিত হইল, চারিদিকে নানা রকমের যন্ত্র—সুশিক্ষিত হস্তে এই বিভিন্ন প্রকার এবং আকারের যন্ত্র একই সুরে বাজিতে থাকে। রাজকুমার জানে যে সুরভীর সে শিক্ষা আছে।

একটা গোল টেবিল ঘিরিয়া তাহারা কৌচে গা ঢালিয়া দিল। রাজকুমার ক্লান্ত হয় নাই তথাপি গা ঢালিয়া দিতে ভালই লাগিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বেয়ারা ট্রেতে করিয়া নানা প্রকার সুখাদ্য লইয়া উপস্থিত হইল। সুরভী প্লেটগুলি নামাইয়া লইতে বেয়ারা বাহির হইয়া গেল। রাজ-কুমার মৃদু হাস্যের সঙ্গে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

তাহার হাসি দেখিয়া লজ্জিত হইয়া সুরভী বলিল, খেয়ে নিন।

রাজকুমার হাসিতে হাসিতেই বলিল, এনেছেন যখন, খাবই। কিন্তু আমি ভাবছিলুম বাড়ী যাবার কথা। সেখানে এসব কে এনে দিত!

একটু খোঁচা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সুরভী বলিল, সতী।

সুরভী যে খোঁচা দিবার চেষ্টা করিয়াছে রাজকুমার তাহা বুঝিতে পারিল না, তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়াই হাসিমুখে সে বলিল, এমনি যত্নে সেও হয়ত' খেতে দিত কিন্তু সে ত' দেশে নেই।

এই সরল যুবককে আঘাত করিবার চেষ্টা করিয়া যে ভাল করে নাই তাহা বুঝিতে পারিয়া সুরভী লজ্জিত হইল। ক্ষণকাল নত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া সে বলিল, দেশে মা হয়ত' আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। আপনার জেলে যাবার কথা আমি আগেই তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছি, উত্তর অবশ্য কিছু পাইনি। আপনাকে ধরে এনে আমি তাঁকে কষ্ট দিয়েছি।

রাজকুমার ম্লান ভাবে হাসিয়া বলিল, সে চিঠি মার হাতে পৌছয়নি—তিনি হিসেব মিটিয়েই চলে গেছেন।

এই কথায় সুরভীর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেল। মা নাই—রাজকুমারের তাহা হইলে এমন কেহই ত' রহিল না যাহার অঞ্চলের তলায় সে দুই দণ্ড বসিয়া বিশ্রাম করিতে পারে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরভী নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, আপনার আত্মীয় আর কে আছেন?

ম্লান ভাবে রাজকুমার বলিল, বাবার কথা আপনি জানেন, তিনি এখনও আছেন কিনা জানিনা।

দুইজনের মুখেই একটা শোকের ছায়া ভাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ আর কোন কথা হইল না।

মনোতোষ পর্দ্দা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল, রাজকুমারকে দেখিয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছে এই ভাব দেখাইয়া বলিল, আঃ-হা, এসেছেন? আমি ভাবলুম আমাদের অগ্রাহ্য করে সোজা চলে যাবেন দেশে—অবশ্য আমাদের রাগ করার তাতে উপায় থাকত না। মা আছেন—।

শুষ্ক মুখে সুরভী বলিল, না, মা নেই।

মনোতোষ চমকিয়া গেল। রাজকুমারের অজ্ঞাতসারে সুরভীর মুখের দিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—সুরভীও সোজা তাহার মুখের দিকেই চাহিয়া আছে। মনোতোষ নিজেই দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া চিন্তিত ভাবে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, দুঃখ কি মনোতোষ বাবু, কেউ ত' চিরকাল থাকে না।

মনোতোষ তখনও নিজেকে সামলাইতে পারে নাই, কথাটা ঠিকমত ধরিতেও পারে নাই—উত্তরে কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল।

রাজকুমার অতশত বুঝিল না, যে বিষাদের ভাব চারিদিক হইতে সকলের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে চাহিতেছিল তাহাই দূর করিয়া দিবার জন্য কথার মোড় ফিরাইয়া বলিল, আপনার মেয়র হবার সম্ভাবনা আছে ত' এবার ?

মনোতোষ যেন বাঁচিয়া গেল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খুসীমনে হাত নাড়িয়া বলিল, সেই জন্যেই ত' এত দৌড় ঝাঁপ—সকালে আপনাদের আনতে পর্য্যন্ত যেতে পারিনি। দুটো মোটর আর নিজেকে সব সময়ে এদিকে ব্যস্ত রাখতে হয়েছে। সুরভী নিজেই কি কম খাটছে ? আজ আপনারা বেরোলেন তাই কিছুক্ষণ ও ছুটি নিয়েছে, নইলে এতক্ষণ মোটর নিয়ে কত পাক দিয়ে আসত !

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, তাহলে আমাদের একদিন পেট ভরে খাবার আশা আছে বলুন ? মেয়রের বাড়ীতে এক আধ বার আসাও যাবে।

মাথা নাড়িয়া মনোতোষ বলিল, নিশ্চয়, এত' একশ বার।

সুরভীও খুসী হইয়া উঠিয়াছিল, প্রীতির দৃষ্টিতে মনোতোষকে একবার দেখিয়া লইয়া বলিল, পেট ভরে খাবার আশা সাধারণ অবস্থায় বুঝি এখানে করা যায় না—তার জন্যে কি মেয়র হবার অপেক্ষা করতে হয়?

তিনজনেই হাসিল, মনোতোষের হাসিটাই যেন কিছু বেশী।

সুরভী কোচে মাথাটা এলাইয়া দিয়া বলিল, খাটতেও হচ্ছে খুব। তারপর মনোতোষের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, আবার এখনি বের হতে হবে না ত'?

মনোতোষ হাসিয়া বলিল, তা' হবে বই কি! তারপর হাত ঘড়ির দিকে চাহিয়া কি একটু ভাবিয়া বলিল, কুমার বাবুর জন্যে কিছুটা সময় দেব। তারপর বেরিয়ে ফিরব একেবারে বিকেলে—অনেক কাজ আছে। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রাজকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, ফিরে হয়ত' আপনাকে আর দেখতে পাব না।

সুরভী সহজ ভাবেই বলিল, দেশে ত' কেউ নেই—কাল গেলে হয় না কুমার বাবু? রাত্রে এখানে থাকলে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

মনোতোষ ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না অসুবিধার কি আছে, বাড়ীতে ঘরের ত' আর অভাব নেই। তবে ওঁর যদি বেশী কাজ থাকে আট্‌কিও না। একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে উঠিয়া পড়িল, বলিল, স্নান খাওয়া সেরেই যাই। তারপর রাজকুমারের হাত নাড়িয়া দিয়া বলিল, চলি, হয়ত' আজ আর দেখা হবে না—তারপর ত' সবই ভবিষ্যৎ।

মনোতোষ আর অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল—তাহার গমন পথ হাসি দিয়া ভরিয়া দিল সুরভী। মনোতোষ বাহির হইয়া যাইতেই সুরভী বলিল, খুব বেশী পরিশ্রম হচ্ছে, কাজ যদি তাতেও না হয় ত' দুঃখের শেষ থাকবে না।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, দলের মধ্যে কি মতের অমিল আছে ?

মাথা নাড়িয়া সুরভী বলিল, তা বড় নেই, বিশেষতঃ দলের জন্যে এরই মধ্যে উনি হাজার দশেক টাকা খরচ করেছেন এবং আরও হাজার দশেক করতে রাজী হয়েছেন। দেশের কাজে টাকাও ত' চাই, আবার সকলের পক্ষে টাকা দেওয়াও ত' সম্ভব নয় !

রাজকুমার অন্যমনস্কের মত মাথা নাড়িল।

সেই দিনই সে দেশের দিকে রওনা হইয়া গেল। বাড়ীটা তাহাদের আর বোধ হয় নাই—যদু ঘোষালের হইয়া গিয়াছে। সতী এখন কত বড় হইয়াছে ? কেমন দেখিতে না জানি হইয়াছে সে ! কলিকাতায় থাকিয়া এখনও কি সে বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছে—না সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মী সাজিয়া বসিয়াছে? শেষ কথাটা মনে হইতেই সে চমকিয়া গেল। কোন এক ঘরের লক্ষ্মী ইতিমধ্যেই হয়ত' সে হইয়া গিয়াছে। কেহই তাহার কথার অপেক্ষায় বসিয়া নাই। বিবাহের দিনে মাথায় ঘোমটা তুলিয়া বস্ত্রের ভারে জড়সড় হইয়া লজ্জিত সতী আসিয়াও কি বলিবে না, আসি কুমার দা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কোন প্রয়োজনই হয়ত' কাহারও নাই। ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর যে কোন এক সময়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই যেন হয়।

মার্টিনের গাড়ী ঝিক্ ঝিক্ করিয়া চলিতেছে, কাহারও উঠানের ভিতর দিয়া, কাহারও জানালার পাশ দিয়া তাহার পথ—যেন বহুদিন হইতেই ইহাদের সহিত তাহার অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। রাজকুমার এই সব দেখিতে দেখিতে চলিয়াছিল। কোথাও দুই একটা উলঙ্গ শিশু গাছের পাশ দিয়া গাড়ী দেখিয়া লইতেছে, কোথাও দাওয়ায় বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বৃদ্ধেরা একবার চক্ষু তুলিয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে

গাড়ীটার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। ওই শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্তই মানুষের সম্পূর্ণ জীবন—কৌতূহল হইতে তাচ্ছিল্য পর্য্যন্ত তাহার বিস্তার।

পরাণের কথা মনে হইল। হয়ত' তিনি বাঁচিয়া নাই—হয়ত' সমস্ত গ্রামে একমাত্র তিনিই ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। তাহার দাদু, গুরু—শিক্ষাদাতা। সমস্ত গ্রামকে এখনও হয়ত' তিনি চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছেন—দেবু অদম্য উৎসাহে তাহার সাহচর্য্য করিতেছে। তাহার প্রিয় গ্রাম খানিকে সে কি ভাবে দেখিতে পাইবে কে জানে!

গাড়ী আসিয়া গ্রামের ষ্টেসনে থামিল। রাজকুমার একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পরিচিত মুখ চোখে পড়িল না—ষ্টেসন মাষ্টার পর্য্যন্ত বদল হইয়া গিয়াছে।

সে হাঁটিতে আরম্ভ করিল—তিন মাইল পথ হাঁটিলে তবে গ্রাম মিলিবে, তাহার জন্মভূমি! অনেক খানি চলিয়া আসিবার পর বৃদ্ধ পিয়ন হরুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। হরু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, কুমার দা না?

অনেকদিন পর গাঁয়ের লোক দেখিয়া আনন্দে রাজকুমার তাহার হাত ধরিয়া বলিল, হ্যাঁ হরুদা, ভাল আছ ত'?

হরু মাথা নাড়িয়া বলিল, একটু লম্বাও হয়েছ, রংটা আরও ভাল হয়েছে। তারপর অকস্মাৎ কি যেন মনে হইতেই তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া বলিল, তাই বলে জেলে গেলে, কি এমন অভাব হয়েছিল, ছিঃ।

রাজকুমার চমকিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, অভাবই ত' হরুদা—স্বাধীনতার অভাব।

হরু স্বাধীনতার কথা বুঝিল না, শুধু এইটুকু বুঝিল যে অভাব বোধ হইয়া-

ছিল বলিয়াই রাজকুমার জেলে গিয়াছিল। মাথা নাড়িয়া সে বলিল, গাঁয়ে আর যেয়ো না কুমার দা, সকলেই ছি ছি করবে—অভাব হলেই কি চুরি করতে হয়? হরু চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

রাজকুমারের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, হরুর পথ রোধ করিয়া বলিল, কি বলছ হরুদা, চুরি করব আমি? আমি সাহেবদের তাড়াতে চাই বলেই ত' জেল হল।

সাহেবদের তাড়াইতে চাহে! হরু চমকিয়া গেল—তাহা হইলে তাহার মাহিনা দিবে কে? পোষ্ট অফিসই যে উঠিয়া যাইবে! হাত নাড়িয়া সে বলিল, অতসব জানিনে, অনেকদিন আগে তোমার মায়ের কাছে এক চিঠি এসেছিল, তা' তোমার মা ত' তখন স্বর্গে। জমিদার বাবু চিঠি দেখে বললেন, কুমার আমার আত্মীয় হয়েও চুরি করে জেলে গেল, ছিঃ। তাঁর কাছে কিছু টাকা চাওনি বলে তিনি দুঃখও করলেন।

প্রতিশোধ গ্রহণের চমৎকার পথ বাহির করিয়াছেন যদু ঘোষাল—সতীর ঠাকুর্দ্দা। গ্রামের লোকের মন বিষাইয়া দিবার অতি সহজ পথ।

রাজকুমার ম্লান ভাবে বলিল, যদু ঘোষাল মিথ্যে বলেছে।

জমিদারের নামে এই অপবাদ তাহারা শুনিতে অভ্যস্ত নহে, হরু একটু চমকিত হইল—তারপর আর কোন কথা না বলিয়া পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল। রাজকুমার তাহাকে কোন বাধাই দিল না, পশ্চাতে ফিরিয়া তাহার গতিবেগও লক্ষ্য করিল না।

পুনরায় সে পথ চলিতে লাগিল। এইটুকু বেশ সহজ ভাবেই সে বুঝিয়া লইয়াছে যে তাহার পুরাতন গ্রাম পূর্ব্বের মতই তাহাকে আর অভ্যর্থনা করিবে না। যাহার বাড়ী বিক্রয় হইয়া গেছে, পিতা যাহাকে কোন দিন ভাল চক্ষে দেখে নাই এবং চিরকাল নেশা করিয়াই ফিরিয়াছে, যাহার স্নেহময়ী

জননী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আয়ের পথ যাহার কিছু নাই তাহার পক্ষে নির্ব্বান্ধব কলিকাতায় না খাইতে পাইয়া চুরি করাই স্বাভাবিক। অন্যমনস্কের মত সে পথ চলিতে লাগিল।

বোধ হয় অন্যমনস্কতার জন্য সে অনেকটা পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতেছিল—গ্রামের এক প্রান্তে আসিয়া যখন সে পৌঁছাইল তখন চারিদিক বেশ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কুটিরে কুটিরে আলো দেখিয়া তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল যে মহেন্দ্রর কুটিরের সম্মুখে সে আসিয়া পড়িয়াছে। একটু ইতস্তত করিয়া আস্তে আস্তে সে ডাকিল, মহেন্দ্র।

ভিতর হইতে সাড়া দিয়া মহেন্দ্র বাহিরে আসিয়াই চমকিয়া গেল, ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিস্মিত স্বরে বলিল, দা-ঠাকুর!

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছ?

মহেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বসিবার আসন দিয়া বলিল, ক'লকাতা থেকে এলেন বুঝি?

রাজকুমার মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ। তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি একটু ভাবিয়া বলিল, তুমি আমাকে বসতে দিলে যে মহেন্দ্র?

মহেন্দ্র যেন আকাশ হইতে পড়িল, মাথা চুলকাইয়া বলিল, কেন দেব না?

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, জমিদার বাবু আমার সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলেন নি?

মহেন্দ্র বোকার মত খানিকটা হাসিল, তারপর একটু নড়িয়া বসিয়া বলিল, জমিদার বাবুদের আমরা কয়েক পুরুষ ধরেই দেখছি—তাদের আমরা বিশ্বাস করি না। দরকার মত ওরা হাজার গণ্ডা মিথ্যে বানায়—আপনি চুরি করেছেন একথা বিশ্বাস করব আমি!

রাজকুমার মৃদু স্বরে বলিল, অনেকেই বিশ্বাস করেছে, তুমি কেন করবে না মহেন্দ্র?

সেই অন্ধকারেও মহেন্দ্র একবার রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, কি দেখিল সেই জানে, বেশ দৃঢ় স্বরেই সে বলিল, বিশ্বাস কোন হিসেব মেনে চলে না।

রাজকুমার কথার মোড় ফিরাইয়া বলিল, দাদু, দেবু সব কেমন আছে?

মহেন্দ্র কোন কথা ভাঙ্গিতে চাহিল না। অনেক দিন পর কুমার দাদা আসিয়াছেন, তাহার মনে সে কিছুতেই এখন ব্যথা দিতে পারিবে না। সহজ ভাবেই সে উত্তর করিল, কাল নিজে গিয়ে সব দেখে আসবেন।

রাজকুমার কথাটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া বলিল, কাল?

মহেন্দ্র জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ এখানেই আপনাকে থাকত হবে।

মহেন্দ্রর কথার দৃঢ়তায় রাজকুমার একটু বিস্মিত হইল, ভালও লাগিল। কেন জানিনা এতক্ষণ লজ্জায় যে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে বাধিতেছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিবার লজ্জাও সহজেই কাটিয়া গেল। মহেন্দ্রর দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, সতী কোথায়?

মহেন্দ্র উত্তর করিল, এখানেই আছে শুনেছি। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি অবাক হয়ে গেছি, সতী দিদিও কি তোমাকে চোর মনে করেছে?

রাজকুমারেরও কথাটা একবার মনে হইয়াছিল কিন্তু তাহা লইয়া নিজের মনে আলোচনা করিবার সাহস সে পায় নাই। সতী কি সত্যই তাহার ঠাকুর্দার কথা বিশ্বাস করিয়াছে? যে কুমারদার নিকটে থাকিতে সে সব সময়েই চাহিত সেই কুমারদা কি ভাসিয়া গিয়াছে? কোন মতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া রাজকুমার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

*

*     *

পরের দিন খুব ভোরে রাজকুমার পরাণের গৃহের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। পথে যে দুই চারি জনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহারা সকলেই মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। হরুর কথাই সত্য, অনেকেই মনে মনে তাহাকে ছি, ছি করিতেছে। যাহারা জমিদারের কথা বিশ্বাস করে নাই তাহাদের মুখ ফুটিয়া সে-কথা বলিবার কোন সাহসও নাই। তাহারা চুপ করিয়া থাকিয়া আপনার মনেই গুমরিয়া মরিতেছে।

পরাণের গৃহের সম্মুখে আসিয়া সে বিস্মিত হইল—গৃহ বলিতে সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। একটা শাকশব্জির উদ্যান সে স্থানটায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, একপাশে একটা ছোট্ট ঘর, বোধ হয় যে লোকটা বাগানের কাজ করে সে সেখানেই তাহার পরিবার লইয়া মাথা গুঁজিয়া থাকে।

লোকটা বাগানে কাজ করিতেছিল। রাজকুমার তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ীর মালিক কোথায় গেছে ?

লোকটা তাহার মুখের দিকে বেশ ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, চেহারাটা সুন্দর দেখিয়া বোধ হয় একটু সম্ভ্রমের ভাবও তাহার মনে জাগিল। আঙ্গুল দিয়া এক দিক দেখাইয়া সে বলিল, ওই দিকে জমিদার বাবু থাকেন—তিনিই মালিক।

রাজকুমারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। দাদু কি আর ইহ জগতে নাই ? তাঁহার অবর্ত্তমানে কি জমিদার সমস্ত দখল করিয়া লইয়াছে ? দেবু কোন বাধাই দিতে পারে নাই ? আর সতী ? সে বাঁচিয়া থাকিতে কি করিয়া এই সব অনাচার সম্ভব হইল ! যে সতীকে সে দেখিয়া গিয়াছে সে সতী বোধ

হয় মরিয়াছে। মুহূর্তের জন্য সমস্ত জগতের উপর বিতৃষ্ণায় রাজকুমারের মন ভরিয়া গেল।

কিছুক্ষণ দূরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রাজকুমার কতকটা আপন মনেই বলিল, পরাণ বাবুর খবর কিছু জান ?

লোকটা মাথা নাড়িয়া জানাইল যে পরাণের নামও সে শোনে নাই।

রাজকুমার কিছুক্ষণ সেইখানে অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেবুর গৃহের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিল। চারিদিকে বেশ রৌদ্র উঠিয়া গিয়াছে, পথেও অনেক লোকজন দেখা যাইতেছে, যাহারা পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া কথা বলিত তাহারা পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, যেন তাহাকে চিনিতেও পারে নাই। রাজকুমারের সে সব দিকে লক্ষ্য ছিল না। তাহার দাদুর সংবাদ এখনও সে পায় নাই—একমাত্র দেবুই হয়ত' সংবাদ দিতে পারিবে।

দেবুর গৃহের সম্মুখে আসিয়া সে ডাকিল, দেবু।

কোন সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীতে কেহ আছে বলিয়াও মনে হইল না। রাজকুমার পুনরায় ডাকিল, দেবু।

ভিতর হইতে ভাঙ্গা মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কে রে হতভাগা দেবু দেবু করছিস্। নচ্ছার গুলো সব সময়ে জ্বালাবে গা !

রাজকুমার বুঝিল সে ঝঙ্কার দেবুর বৃদ্ধা পিসিমার, যাঁহার জিহ্বার সম্মুখে দাঁড়াইতে স্বয়ং যদু ঘোষালও ভরসা পান না। এ গৃহের দ্বার রাজকুমারের নিকট চিরদিন অবারিত ছিল। গৃহে মনুষ্যের অস্তিত্ব আছে বুঝিয়া সে একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবুর পিসিমা দাওয়ার উপরে বসিয়া চা'ল বাছিতেছিলেন।

রাজকুমার নিকটে আসিয়া নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেবু কোথায় পিসিমা?

বৃদ্ধা পুনরায় ঝঙ্কার দিতে গিয়া রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলেন। মুহূর্তে তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কিছুতেই নিজেকে সংযত করিতে না পারিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। রাজকুমার কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, নিতান্ত অপ্রস্তুতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধা কিছুক্ষণ অশ্রু ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি শান্ত হইয়া বলিলেন, সে নেই।

রাজকুমার এই কথাটার জন্য প্রস্তুত ছিল না, সকলেই কি তাহাকে একে একে ছাড়িয়া যাইবে! একটা আর্ত্ত স্বর তাহার কণ্ঠদিয়া বাহির হইয়া গেল, নেই?

বৃদ্ধা আপন মনেই বলিলেন, আহা, যেখানেই থাক্, বাছা আমার শুধু বেঁচে থাকুক্।

রাজকুমার যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইল, আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কোথায় গেছে সে?

বৃদ্ধা আর একবার চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, তা কিছু বলে যায়নি বাবা। তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অঞ্চল প্রান্তে বেশ করিয়া মুখ মুছিয়া বলিলেন, যদু ঘোষাল পরাণের ঘরে আগুন দিয়েই ক্ষান্ত হননি—দেবুর ওপরও তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। তাই আমাকে বাঁচাতেই সে ঘর ছেড়ে গেছে। বৃদ্ধার চক্ষু পুনরায় জলে ভরিয়া গেল।

রাজকুমারের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না, গলার স্বরও বন্ধ হইয়া আসিতে-ছিল। গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, যাবার আগে দেবু আমার কথা কিছু বলে গেছে?

বৃদ্ধা বলিলেন, যাবার সময় আমার পায়ের ধূলো নিয়ে সে শুধু বলে গেছে যে কুমারের কাজ এগিয়ে নেবার জন্যে পরাণের সঙ্গে যোগ দিতে সে যাচ্ছে। আমি তাকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করেছি বাবা। বৃদ্ধা অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিলেন।

রাজকুমার কোন কথা না বলিয়া অনেকক্ষণ দূরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহারই কাজ আগাইয়া লইবার জন্য দেবু ঘর ছাড়িয়া গিয়াছে। সে কে? দেবু কত' না মহৎ! অনেকক্ষণ পর সে যেন পুনরায় পৃথিবীতে নামিয়া আসিল, বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাদু কোথায় গেছেন?

বৃদ্ধা অন্যমনস্কের মত চা'ল গুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, তা ত' জানিনা বাবা। অন্যমনস্ক ভাবে তিনি যে বাছা এবং আবাছা চা'লগুলি পুনরায় মিশাইয়া ফেলিলেন তাহা জানিতেও পারিলেন না।

আর কোন কথা না বলিয়া রাজকুমার ফিরিবার জন্য পা বাড়াইল।

বৃদ্ধা চেতনা ফিরিয়া পাইয়া বলিলেন, এখানেই তুমি খেয়ো বাবা।

আহারের কথা রাজকুমারের মনেও ছিলনা—পেটকে বাদ দিয়া বেশী দিন চলিবার উপায় নাই। সে সম্মতি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল।

তরুণ সঙ্ঘ উঠিয়া গিয়াছে। জমিদারের প্রভাব দেখিয়াছে গাঁয়ের লোক। ছা-পোষা মানুযেরা জমিদারকেই দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লইয়া নিজ নিজ পুত্র অথবা ভ্রাতাকে সায়েস্তা করিয়াছেএবং তরুণ সঙ্ঘ হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে। যাহারা উহারই মধ্যে একটু দৃঢ়তা দেখাইয়াছিল, তাহাদের শোধরাইবার জন্য অন্যত্র পাঠাইয়াছে তাহাদের অবিভাবকেরা। তরুণের দল আজ ছত্র ভঙ্গ। যাক্, রাজকুমার তাহা লইয়া ভাবিবে না। ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়াই ত' নূতন সৃষ্টি হইতেছে। আজ পরাভূত হইয়াছে

বলিয়া দুঃখ নাই। মহেন্দ্রর দল অন্নহীন হইয়াও মাথা উঁচু করিয়াই রহিয়াছে। একদিন ইহাদেরই অবলম্বন করিয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। রাজকুমার এখানে আর কিছু করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে ঠিক উপযুক্ত নূতন মানুষ আসিয়া ইহাদের নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। সে চলিয়া যাইবে যতদূরে সম্ভব।

গৃহে সামান্য দুই চারিটা জিনিষ তাহার পড়িয়া ছিল—সে গুলি লইয়া আসিবার ইচ্ছা হইতেছিল। সে গুলি দিয়া কিছু কাজ হইবে এমন নহে, তথাপি অনেক স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে সে-সবের মধ্যে। কতকগুলি খাতা বই এবং সেগুলি জড়াইয়া বাঁধা তাহার মায়ের একটা ছিন্ন সাড়ী। তাহার পূর্ব্ব পুরুষের ও তাহার মায়ের স্মৃতি চিহ্ন এবং আর ও দুই চারিটা টুকি টাকি জিনিষ আছে তাহারই মধ্যে। সেই পুটুলীটা তাহার চাই। তাহার মায়ের শেষ নিশ্বাস যেখানে পড়িয়াছিল সেই স্থানে আভূমি নত হইয়া একটা প্রণাম করিয়া আসিবার লোভও সে সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের বহুদিনের বাসভূমি আর এখন তাহাদের নাই, পূর্ব্ব পুরুষদের পদধূলি তাহার মায়ের পদধূলির সহিত উহারই মাটীতে মিশিয়া রহিয়াছে। সেই গৃহের নিকট শেষ বিদায় না লইয়া সে কি করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে পারে! গ্রামের নিকট শেষ বিদায় লইবার জন্য সে মনে মনে প্রস্তুত হইয়াছিল।

গৃহের নিকট আসিয়া সে একটু ইতস্তত করিল, দরজা খোলাই ছিল—তথাপি সোজা ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রথমে কেন জানি একটু বাধিল। এই গৃহের পবিত্রতা হয়ত' এতদিনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে যদু ঘোষালের স্পর্শে—হাতে তাহার কত পৈশাচিক হত্যার রক্ত না জানি লাগিয়া আছে!

গ্রামের লোককে পাশ কাটাইয়া চলিবার ইচ্ছাও হইতেছিল খুব বেশী, তাই বেশীক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতেও পারিল না। উঠানে প্রবেশ

করিয়া সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সম্মুখেই দালান, উহারই পাশের বারান্দায় তাহার মাতা শেষ নিশ্বাস ফেলিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। রান্না ঘরটা দেখা যাইতেছে, তাহার মাতা ওইখানেই নিজেকে কাজে ব্যাপৃত করিয়া রাখিতেন। পিতার কথাও বার বার মনে পড়িতেছিল—কত না অত্যাচার সে করিয়াছে তাহার মায়ের উপর। তথাপি মায়ের শেষ মুহূর্তে তাহার পিতার যে ভাব সে দেখিয়াছে তাহার পর তাহার উপর আর রাগ করিয়া থাকিতে পারে নাই। বড় হতভাগ্য তাহার পিতা! স্ত্রীর স্নেহ ভালবাসা বুঝিবার মত শক্তিও তাহার ছিল না।

রাজকুমার দালানে উঠিয়া আসিল, তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল সেই বারান্দায়। এইখানেই তাহার মাতার শেষ শয্যা বিছানো হইয়াছিল। রাজকুমার নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সেইখানে জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িল। মায়ের শেষ শয্যা তাহার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল—মা যেন তখনও সেইখানে শুইয়া আছেন। রাজকুমার মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল। আর সে কোনদিন এখানে আসিবে না—চির বিদায়। চির বিদায় লইতেই ত' সে আসিয়াছে।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে পড়িয়া থাকিয়া রাজকুমার উঠিয়া বসিল, চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, মুছিয়া ফেলিবার জন্য হাত উঠাইবার ম৩ মনের অবস্থাও তখন তাহার ছিল না। চক্ষু তুলিয়া সে পাশের ঘরটার দিকে চাহিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই কোমরে সাড়ীর আঁচল জড়াইয়া একটা ঝাঁটা হাতে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল সতী। চারি চক্ষু মিলিত হইল—তুইজনেই স্তব্ধ হইয়া তুইজনের দিকে চাহিয়া রহিল, কেহ কোন কথা বলিতে পারিল না।

সতীর ঠোঁট তুইটা বার বার কাঁপিতে লাগিল। রাজকুমার ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু তুইটা মুছিয়া ফেলিল। এতক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া

লইয়া সতী বলিল, এলে কুমারদা! তাহার স্বর শুনিয়া মনে হইল যেন সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে।

রাজকুমার সে কথার কোন উত্তর না দিয়া সতীর হাতের দিকে চাহিয়া বলিল, করছিলে কি?

লজ্জিত ভাবে হাতের ঝাঁটাটা ফেলিয়া দিয়া সতী বলিল, ঘরগুলোতে বড় ময়লা জমেছে। তারপর নিজের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল, সাড়ীতে, জামায় এবং দেহের কয়েক স্থানে সামান্য ময়লা লাগিয়াছে, মাথার রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে।

তাহার লজ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া রাজকুমার বলিল, কে থাকবে এ বাড়ীতে?

সতী নত মুখে উত্তর করিল, কেউ না।

তাহার অবনত মস্তকের দিকে চাহিয়া রাজকুমার চমকিয়া গেল—সীঁথিতে সিন্দুর। সতীরও তাহা হইলে বিবাহ হইয়া গিয়াছে! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে আর কোন কথা বলিতে পারিল না, সেই সিন্দুরের রেখার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পৃথিবী তখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছ, সতীর মাথাটাও যেন আর দেখা যাইতেছে না—সিন্দুরের রেখাটি তখনও জ্বলিতেছে, ক্রমেই উহা যেন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। রাজকুমার আর সেদিকে চাহিয়া থাকিতে না পারিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

রাজকুমারকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সতী মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল এবং তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া নিজেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তেমনি ভাবে চাহিয়া থাকিয়া সতী একটু আব্দারের সুরেই বলিল, কিছুদিন এবার একটু বিশ্রাম কর কুমার দা।

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, বিশ্রামই ত' করে এলুম।

সতী মৃদু হাসিয়া বলিল, মন ত' সেখানে বিশ্রাম পায় না।

রাজকুমার আঘাত দিয়া বলিল, চোর বলে?

সতী কাঁপিয়া উঠিল, রাজকুমারের তাহা দৃষ্টি এড়াইয়া গেল না—ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করিয়া রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া সতী বলিল, তোমার মত জেলে যাবার সৌভাগ্য হলে এ গাঁয়ের যে কোন লোক সার্থক হয়ে যেত কুমারদা।

রাজকুমার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন দেখিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল, তোমার দাদু তা বলেন না।

সতী কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া হাসিতে সমস্ত মুখ উজ্জ্বল করিয়া বলিল, যে তোমার শত্রু সে তোমায় ভাল বলেনি বলেই কি রাগ করেছ?

রাজকুমার অন্যমনস্কের মত বলিল, গাঁয়ের সব লোকই ত' তাঁর কথা মেনে নিয়েছে।

সতী বলিল, যারা অল্প প্রাণ তাদের ও ছাড়া আর উপায় কি! দেবু ও কথার প্রতিবাদ করে ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে—মহেন্দ্র আবার লাঠি ধরতে চেয়েছিল।

রাজকুমার বলিল, মহেন্দ্রর কথা তুমি জানলে কি করে?

সতী সে কথার কোন উত্তর দিল না।

রাজকুমার ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দাদুর ঘরের চিহ্নও ত' নেই, দাদু কোথায় গেছেন বলতে পার?

সতীর চক্ষু ভিজিয়া উঠিল, শান্তস্বরে সে বলিল, দাদু বেরিয়েছেন তাঁর অক্ষম দেহে যতটুকু শক্তি আছে তাই নিয়ে কাজ করতে। ক্ষণকাল চুপ

করিয়া থাকিয়া পুনরায় সে বলিল, আমাদের দাদুকে ঘর ছাড়া করেছেন আমার দাদু।

যদু ঘোষাল ভিতরে প্রবেশ করিলেন, রাজকুমারকে দেখিয়াই দুই পা পিছাইয়া গেলেন। পাকা জমিদার, নিজেকে সংযত করিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া তুলিতে খুব বেশী সময় লাগিল না। ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া বলিলেন, বেশ ভাল আছ ত' কুমার?

রাজকুমার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে ভালই আছে—আগেকার দিনের মত নত হইয়া পায়ে হাত দিয়া সে যদু ঘোষালকে প্রণাম করিতে পারিল না। সতী তাহা লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া একটু হাসিল। যদুও ব্যাপারটা বেশ ভাল করিয়াই উপলব্ধি করিলেন কিন্তু অভিমান বা ক্রোধের এতটুকু ভাবও না দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজই এলে বুঝি?

রাজকুমার মাথা নাড়িয়া বলিল, না, কাল। তারপর অকস্মাৎ একেবারে যদুর মুখের দিকে সোজা চাহিয়া বলিল, কেন হরুদা কালই ত' আপনাকে আমার আসার কথা জানিয়েছে।

যদু ঘোষাল প্রস্তুত ছিলেন না, এই অতর্কিত আক্রমণে অভিভূতের ন্যায় ইতস্তত করিয়া বলিলেন, না, হ্যাঁ তা হবে—হয়ত' ব'লে থাকবে। আমার বয়েস হয়েছে'ত', এতকথা কি আর মনে থাকে। কোন মতে কথা শেষ করিয়া তিনি সতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার চল দিদি।

সতী মাথা নাড়িয়া বলিল, আর একটু কাজ বাকী আছে দাদু।

যদু বলিলেন, আজ থাক্—মহিমের আসবার সময় হয়ে এল, এসময় বাড়ীতেই থাকতে হয়।

সতীর চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, নত নেত্রে একটু আব্দারের সুরেই সে বলিল, আর একটু অপেক্ষা কর দাদু।

যদু আপন মনেই বোধ করি রাজকুমারের উপস্থিতির কথা ভুলিয়া গিয়াই বলিলেন, রোজ রোজ এ বাড়ীর ময়লা ঘাঁটতে কি যে ভাল লাগে!

রাজকুমার সতীর চক্ষের দিকে চাহিল, মুহূর্ত্তের জন্য চারি চক্ষু একত্রিত হইল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যই, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতেই সতী দৃষ্টি নত করিয়া একরকম ছুটিয়াই একদিকের একটা ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহার মুখ এবং কান একেবারে লাল হইয়া গিয়াছিল।

যদুর দৃষ্টি রাজকুমারের উপর আসিয়া পড়িল। পুরাতন কথা মনে পড়িতেই তিনি বলিলেন, কালই এসেছ তাহলে?

মাথা নাড়িয়া রাজকুমার বলিল, হ্যাঁ।

যদু অতি সাধারণ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল ছিলে কোথায়?

সহজ ভাবেই রাজকুমার বলিল, মহেন্দ্রর ওখানে।

যদু আপন মনেই মাথা নাড়িয়া বলিলেন, মহেন্দ্রের ওখানে, হুঁ—মহেন্দ্র!

যদুর ভাব দেখিয়া রাজকুমার মহেন্দ্রর জন্য শঙ্কিত হইল, ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিল, কোন রকমে রাত্রের মত একটু জায়গা মিলেছিল সেখানে। আর কিছুই দরকার হবে না, আমি আজই চলে যাচ্ছি।

যদু মুখ তুলিয়া কেবলমাত্র বলিলেন, ওঃ।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সতী বলিল, কোথায় যাবে তুমি আজই।

রাজকুমার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কলকাতা।

সতী কাতর কণ্ঠে বলিল, আজই যাবে?

রাজকুমার দৃঢ় ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যা।

সতী দরজাটায় ভর দিয়া দাঁড়াইল, তারপর ভারী চক্ষু দুইটা তুলিয়া বলিল, তবে এসেছিলে কেন?

রাজকুমার উত্তর করিল, যাদের কাছে এসেছিলুম তারা হারিয়ে গেছে।

আমার পুটুলীটা নিয়ে এ বাড়ীর কাছে চির বিদায় নিতে এসেছিলুম, এবার যাব।

যদু ঘোষাল বলিলেন, তুমিও চল দিদি।

ঘরের ভিতর হইতে পুটুলীটা আনিয়া রাজকুমারের সম্মুখে রাখিয়া সতী বলিল, এখানে থাকতে আমিও তোমায় অনুরোধ করতুম না কুমার দা। কেবলমাত্র শত্রুর ওপর রাগ করেই তুমি যে চলে যেতে চাইছিলে তা আমি হতে দিতে চাইনি।

রাজকুমার তাহার চক্ষের দিকে চাহিয়া বলিল, রাগ ত' আমার নেই।

সতী মৃদু হাসিয়া বলিল, জানি। তারপর একেবারে আগাইয়া আসিয়া নত হইয়া রাজকুমারের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল—কয়েক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে যেন সমস্ত কিছু ভুলিয়া গেল।

রাজকুমার শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিল, আসি এবার।

সতী ম্লান হাস্যে তাহাকে বিদায় দিল। পুটুলীটা তুলিয়া লইয়া রাজকুমার ধীরে ধীরে দালান হইতে নামিয়া উঠান পার হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। সতী দেওয়ালে হেলান দিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

যদু ঘোষালের মুখে পরম প্রশান্তির ছাপ, সতীর বিমর্ষতায় তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না—রাজকুমার যে চিরদিনের জন্য তাঁহাকে নির্ভয় করিয়া গেল ইহাতেই তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

*　*　*　*　*

৮

রাজকুমার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে যে প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল তাহা আর নাই। হাউই বাজীর মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই তাহা নিভিয়া গিয়াছে—এখানে ওখানে যাহা পড়িয়া আছে তাহা ছাইয়ের কণা মাত্র। আবেগ চঞ্চল কলিকাতায় তাহার একটা স্থান ছিল। এ কলিকাতায় সে কোথায় যাইবে? গ্রামের যে কাজকে সে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে সে কাজেই আবার সে ফিরিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনকে একবার জানিয়া লওয়াও দরকার। নিজের শক্তিতে নির্ভর করিয়াই সংগঠনের কাজ করিতে হয়। সে শক্তি তাহার কতখানি তাহার পরীক্ষা হইয়া যাওয়া চাই। রাজকুমার কিছুদিন কাহারও সহিত কোন যোগ রাখিবে না।

হাতের পুটুলীটা কোথাও রাখিতে হইবে। সুরভীর গৃহে তাহা রাখিয়া আসা চলে না। এই সামান্য জিনিষ গুলি হয়ত তাহার হাসির উদ্রেক করিবে—তাহার মায়ের এবং সতীর স্মৃতিচিহ্নের মূল্য সুরভীর কাছে কতটুকু! সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল। রান্নাঘরে বসিয়া সে ও সুরভী—অন্নপূর্ণা কত প্রশ্নই না করিতেছিলেন। তারপর টলিতে টলিতে আসিয়া নেশাখোর পিতা বলিয়া বসিল 'রাজপুত্তুরের বউ হলে নাকি'। সুরভীর চক্ষুর সহিত তাহার চক্ষুর মিলন হইয়াছিল। সুরভীর মুখে লালের আভা দেখা দিয়াছিল কিনা তাহার মনে নাই। সেকথা ভাবিয়া রাজকুমারের হাসি

পাইল। বড় চমৎকার মানুষের জীবন। সতী মাঝপথে ধাক্কা খাইয়া কেন্দ্রচ্যুত হইয়াও ছিট্‌কাইয়া যাইতে পারিল না। সুরভী হোঁচট খাইয়া পড়িয়াছে আরাম এবং সম্মানের উপর। না, সুরভীর গৃহে এখন যাইয়া কাজ নাই।

সোমেশ্বরের কথা মনে হইল। সে দেশকে ভালবাসে—সামান্য হইলেও স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ পুরাতন পুস্তকগুলিকে এবং ছিন্ন সাড়ীটাকে সে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিবে। কিন্তু সোমেশ্বর যদি তাহাকে থাকিতে বলে! আন্দোলন যখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে তখন নিজেকে গঠন করিয়া লইবার জন্য কলিকাতায় কিছু দিন থাকা ভালই। সোমেশ্বরের কাছে তাহার কোন লজ্জা নাই—প্রয়োজন হইলে সেখানে দুই দশদিন না হয় থাকিয়াই যাইবে।

কিন্তু সোমেশ্বরের দেখা মিলিল না। সোমেশ্বরের দাদা জেলের ফটকে ভাইকে আনিতে যাইয়া রাজকুমারকে দেখিয়াছিলেন, বসিতে বলিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আবার জেলে যাচ্ছ কবে?

রাজকুমার লজ্জিত হাস্যে উত্তর করিল, নেতারা জানেন।

সোমেশ্বরের দাদা বলিলেন, তোমাকেও জানতে হবে। দেশের সমস্ত সমস্যাগুলো তলিয়ে বুঝতে হবে—বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকায় সমস্ত সমস্যার বিচার করতে হবে। নইলে কোনদিন যে একা পথ চলতে পারবে না।

ইহার বিরুদ্ধে রাজকুমারের বলিবার কিছু ছিল না। সে মৃদু স্বরে বলিল, এত বুঝবার বিদ্যে যে নেই।

দাদা বলিলেন, বুঝবার জন্যে অনেক বিদ্যে লাগে না। কাজে নাম, আর সামনে তাকিয়ে দেখ—সব সহজ হয়ে যাবে। সোমেশকে পাঠিয়েছি বাংলার বিভিন্ন পল্লী দেখে আসতে—পুঁথির বিদ্যে থেকে এতে অনেক বেশী শিক্ষা হবে।

পুটুলীটা রাখিয়া যাওয়া আর হইল না। সোমেশ্বরের দাদাকে বলিলে নিশ্চয় ব্যবস্থা হইয়া যাইত কিন্তু রাজকুমারের লজ্জা করিল। সে লজ্জা কাটাইয়া ওঠা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না।

সোমেশ্বরের দাদা বলিলেন, যে কাজই কর না কেন তাকে একটু বিচার করে দেখবে। অভিজ্ঞতা না হলে ত' কিছুই হবে না। গান্ধীজীর সঙ্গে যত মত বিরোধই থাক্ না কেন একথা সত্যি যে তিনি সাধারণ মানুষকে চিনে নিতে পেরেছিলেন বলেই গণ-আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল। বেরিয়ে পড় পথে—ঘুরে এস সমস্ত ভারতবর্ষ, চেন দেশের মানুষগুলোকে।

রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া ম্লানভাবে বলিল, তার জন্যেও কিছু টাকা চাই। বলিতে বলিতে তাহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে বলিল, প্রাণ দিয়ে দেশের কাজ করতে চাইলেও চলে না—তার জন্যেও টাকা চাই। সংসারের চিন্তা নিয়ে দেশের কাজ করা অসম্ভব। খোরাক জোটাতে গেলে কাজের সময় মেলে না—একবার জেলে গেলে সমস্ত সংসার ভেসে যায়। টাকা জিনিষটা অদ্ভুত, না? দেশের কাজ ওই টাকার সিন্দুকে এসে ঠেকে গেছে।

সোমেশ্বরের দাদা প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ছোট্ট একটা নমস্কার করিয়া পুটুলীটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার আর বেশী বিলম্ব নাই। রাজকুমার যেন নূতন হইয়া উঠিয়াছে। পথে ঘাটে স্বচ্ছন্দে সে রাত্রি কাটাইয়া দিতে পারে। কিন্তু হাতের বোঝাটা নামাইবে কোথায়? যাহার চালচুলা নাই তাহার আবার স্মৃতি বজায় রাখিবার সাধ কেন মনে জাগে? গরীবের হৃদয়ের বালাই রাখিয়া কাজ ক?

সুকুমারের কথা মনে হইল। বেশ ছেলেট—সরলতার সঙ্গে তেজস্বিতা মিশিয়াছে তাহার মধ্যে। নিকটেই তাহার গৃহ। আরও কিছুটা হাঁটিয়া রাজকুমার সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুকুমার সবে মাত্র খেলিয়া ফিরিয়াছে, রাজকুমারকে দেখিয়া কলরব করিয়া অভ্যর্থনা করিল। জেলের কথা, খেলার কথা এবং সোমেশদার বাঙ্গলা ভ্রমণের কথা বলিয়া সে মুহূর্ত্তেই একেবারে আসর জমাইয়া তুলিল।

সে রাত্রে সে রাজকুমারকে ছাড়িয়া দিল না।

*

* *

পরের দিন আহারাদির পর সুকুমারের হাত হইতে রাজকুমার নিষ্কৃতি পাইল। পুটুলীটা তাহার নিকটে রাখিয়া রাজকুমার বাহির হইয়া পড়িল। জীবনকে জানিতে হইবে, পরের গৃহে থাকিলে ত' তাহার চলিবে না। রাজকুমার বাহিরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার নিজের কি গুণ আছে, কি কাজই বা সে করিতে পারে? স্কুল কলেজের বিদ্যা তাহার নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাকিলে কি কেহ তাহাকে গ্রহণ করিবে? ছাপের জোরে কত শত বাজে জিনিষও ত' বাজারে কাটিয়া যায়!

রাজকুমার চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল। অকস্মাৎ সুরভীর পিতার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার সহিত তাহার পরিচয় নাই, কিন্তু সে শুনিয়াছে যে হরিমোহনবাবু দেশকে ভালবাসেন এবং দেশভক্তদের উপকারের জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুরভীও পিতার অজস্র প্রশংসা করিয়াছে এবং তাঁহার দেশভক্তির অসংখ্য উদাহরণ দিয়াছে। এক হাজার, দুই হাজার করিয়া এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত অন্ততঃ বিশ হাজার টাকার মত দেশভক্তি তিনি দেখাইয়াছেন, উহা ব্যতীত সাধারণ দান ত' আছেই!

রাজকুমার তাঁহারই নিকট যাইবে বলিয়া স্থির করিল—দান গ্রহণের জন্য নহে, চাকুরীর জন্য। সামান্য চাকুরী পাইলেই তাহার চলিয়া যাইবে। বেশী দিন এইসব কাজ করিতে অবশ্য সে পারিবে না—দেবু অথবা পরাণের সন্ধান একবার পাইলেই হয়! একা কোন কিছু করিবার মত শক্তি সে মনের মধ্যে পাইতেছিল না।

রাজকুমার হরিমোহনের অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড অফিস! অনেক লোক কলম পিষিয়া চলিয়াছে। কোন কোন টেবিলে টুং টাং করিয়া ঘণ্টা বাজিতেছে—তক্‌মাধারী বেয়ারার দল এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে।

রাজকুমার ভিতরে প্রবেশ করিল। দরওয়ান তাহার মুখের দিকে চাহিল, বেশ সম্ভ্রম করিবার মত চেহারা বটে কিন্তু পোষাকের সঙ্গে তাহার কোন সামঞ্জস্য নাই। সে একটু ইতস্তত করিয়া যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমার একজন কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, হরিমোহনবাবু কোন্ ঘরে বসেন?

কেরাণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, হরিমোহন? তারপর একটু ঘাড় নাড়িয়া তাহার অজ্ঞতার কথা জানাইয়া সে পুনরায় নিজের কাজে মন দিল।

রাজকুমার রীতিমত বিস্মিত হইল। মালিককেই চেনে না! সে ভুল করিয়া অন্য কোন অফিসে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই ত'? পাশ দিয়া একজন তক্‌মাধারী বেয়ারা যাইতেছিল, তাহার কোমরের পিতলের চাকতীটার দিকে রাজকুমার চাহিয়া দেখিল—অফিসের নামের আদ্য অক্ষর তাহাতে লেখা রহিয়াছে, রাজকুমারের কোন ভুল হয় নাই।

বেয়ারাকে থামাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, হরিমোহনবাবুর ঘর কোনটা বলতে পার?

বেয়ারা চক্ষু বুঁজিয়া কি একটু ভাবিয়া বলিল, এইচ্‌! এইচ্‌ কি বলুন ত?

রাজকুমার মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, এইচ্‌, ব্যনার্জ্জি—এই অফিস যাঁর।

রাজকুমার প্রথমে যে কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহার কানে এইচ্‌ ব্যনার্জ্জি কথাটা প্রবেশ করিতেই সে চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, রাজকুমারের পোষাকের দিকে চাহিয়া একটু ভরসা পাইয়া হাতের কলমটা একপাশে রাখিয়া বিস্ফারিত চক্ষে বলিল, ম্যানেজিং ডিরেক্টার! বড় সাহেব! কি আশ্চর্য্য!

বেয়ারা রাজকুমারকে বলিল, আসুন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার হরিমোহন নিজের কামরায় বসিয়া একটা কাগজ দেখিতে ছিলেন। বেয়ারা রাজকুমারকে বাহিরে দাঁড় করাইয়া সাহেবের হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিল। সাহেব কাগজটায় চক্ষু বুলাইলেন। নামটা পড়িয়া তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অগন্তুককে পাঠাইয়া দিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

বেয়ারা বাহির হইয়া গেল, রাজকুমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। হরিমোহন ঈষৎ ঘাড় কাৎ করিয়া তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন।

রাজকুমার কোন দিন উমেদারী করে নাই, কোন দিন কিছু প্রার্থনা করে নাই। তাহার গলার স্বর যেন আট্‌কাইয়া গিয়াছিল। একটু কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া সে বলিল, আপনি দেশকে ভালবাসেন এবং তার জন্যে অনেক কিছু করেছেন জেনেই আপনার কাছে এসেছি।

রাজকুমারের খদ্দরের পোষাক হরিমোহনের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই এবং

নামটাও নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া মনে হইতেছিল না। মৃদু হাসিয়া তিনি হাত দিয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, বসুন।

রাজকুমার বসিয়া পড়িল। তিনি পুনরায় তাহার মুখের দিকে সেই রূপে চাহিলেন।

রাজকুমার একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, আপনার দেশ ভক্তির সুযোগ নিতে এসেছি।

কথাটার মধ্যে বেশ একটা নূতনত্ব আছে। ঝানু ব্যবসাদার হরিমোহনের কৌতুক বোধ হইতেছিল। কপাল কুঁচকাইয়া তিনি বলিলেন, চাঁদা বুঝি? কথা শেষ করিয়াই মাথাটা একটু নাড়িয়া তিনি বলিলেন, জেলা এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসকে মাঝে মাঝে টাকা আমি দিয়ে থাকি কিন্তু সে খুবই গোপনে। তারপর মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটাইয়া পুনরায় বলিলেন, দু'দশ হাজার টাকা দান করে ঢাক পিটোতে আমি চাই না। দেশের যাঁরা নেতা তাঁদের অনেকেই আমার বন্ধু, অনেকে দাদা বলেও ডাকে—টাকা দিয়ে মনে করি তাদেরই না হয় দান করলুম। কথা শেষ করিয়া নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই তিনি হাতটা একটু নাড়িয়া নীচের ঠোঁটটা সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিলেন।

রাজকুমার এতক্ষণে কিছুটা সহজ হইয়া বলিল, না চাঁদা চাইতে আসিনি। তারপর একটু ইতস্তত করিয়া থামিয়া থামিয়া সে বলিল, কয়েকদিন আগে আমি জেল থেকে বেরিয়েছি।

হরিমোহন এতক্ষণে রাজকুমারকে চিনিয়া ফেলিয়াছেন। বেশ ভাল করিয়া তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, মনোতোষের ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল বই কি! একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, তোমার কথা আমি শুনেছি! মনোতোষ, আমার জামাই, তোমার কথা বলেছে। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, 'তুমি' বলছি বলে রাগ করো না।

রাজকুমার সম্পূর্ণ সহজ হইয়া গিয়াছিল, সুরভীর পিতাকে তাহার বেশ ভালই লাগিতেছিল। সহজ ভাবেই মাথা নাড়িয়া সে হাসিয়া বলিল, না, না —কি যে বলেন, রাগ করব কেন ?

হরিমোহন হাসিয়া বলিলেন, দেশের কাজ করবে বই কি, নিশ্চয়ই করবে। জেলে ওরা দেবেই কিন্তু তাতেই পেছিয়ে পড়লে চলবে কেন। আমি এই বুড়ো বয়েসেও—যাক্। কি জান, আমার কার্য্য ক্ষেত্রে নেমে কাজ ক'রবার উপায় নেই—গুরুদেবের নিষেধ আছে। তারপর একটু থামিয়া কতকটা হতাশ ভাবেই বলিলেন, গুরুদেব আমাকেই যে কেন নিষেধ করে গেলেন ! একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, আমরা সাধারণ মানুষ, কতটুকুই বা বুঝি ?

এই সব কথার উত্তরে রাজকুমার কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়াই রহিল এবং হরিমোহনের কথাগুলি বেশ ভাল লাগিতেছে উপায়হীনের মত এমনি একটা ভাব মুখে ফুটাইয়া রাখিল।

হরিমোহন একটু থামিলেন। এই ছেলেটাই সুরভীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মনোতোষের ভয়ের কারণ হইয়া উঠিতেছিল। ইহাকে একবার বেশ করিয়া নাড়িয়া দেখিতে হইবে বই কি ! তাহার উপর নিজের কথাগুলি কতটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহা দেখিয়া লইয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, যারা বলে যে মিথ্যে ছাড়া ব্যবসা হয় না আমি তাদের দলে নই। তা হলে কি আর গত কয়েক বছর ধরে সব কটা ব্যবসাতে দশ ভাগ ডিভিডেণ্ট দিতে পারি ? কেরাণীদেরও ভালই মাইনে দেই —অধিকাংশই ষাট-সত্তর পায়। কথা শেষ করিয়া নীচের ঠোঁটটা পুনরায় সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, সাম্যবাদের শিক্ষাও নিয়েছি। বৈষম্য যাতে না বাড়ে

সেদিকে লক্ষ্য রেখে দেড়শ' টাকার বেশী মাইনে মাত্র চারজনকে দিয়ে থাকি।

সাম্যবাদ—না, সাম্য বাদ! এত' কথা শুনিতে হইবে রাজকুমার তাহা ভাবে নাই। কোন কথা না বলিয়া কেবলমাত্র চুপ করিয়া বসিয়া শোনা শোভন নয়। রাজকুমার বাধ্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, সব কটা কোম্পানীর মোট পুঁজি কত?

তাচ্ছিল্য ভরে হরিমোহন উত্তর করিলেন, খুব বেশী নয়—পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে আমার নিজের আছে চল্লিশ লক্ষ।

রাজকুমার বিস্ময় বোধ করিল। ইহার লাভের অঙ্কটা একবার হিসাব করিয়া লইল। বৈষম্য যাহাতে না বাড়ে সেদিকে ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে তাহা হইলে! দেশ উদ্ধার ইঁহারা নিশ্চয় করিবেন---কিন্তু দেশটা একবার ইঁহাদের হাতে গিয়া পড়িলে তাহার যে কি দশা হইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। বিদেশীর কেশ আকর্ষণ ভারত মাতা হয়ত কোন মতে সহ্য করিতেছেন, কিন্তু নিজের সন্তান যখন সেই কেশ মুঠায় গ্রহণ করিবে তখন তাঁহার পাতালে প্রবেশের পথ অন্বেষণ করা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকিবে কি? দেশের কাজে অর্থের প্রয়োজন আছে বলিয়াই কি এই অগণিত ভারতবাসীকে মুষ্টি-মেয় কয়েকটা লোকের পায়ে মাথা কুটিয়া মরিতে হইবে!

হরিমোহন মনে করিলেন তাঁহার টাকার পরিমাণ রাজকুমারকে একে-বারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। এই ছেলেটির আসার কারণ এতক্ষণে তিনি বুঝিয়াও লইয়াছেন। এইবার ইহাকে খেলাইয়া তুলিয়া একে-বারে মাটিতে আছড়াইয়া ফেলিতে হইবে, তাহার আশায় ছাই ছড়াইতে চাহি-য়াছিল এই এতটুকু একটা সামান্য ছেলে! অকস্মাৎ উদার হইয়া তিনি বলিলেন, আমার এখানকার কর্ম্মচারীদের বেশীর ভাগই দেশের জন্যে জেল

খেটেছে, অবশ্য চাকরী নেবার পর তারা যে আবার জেলে যাবে তা আমি পছন্দ করি না। ওটা শৃঙ্খলার কথা। তবে কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে যত ইচ্ছে রাজনীতিতে নাম কর আমার আপত্তি নেই।

রাজকুমার সম্মুখের টেবিলটার উপর হাত রাখিয়া মাথাটা একটু নীচু করিয়া বলিল, আমি এসেছিলুম চাক্‌রীর চেষ্টাতেই।

হরিমোহনের মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিল, রাজকুমারের নত মস্তকের দিকে চাহিয়া বলিল, বেশত, এর জন্যে লজ্জা কি? তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, কতদূর পর্য্যন্ত পড়েছ?

রাজকুমার নত মস্তক ধীরে ধীরে তুলিয়া বলিল, স্কুল-কলেজে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

হরিমোহনের মুখ কালো হইয়া গেল। মনোতোষ ইহাকেই ভয় পাইয়া ছিল! সুরভীর উপর তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেন। এযে একেবারে মাকাল ফল! সুরভীর কি রুচি জ্ঞান বলিয়া কিছুই নাই? কোটিপতির কন্যা হইয়া—ছিঃ। মনোতোষেরও বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টার হওয়া বৃথা হইয়াছে, শিক্ষা দীক্ষা হীন একটা নগণ্য যুবককে এত ভয়? ব্যারিষ্টারী না করিয়া তাঁহার ব্যবসায় শিক্ষানবিশী করিলে তাহার অনেক উপকার হইত। হরি-মোহন এতক্ষণ এই রূপবান যুবকটিকে নাড়িয়া দেখিতে ছিলেন, এইবার আঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন এই রূপ ভাব দেখাইয়া তিনি বলিলেন, চাক্‌রী করতে স্কুল কলেজের ছাপটা যে একান্তই দরকার! অবশ্য বুঝি সবই, ও সবের মূল্যই বা কতটুকু! আসল কথা হচ্ছে সততা আর চেষ্টা। সেটা তোমার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কি জান, বাহ্যিক চাক চিক্যেরও একটা দরকার হয় সময়ে সময়ে।

রাজকুমার মাথা নীচু করিয়াই রহিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হরিমোহন পুনরায় বলিলেন, আমার এখানে ম্যাট্রিকের নীচে কোন কেরাণী নেই—থাকাটা বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ একটা সাধারণ রীতি ত' বজায় রাখতে হয়—অন্য ডিরেক্টরদের মনও সন্তুষ্ট না রাখলে চলে না। মানুষের অভাব এত বেড়ে গেছে যে ম্যাট্রিক পাশ দু'জন বেয়ারা পর্যান্ত এখানে আছে. অবশ্য তাদের মাইনে অন্য বেযারাদের থেকে কিছু বেশীই দিতে হয়।

রাজকুমার কোন কথা বলিতে পারিল না, মুখ তুলিয়া একবার হরিমোহনের মুখের দিকে চাহিল মাত্র।

হরিমোহন বলিলেন, তোমাকে প্রথমেই কেরাণী করে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে একবার এখানে যা কিছু হয়ে যোগ দিলে দু'চার মাসের মধ্যেই কেরাণী করে নেওয়া যায়। তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, কিন্তু তোমার সঙ্গে অন্যের ত' তুলনাও হয় না, কি করি বল 'ত'? তুমি নিজেই এ সমস্যার সমাধান করে দাও।

রাজকুমার মনে মনে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিয়াছিল, এইবার মুখ তুলিয়া ম্লান ভাবে একটু হাসিয়া মৃদু স্বরে বলিল, বেয়ারাদের আমি ছোট মনে করিনে কিন্তু ছোট মনে করা উর্দ্ধতম কর্ত্তৃপক্ষ থেকে আরম্ভ করে নিম্নতম কেরাণীর পর্য্যন্ত মজ্জাগত হয়ে গেছে। সম্মান বজায় রেখে ও কাজ করা সত্যিই শক্ত।

রাজকুমারের এই উত্তরের জন্য হরিমোহন প্রস্তুত ছিলেন না, কোথায় যেন একটা খোঁচাও তিনি অনুভব করিলেন। কিন্তু খোঁচাটুকু গায়ে না মাখিয়া তিনি বলিলেন, মনোতোষের কাছে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখ, তার ত' মেয়র হবার সম্ভাবনা আছে! মেয়র হইবার কথা মনে হইতেই তিনি অকস্মাৎ যেন একটু ব্যস্ত ভাবেই বলিয়া উঠিলেন, তাই ত', আজই ত'

নির্ব্বাচনের দিন! হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, সময়ও বড় বেশী নেই, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ফলাফল জানা যাবে।

হরিমোহন একপাশে সরাইয়া রাখা কাগজটা টানিয়া আনিয়া সম্মুখে মেলিয়া ধরিলেন। রাজকুমার আর অযথা বসিয়া না থাকিয়া হাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আজ মেয়র নির্ব্বাচনের দিন। কথাটা রাজকুমারের জানা ছিল না। নির্ব্বাচিত হইবার জন্য মনোতোষ বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছে। তাহার জন্য হরিমোহনও অনেক কলকাঠি টিপিয়াছেন—দেশোদ্ধারের জন্য অনেক টাকা চাঁদা দিয়া মনোতোষের মনোনয়ন আদায় করিয়াছেন। সুরভী নিজেও রূপের হিল্লোল তুলিয়া ছুটাছুটি করিয়াছে বই কি! কিন্তু মনোনয়ন পাইলেই ত' হইবে না। তাহার দল ভারী সন্দেহ নাই, কিন্তু বিপক্ষ দলও নানা কলা-কৌশলে দল ভাঙ্গাইয়া লইতে পারে। স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ত' অনেকের দল করা! রাজকুমার নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে মনোতোষের গৃহের দিকে চলিতে লাগিল।

মনোতোষের গৃহের বাহিরে তিন চারিটা মোটর দাঁড়াইয়াছিল। সে বাড়ীতে যে একটা ব্যস্ততার ভাব দেখা দিয়াছে তাহা বাহির হইতেও বেশ বোঝা যায়। রাজকুমারের ঠোঁটের উপর একটা ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল। সুরভীর মনের এই দিকটা সে স্পষ্ট করিয়াই দেখিতে পাইয়াছে, হৈ চৈ করিয়া নিজেকে প্রচার করিতে তাহার খুব ভাল লাগে—সম্মান সে চায় অজস্র অর্থের বিনিময়েও। পথ দিয়া যখন সে হাঁটিবে তখন যেন লোকে তাহাকে চিনিতে পারিয়া সম্ভ্রম ভরে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকে, দূর হইতে তাহাকে দেখাইয়া যেন মানুষের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য দুই চারিটা কথাও অন্তত হয়—তাহার মোটরের নম্বরটা পর্য্যন্ত যেন সকলের জানা থাকে।

রাজকুমার আর একবার মনে মনে হাসিল। এই সুরভী-ই গ্রামে গিয়া শোভাযাত্রা করিয়াছে, তাহার ভাঙ্গা গৃহে থাকিয়া আসিয়াছে এবং তাহার পিতার নিকট অপমানিত হইয়াছে। পিতা যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা কোন দিন সে ভুলিবে না, সুরভী কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে? সুরভীর মনের এই সহজ দিকটার জন্য রাজকুমার আজ তাহাকে করুণা করে। এ দিকটা যেন সুরভীর মন হইতে শীঘ্রই মুছিযা যায়।

মনোতোষের গৃহের সম্মুখে আসিয়া রাজকুমার ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ভিতরে প্রবেশ করিতে মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্তত করিল—আজ উহারা কত না ব্যস্ত! এই সময় তাহার মত লোকের কি সেখানে প্রবেশ করা চলে! কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্তত করিয়াই সে ভিতরে প্রবেশ করিল। ধনীর গৃহে এইরূপ দিনের একটা অভিজ্ঞতা হইয়া যাওয়া মন্দ নহে।

বাহিরের ঘরে মনোতোষের বিলাত ফেরত বন্ধুরা বসিয়াছিল। করপোরেশন গৃহের আশে পাশে থাকিয়া তাহারা নির্ব্বাচনের ফলাফল জানিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। মনোতোষ গত রাত্রে আর গৃহে ফেরে নাই, নির্ব্বাচন শেষ হইবার পূর্ব্বে ফিরিবার কোন সম্ভাবনাও নাই। সুরভীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ইহারা অপেক্ষা করিতেছে। সুরভীও যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছে। জম্‌কালো পোষাকে আজ রূপের ফোয়ারা তুলিয়া সে সকলকে বিমোহিত করিয়া দিবে। হয়ত আজ তাহার স্বামী শ্রেষ্ঠ নাগরিকের সম্মান লাভ করিবে, এই সময় সে তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রকাশ না করিয়া কি থাকিতে পারে!

রাজকুমার একধারে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু বিস্ময় প্রকাশ করিল এবং তাহার পোষাকের দিকে চাহিয়া ঠোঁট উল্টাইল, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিল না। অত মোটা

খদ্দরের স্থান এ বাড়ীতে হইবার কথা নয়। মনোতোষও খদ্দরই পরে—শান্তিপুরের ধুতির মতই তাহার সেই খদ্দরের ধুতি। দেখিলে শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়, এই না হইলে দেশ ভক্তি! মোটা, বিশ্রী খদ্দরের মধ্যে অভাবের প্রকাশ আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম খদ্দরের জামা কাপড় পরার মধ্যেই ত' আছে দেশের শিল্পকে শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া তোলার চেষ্টা। মনোতোষের সেই শ্রদ্ধা আছে, তাহারাও কেহ কেহ তাহাকে অনুকরণ করিয়া এইরূপে দেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার শিক্ষা করিতেছে। ওই শ্রদ্ধাহীনের দিকে তাহারা আর ফিরিয়াও চাহিল না। রাজকুমারও কাহাকে কোন প্রশ্ন না করিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

প্রায় পনের মিনিট কাটিয়া গেল। ঘরের দুই চারিজন হাত ঘড়ির দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। কে একজন বেশ একটু অসহিষ্ণু হইয়াই বলিয়া উঠিল, সুরভী দেবী বড় দেরি করছেন।

তাহার কথা শেষ হইবামাত্র সুরভী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়া মৃদু হাস্যের সঙ্গে বলিল, আমার দেরি হয়ে গেছে, না?

তাহার দিকে চাহিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া গেল। উর্ব্বশী, তিলোত্তমার কথা তাহারা পড়িয়াছে। বোধ হইল আজ তাহাদের একজন তাহাদেরই প্রলোভিত করিতে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই কোন কথা বলিতে না পারিয়া সমস্ত ভুলিয়া তাহার মুখের দিকে চহিয়া বসিয়া রহিল। রাজকুমারের পর্য্যন্ত চমক লাগিয়া গিয়াছে। তাহার মুখে এক তৃপ্তির হাসি ভাসিয়া উঠিল—সুরভী বোধ হয় বাঁচিয়া গিয়াছে।

সকলকেই মুগ্ধ করিতে পারিয়াছে বুঝিয়া খুসীর সহিত সুরভী পুনরায় বলিল, আমি খুব দেরি করে ফেলেছি, না?

যে ব্যক্তি ইতিপূর্ব্বে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, ঘড়ি দেখিয়া সে বলিল,

না দেরি আবার কোথায়, এখনও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাকী আছে। আমাদের ত' আর নির্ব্বাচন ব্যাপারে হাত নেই।

সুরভীর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অপর একজন বলিল, হাত নেই এমন কথা বলা চলেনা।

সুরভী মৃদু হাসিয়া লজ্জা প্রকাশ করিয়া বলিল, কি যে বলেন! তারপর একটু থামিয়া বলিল, আর দেরি কেন, চলুন। সুরভী সকলের মুখের দিকে চাহিল। একধারে উপবিষ্ট রাজকুমারের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হইতেই সে তাহাকে খুসী করিবার জন্য হাসিয়া বলিল, ভাল আছেন?

রাজকুমার মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

সকলের দিকে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া সুরভী বলিল, আর দেরি নয়, চলুন।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমার কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুরভীও তাহার দিকে চাহিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, আপনি যাবেন নাকি? তারপরই নিজেকে সহজ করিয়া লইয়া বলিল, চলুন না।

রাজকুমারের আপত্তি করিবার কোন কারণ ছিল না। সেও সেই দলের সঙ্গেই বাহির হইয়া পড়িল।

করপোরেশনের ফটকে গাড়ীগুলি আসিয়া থামিল, তাহারা সকলেই নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ঘণ্টা খানেকের উপর সময় আছে। মনোতোষের সমর্থক সদস্যরা একটা ঘরে জটলা করিতেছে এবং মনোতোষ ব্যস্ত ভাবে প্রত্যেকের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তখনও দুইজন আসিয়া পৌছায় নাই এবং বিশেষ করিয়া এই দুইজন সম্বন্ধেই মনোতোষের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সুরভী আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল, বন্ধুরা বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল। সুরভী ভিতরে প্রবেশ করিয়াই সকলকে হাত তুলিয়া

নমস্কার করিল। প্রধান নাগরিকেরা এই অতি সুন্দরী নারীর দিকে চাহিয়া প্রতি নমস্কার করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া তাহাকে বসিতে বলিল।

মনোতোষ খুসী হইয়া সুরভীকে জিজ্ঞাসা করিল, ওরা সব এসেছে ?

সুরভী মৃদুস্বরে বলিল, হ্যাঁ।

মনোতোষ সকলের দিকে ফিরিয়া বিনীত ভাবে বলিল, নির্ব্বাচন দেখতে বন্ধুরা এসেছেন, ওদের আমি বসিয়ে আসছি। তারপর সুরভীর পাশে গিয়া কানের কাছে মুখ লইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, হরেনবাবু আর নিবারণবাবু এখনও আসেন নি, আমি তাদের ওখান থেকেও ঘুরে আসব, তুমি এখানেই থেকো। মনোতোষ পুনরায় সকলের দিকে বিনীত ভাবে চাহিল।

কে একজন বলিল, আপনি যেতে পারেন, ততক্ষণ আমরা লেডি মেয়রের সঙ্গে আলাপ করি। মেয়রের স্ত্রী লেডি মেয়র ত'? নিজের রসিকতায় সে নিজেই হাসিল

অপর একজন বলিল, না হে, মেয়রের স্ত্রী মেয়রের মেয়র।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। সুরভীও হাসিয়া মাথা নীচু করিল।

*

* *

আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকী। প্রধান নাগরিকেরা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মনোতোষ তখনও ফেরে নাই, দলকে ঠিক রাখিবার জন্য প্রাদেশিক কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকও আসিয়া গিয়াছেন। হরেনবাবু এবং নিবারণবাবুর দেখা নাই—অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া একটা কথা শোনা গিয়াছিল। নির্ব্বাচনের এই বিশেষ সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িলেও যে-কোন প্রকারে তাহা-

দের লইয়া আসা যে কর্ত্তব্য এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু আর সময়ও নাই, মনোতোষও আসিতেছে না। সে যে হরেন ও নিবারণের কাছে গিয়াছে একথা একমাত্র সুরভী ব্যতীত আর কেহ জানিত না। সমস্ত কর-পোরেশন গৃহ অনুসন্ধান করিয়াও মনোতোষের সন্ধান মিলে নাই। সুরভীও ব্যস্ত হইয়া উঠিল, এত দেরি হইবে তাহা সে মনে করে নাই।

সভাপতি বলিলেন, হরেনবাবু ও নিবারণবাবুর আগেই খবর দেওয়া উচিত ছিল।

কে একজন বলিল, শৃঙ্খলা ভঙ্গের শাস্তি হওয়া উচিত।

সভাপতি মুখ গম্ভীর করিলেন।

সকলকে নিশ্চিন্ত করিয়া মনোতোষ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, সঙ্গে হরেন এবং নিবারণ। সকলে কলরব করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিল।

সম্পাদক হরেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কিছু আগেই আপনাদের আসা উচিত ছিল।

হরেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, অসুস্থ ছিলাম যে!

সভাপতি বলিলেন, সে কথা আগে জানাতে হয়, আপনাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা আমরা করতে পারতুম। আজ মনোতোষবাবু হেরে গেলে আমাদের সম্মান কোথায় থাকবে বলুন ত'?

নিবারণ বিরক্ত হইয়া বলিল, অসুস্থতার কথা জানাবার কোন দরকার মনে করিনি—অসুখ অতি সামান্য। এখানে উপস্থিত না থাকবার কথা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভাবিনি তাই ঠিক সময়ে আসব বলেই দু'ঘণ্টা আগে আসিনি।

মনোতোষ সভাপতির দিকে চাহিয়া মিনতি করিয়াই বলিল, আমি গিয়ে দেখি ওঁরা আসবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, ওঁদের দোষ নেই।

সভাপতি মনোতোষের মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য একবার চাহিলেন, তার-পর মুখ গম্ভীর করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

আর মাত্র পনের মিনিট বাকী। সকলে উঠিয়া সভা কক্ষের দিকে চলি-লেন। সভাপতি ও সম্পাদক সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। ফলাফল জানিয়া তবে তাঁহারা যাইবেন, কিন্তু তাই বলিয়া দর্শকের আসনে বসিয়া থাকিবার ইচ্ছাও তাঁহাদের ছিল না।

সভাকক্ষের নিকটে আসিয়া সুরভীকে দর্শকদের স্থানে পৌছাইয়া দিবার জন্য মনোতোষ সকলের নিকট হইতে মুহূর্ত্তের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল।

চলিতে চলিতে সুরভী মৃদুস্বরে বলিল, হরেন ও নিবারণবাবুর ব্যাপার কি?

কানের কাছে মুখ লইয়া মনোতোষ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, মুহূর্ত্তেই হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। তারপর সুরভীকে যথাস্থানে পৌছা-ইয়া দিয়া মনোতোষ ফিরিয়া গেল।

*

* *

নির্ব্বাচনের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সকলের বুকই কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। সুরভী একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, বোধ হয় বাহ্য জ্ঞান তখন তাহার ছিল না। আধঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল জানা যাইবে। সকলেই ফলাফলের জন্য উদগ্রীব।

কোন্ দিক দিয়া সময় কাটিয়া গেল কেহই জানিতে পারে নাই। বিদায়ী মেয়র ফলাফল ঘোষণা করিলেন—মনোতোষ জয়লাভ করিয়াছে। ছয় ভোট সে বেশী পাইয়াছে অথচ হিসাব মত তাহার দশ ভোটে জয় লাভের কথা

ছিল। দুইজন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিশ্চয়ই অপর পক্ষকে সাহায্য করিয়াছে। হয়ত হরেন এবং নিবারণ—হাজারটি মুদ্রা গণিয়া লইয়াও। অথবা যাহারা বন্ধুরূপে হাসিয়া কথা বলিতেছে তাহাদেরই মধ্য হইতে দুইজন তাহাকে প্রতারণা করিয়াছে। কাহারা প্রতারণা করিয়াছে বুঝিবার উপায় নাই, অথচ সকলকেই হাসিয়া বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিয়া আপ্যায়িত করিতে হইবে। মনোতোষ একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

অবশেষে মনোতোষ জয়লাভ করিল! সুরভী-মনোতোষের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইয়াছে, স্বপ্ন সফল হইয়াছে। সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা মিটিল কিনা বর্ত্তমানে সুরভী তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহে। এইবার বিদায়ী মেয়র নূতন মেয়রকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে কান দিবার মত মনের অবস্থা সুরভীর ছিল না। মনোতোষকে একলা পাইবার জন্য কেন জানি তাহার মন অকস্মাৎ আকুল হইয়া উঠিল। সে তাহাকে মস্ত সম্মানের অধিকারী করিয়াছে।

মনোতোষের বন্ধুরাও খুসী হইয়া উঠিল, সুরভীকে সম্মুখে পাইয়া তাহাকেই সম্বর্দ্ধনা করিয়া প্রশংসায় অস্থির করিয়া তুলিল। এমন রূপবতী এবং গুণবতী স্ত্রী যাহার তাহার গলায় মালা দিবার জন্য সৌভাগ্য লক্ষ্মী ত' উন্মুখ হইয়া থাকিবেই!

কে একজন বলিল, এখানে আর বসে থেকে লাভ নেই, এবার ওই সম্বর্দ্ধনার পালাই চলবে। আমরাও তার জন্যে প্রস্তুত হই গিয়ে সুরভী দেবীর গৃহে।

আর একজন বলিল, মনোতোষ সন্ধ্যের আগে নিশ্চয়ই ফিরতে পারবে না সুতরাং ইতিমধ্যে এই ইতর জনদের জন্যে মিষ্টান্নের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

সকলেই সেই কথা সমর্থন করিয়া সুরভীকে ধরিয়া বসিল, নিশ্চয়ই, ফার-পোর পালা মেয়রের স্ত্রীর প্রথমেই একবার শেষ করা উচিত।

সুরভীর আপত্তি ছিল না। লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিল, বেশত, চলুন না।

যাইবার সময়ে সকলে সভাপতি ও সম্পাদকের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিল। তাঁহাদের মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিয়াছে। রাজকুমা-রের সহিত জেলে ইঁহাদের পরিচয় হইয়াছিল—রাজকুমারকে তাঁহারা চিনিতে পারিলেন। সে উভয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে লাগিল, সুরভীর দল সেখানে অল্পক্ষণ থাকিয়া দুই চারিটা কথা বলিয়া বাহির হইয়া গেল, রাজকুমারের কথা বোধ হয় কাহারও মনে ছিল না।

গাড়ীতে উঠিতে গিয়া সুরভী চারিদিকে চাহিতে লাগিল, রাজকুমার আসে নাই, কোথায় গেল সে?

অন্য সকলেও গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। সুরভীকে ইতস্তত চাহিতে দেখিয়া একজন বলিল, সেই তিনি ত' এলেন না?

সুরভী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, কে? গাড়ীর বাহিরে তখনও তাহার চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

লোকটি মৃদু হাস্যের সহিত বলিল, সেই নির্গুণ রাজপুত্রটি।

সুরভীর সমস্ত মুখ লজ্জায় ভরিয়া গেল, কোন মতে নিজেকে সংযত করিয়া সে বলিল, ওঃ, গাড়ী ছাড়তে বলুন। শেষ বারের মত সে করপোরেশন গৃহের ফটকের দিকে আর একবার না চাহিয়া পারিল না।

সব কয়টা মোটরই একে একে বাহির হইয়া গেল। রাজকুমার তাহা জানিতে পারে নাই। নেতাদের সহিত কথা শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়া সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। ফটকের বাহিরে আসিয়া

সে মোটরগুলিও দেখিতে পাইল না। তাহাকে ফেলিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে তাহা হইলে! একটা ম্লান হাসি তাহার ঠোঁটের উপর ভাসিয়া উঠিল। সুরভী তাহা হইলে বাঁচিয়াছে? কিন্তু সেকথা মনে করিয়া মনটা কেন জানি তাহার একটু বিষাদাচ্ছন্ন হইয়াও গেল।

ফটকের বাহিরে সে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। এতক্ষণ সে যেন বাস্তব জগৎ হইতে অনেকটা দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। কঠিন বাস্তব এইবার তাহাকে ঘা মারিয়া জাগাইয়া তুলিল। একটা রাত্রি কাটাইবার মত স্থানও তাহার নাই। মেয়র বা তাহার বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইলে ত' তাহার চলিবে না। এ ভালই হইয়াছে যে উহাদের সঙ্গে তাহাকে যাইতে হয় নাই। অনেকখানি সময় সে উহাদের সঙ্গে থাকিয়া নষ্ট করিয়াছে, এখনও যে সময় আছে তাহাতে হয়ত' রাত্রের আশ্রয় সে খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ পাইবে। আর সেখানে না দাঁড়াইয়া সে একদিক লক্ষ্য করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল।

পথ চলিতে চলিতে অনেক কিছুই চোখে পড়িতেছিল। মোটরে চড়িয়া কত লোক ব্যস্ত হইয়া চলিয়াছে। কোন কোনটা একরকম উড়িয়া চলিয়াছে, মুহূর্ত্ত সময়ের অপচয়ে যেন তাহাদের লক্ষ ক্ষতি হইয়া যাইবে। চাপা পড়িয়া দুই চারিটা লোক যদি মরিয়াও যায় তাহাতে তাহাদের কোন ক্ষতি নাই, যাহারা চাপা পড়িবার জন্য জন্মায় তাহাদের মূল্য কতটুকু! তাহাদের মুহূর্ত্ত সময় উহাদের জীবন অপেক্ষা শত সহস্র গুণ মূল্যবান। বাসে ট্রামেও ঝুলিয়া ঝুলিয়া চলিয়াছে মানুষ—ব্যস্ততা তাহাদেরও বড় কম নয়।

রাজকুমার ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিল। সুসজ্জিত দুই চারিটা দোকানের আশে পাশে ছোট ছোট দোকান খুলিয়া কত লোক ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার জীবনও একদিন হয়ত' ওই সাজানো

দোকানগুলির মতই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অথবা তেমনি সুন্দর ভাবেই ফুটিয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চিত হইল না, সে আপনার চেষ্টায় আর কতখানি রস সংগ্রহ করিতে পারিবে! আশে পাশে কোন স্নেহ হস্ত নাই, যাহারা ছিল তাহারা একে একে ঝরিয়া পড়িয়াছে—বৃক্ষ কি ঝড় সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে? ওই ছোট ছোট দোকানগুলির মত করিয়াও যদি সে টিকিয়া যাইতে পারে! রাস্তায় কাঠের বাক্স সাজাইয়া যাহারা ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবা অনর্গল বকিয়া চলে তাহাদের মত করিয়া বাঁচিয়া থাকিলেও বোধ হয় তাহার চলিত, কিন্তু অকস্মাৎ কোন্ পথিকের পদাঘাতে পথের ধূলায় গড়াইয়া পড়িতেছে। রাজকুমার ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল।

চলিতে চলিতে একজনের সঙ্গে তাহার ধাক্কা লাগিয়া গেল। পথিক থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, অন্ধ, উজবুক।

রাজকুমার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল—পথিক তখন অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছে। সেও ব্যস্ত, ক্রোধ প্রকাশের জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করা হয়ত' তাহার পক্ষে সম্ভব কিন্তু আকস্মিক ভাবে যদি কাহারও গায়ে গা লাগিয়া মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিয়া দেয় তাহা হইলে আর সহ্য করা সম্ভব নয়, ধৃষ্টতার শাস্তি সে দিবেই। রাজকুমার ফিরিয়া পুনরায় কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই মস্ত বোঝা মাথায় লইয়া এক মুটিয়া তাহার পাশ দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল, আর একটু হইলেই রাজকুমার উল্টাইয়া পড়িয়া যাইত।

সমস্ত সহরটা ব্যস্ত হইয়া বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী গতিবেগ। রাজকুমার বুঝিতে পারিল যে সহরের গতির সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহাকে চলিতে হইবে, অন্যথায় এখানে তাহার স্থান নাই।

মাইল খানেকের উপর হাঁটিয়া একটা চৌমাথার মোড়ে আসিয়া রাজকুমার

থামিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে তাহাই বোধ হয় ভাবিতে লাগিল। এমনি করিয়া পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া গেলে ত' আর রাত্রের আশ্রয় মিলিবে না—আহারও জুটিবে না। কি করিবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। তাহার নিকটেই দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধ কি যেন বিক্রয় করিতেছে। রাজকুমারকে সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, একটা মাজন নিন্ না।

রাজকুমার কোন কথা না বলিয়া তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল মাত্র।

বৃদ্ধ মনে মনে বোধ করি উৎসাহিত হইয়া বলিল, নিন্ না, দাঁতের রক্ত পড়া বন্ধ হবে, মুখে কোন গন্ধ থাকবে না—মাত্র দু' আনা প্যাকেট।

রাজকুমার এইবার মৃদু হাসিয়া বলিল, দুটো পয়সাই বা কোথায় ?

বৃদ্ধ তাহার মুখের দিকে চাহিল। রাজপুত্রের মত রূপ অথচ—। অন্য ক্রেতার নিকট আবেদন জানাইবার জন্য বৃদ্ধ সরিয়া গেল।

রাজকুমার আরও কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার সম্মুখেই ততক্ষণে বৃদ্ধ চারিটা প্যাকেট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। রাজকুমার বুঝিতে পারিল যে জিনিষটার কাটতি আছে। কিন্তু ইহার সহিত তাহার রাত্রের আশ্রয়ের কোন সম্পর্ক নাই, সে পুনরায় একদিক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিল। অন্যমনস্কের মত আরও প্রায় আধঘণ্টা ঘুরিয়া তাহার চেতনা হইল যে সে পুনরায় সেই চৌমাথার উপরই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রাজকুমার চাহিয়া দেখিল যে সেই বৃদ্ধ তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁতের মাজন বিক্রয় করিতেছে। ক্ষণকাল কি ভাবিয়া সে সেই বৃদ্ধের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এগুলো কি নিজেই তৈরী করেন ?

বৃদ্ধ রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, না, কিনে আনতে হয়।

রাজকুমার সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম লাভ থাকে?

বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন?

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, আমিও হয়ত এ কাজে লেগে যেতে পারি। স্বাধীন ব্যবসা ত' বটে!

তাহার কথা বৃদ্ধ সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না, আপাদ মস্তক তাহাকে একবার দেখিয়া লইল—মোটা খদ্দরের পোযাক। অবস্থা ভাল না হইলেও সে যে স্বদেশী করে বৃদ্ধ তাহা বুঝিতে পারিল। হয়ত স্বদেশী করে বলিয়াই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য এ কাজ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে। বৃদ্ধ মৃদু স্বরে বলিল, আমার কাছ থেকে নিয়ে রাস্তার ও দিকে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। এক ডজন বিক্রী করতে পারলে ছ' পয়সা পাবেন।

রাজকুমার হিসাব করিয়া দেখিল যে ছয়টা পয়সা পাইলেই মুড়ি গুড় দিয়া রাত্রের আহার স্বচ্ছন্দে সমাধান করা যাইবে।

সে তাহার নিকট হইতে কতকগুলি গুণিয়া লইয়া রাস্তার অপর পারে গিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধের মত করিয়া সে বলিতে পারিতেছে না। অভ্যস্ত সুরও তাহার জানা নাই। মাজন বিক্রয়ের সুযোগ করিবার জন্য নিজের দুরবস্থার কথা বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে সে কোনদিনও পারিবে না। তথাপি তাহার মাজনও বিক্রয় হইতে লাগিল। খদ্দরের জামা কাপড় পরা এই রূপবান যুবকটির দিকে চাহিয়া পথিকেরা সহজেই কয়টা পয়সা দিয়া ক্রেতা হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল—বেশ বিক্রয় হইতেছে। যাহারা ওই মাজন তৈয়ারী করে তাহাদের সহিত উহার পরিচয় সে করাইয়া দিবে না, নিজের জিনিষ সে উহাকে দিয়া বিক্রয় করাইবে তাহা হইলে প্রতি ডজনে তাহার দুই পয়সা করিয়া লাভ থাকিবে।

কিছুক্ষণ একই ভাবে ক্রেতাদের আকর্ষণ করিতে করিতে রাজকুমার

বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করা যে শক্ত তাহা সে বেশ অনুভব করিল। অভ্যাস হইয়া গেলে অবশ্য আর কোন চিন্তা নাই, বিরক্তি সত্ত্বেও রাজকুমার থামিতে পারিল না, অন্তত দুই ডজন তাহাকে বিক্রয় করিতেই হইবে।

ক্রমে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। রাত্রি বোধ করি তখন আটটা। বৃদ্ধ রাজকুমারের নিকটে আসিয়া বলিল, এইবার বাড়ী ফিরব, ক'টা বিক্রী করেছ হিসেব কর।

রাজকুমার হিসাব করিয়া বলিল, তেইশটা। অবশিষ্ট প্যাকেটগুলি সে বৃদ্ধের হাতে তুলিয়া দিল—বৃদ্ধ সেই গুলি গুণিয়া নিজের থলিয়াতে ভরিয়া লইয়া বলিল, সাড়ে এগার পয়সা তুমি পাবে, বাকীটা দাও।

রাজকুমার এগারটা পয়সা নিজের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট যাহা ছিল বৃদ্ধের হাতে দিয়া খুসী হইয়া বলিল, কাল কোথায় দেখা করব?

বৃদ্ধ কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, দু' জন একই রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাজ নেই, কাল খুব ভোরেই আমার কাছ থেকে মাল নিয়ে তুমি আর একটা বড় রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িও। রাজকুমারের সঙ্গে বৃদ্ধ অধীনস্থ কর্ম্মচারীর মতই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। রাজকুমার তাহাতে কিছুই মনে করিল না, বয়সের সম্মান দিতে তাহার কোনই আপত্তি নাই।

রাজকুমার মাথা নাড়িয়া তাহার কথা মানিয়া লইল। বৃদ্ধ নিজের ঠিকানা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি থাক কোথায়?

এতক্ষণে রাজকুমারের যেন অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল, রাত্রের আশ্রয়ের সন্ধান করিতেই ত' সে বাহির হইয়াছিল। আহার দুই এক দিন না জুটিলেও হয়ত চলে, কিন্তু পথে ঘাটে পড়িয়া থাকা সহজ নহে। যে কাজ আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে লাগিয়া থাকিতে পারিলে সামান্য মাথা

গুঁজিবার আশ্রয়ের সহিত একবেলা আহারও অন্তত তাহার জুটিয়া যাইবে। কিন্তু উপস্থিত কয়দিন তাহার উপায় কি ?

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়ীটা আমার ঘরের কাছাকাছি হ'লেই ভাল হয়।

রাজকুমার মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার কোন ঘর নেই।

বৃদ্ধ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এমনি রূপ যাহার তাহার মাথা রাখিবার মত কোন স্থান নাই এই কথাটা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। নিশ্চয়ই সে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধের তাহাকে ভং র্সনা করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিল না। সস্নেহে সে কেবলমাত্র বলিল, চল আমার সঙ্গে।

রাজকুমার বাঁচিয়া গেল। মাথা গুঁজিবার একটা আশ্রয় মিলিবে তবে। আশ্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার পর এইবার অনেক কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক মূল্যে করিতে হয়। তবু মন্দ লাগিতেছিল না—একটা কৌতূহল জাগিয়াছে মনে। সম্মোহিত মানুষের একটা সত্তা যেন আর একটা সত্তার দিকে চাহিয়া আছে।

রাজকুমারকে লইয়া বৃদ্ধ তাহার ঘরে আসিয়া পৌছাইল। অন্ধকারে পাশাপাশি কতকগুলি ঘর, সবগুলি ঘরই নানা দেশীয় লোকে ভর্ত্তি। হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালী-হিন্দুস্থানী-উড়িয়া-মাদ্রাজী বোধ হয় কোন দেশের লোকই বাদ পড়ে নাই। কোথাও বা পাঁচ ছয় জন পুরুষ একটা ঘর দখল করিয়া আছে, কোন ঘরে আবার পুত্র কন্যা স্ত্রী সহ মানুষ বাস করে। নানা দেশীয় পুরুষ এবং নারীতে বস্তীটা ভর্ত্তি। এমনি একটা ঘর দখল করিয়া ছিল এই বৃদ্ধ রামনাথ। আড়াই টাকা ভাড়ায় ইহা অপেক্ষা ভাল ঘর কলিকাতায় মেলে না। রামনাথের মন এখনও সংস্কার কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়াই সে ঘর

খানিকে আরও অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। নিজের পাওনা বারান্দাটুকু সে দরমা দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিল ঘরের আবরু বাঁচাইবার জন্য। এই আবরু রক্ষা করিবার কারণ তাহার একমাত্র কন্যা, আদর করিয়া যাহার নাম সে রাখিয়াছিল মিনতি। এই বারান্দারই এক পাশে রান্নার ব্যবস্থা—যখন উনান ধরান হইত তখন সেই ঘরে বা বারান্দায় বসিয়া থাকিবার সাধ্য একমাত্র মিনতি ব্যতীত আর কাহারও হইত কিনা সন্দেহ, পরীক্ষা করিয়া দেখা সম্ভব হয় নাই কেননা রামনাথ সেই সময় থাকিত বাহিরে তাহার দাঁতের মাজন লইয়া। রামনাথের জীবনে কোন রবিবার ছিলনা, বৃষ্টিতেও তাহাকে ছেঁড়া ছাতা মাথায় ভিজিতে হইত। সেদিন দুর্ভোগও হইত বেশী, বিক্রয়ও হইত কম। তথাপি বাহির না হইয়া সে পারিত না, সঞ্চিত কিছুই ত' থাকে না।

বারান্দায় আসিয়া বোঝাটা একপাশে নামাইয়া রামনাথ ক্লান্ত ভাবে এক পাশে বসিয়া পড়িতেই কন্যা সাড়া দিয়া একটা বাতি হাতে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। পিতা আজ একা নহে। রাজকুমার একপাশে দাঁড়াইয়াছিল। মিটমিটে আলোয় রাজকুমার দেখিল মিনতির গায়ের রং ময়লা, একটু কালোর ধার ঘেঁসিয়াই গিয়াছে—অভাবে সমস্ত দেহে কেমন যেন একটু রুক্ষ ভাব। মুখটা রাজকুমারের মন্দ লাগিল না, গালের দুইপাশ ভাঙ্গিয়া গেলেও নাকটা বেশ উঁচু এবং চক্ষু দুইটা টানা টানা। রাজকুমারের মনে হইল যে সে-চক্ষে এখনও বিদ্যুৎ খেলে। মিনতিও রাজকুমারকে পলকের জন্য দেখিয়া লইয়াছিল, তাহার দিকে পুনরায় চাহিবার মত শক্তিও আর তাহার ছিল না—এত রূপ সে আর কোন দিন দেখে নাই। মিনতির চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য বুঁজিয়া আসিল।

রামনাথ মাজনের বোঝাটা কন্যার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, এটা নিয়ে যাও মা, আর এই পয়সাগুলো। পকেট হইতে পয়সা গুলি বাহির

করিয়া সে মেঝের উপর ফেলিয়া দিল। রাজকুমারের কি মনে হইতেই সেও নিজের পকেট হইতে তাহার রোজগারের পয়সা এগারটা বাহির করিয়া রামনাথের দিকে প্রসারিত করিয়া বলিল, এগুলোও নিন্।

রামনাথের অকস্মাৎ রাজকুমারের উপস্থিতির কথা মনে পড়িয়া গেল, সে ব্যস্ত হইয়া অন্তরঙ্গ ভাবে বলিল, তাইত' তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বস। তাহার প্রসারিত হস্তের পয়সা গুলির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে বলিয়া উঠিল, না, না, ওসব থাক না তোমারই কাছে।

রাজকুমার বলিল, আমার কাছে থাকার ত' কোন দরকার নেই—আমি নিজেই ত' আপনার পরিবারের একজন হয়ে গেছি।

রামনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, তা বটে। তারপর কন্যাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, ওগুলোও নিয়ে যাও মা।

মিনতি বোঝাটা এবং পিতার দেওয়া পয়সাগুলি তুলিয়া লইয়াছিল, এইবার রাজকুমারের দিকে ফিরিয়া চাহিল। রাজকুমার মিনতির দিকে চাহিল। স্বল্প আলোকেও চারি চক্ষু মিলিত হইল। মিনতি হরিণ শিশুর মত মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল, বিরাট এক অজগর যেন তাহাকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে। এই লোকটি তাহাদেরই গৃহে থাকিবে তাহাদের পরিবারের একজন হইয়া! মিনতির বুকের রক্ত যেন শীতল হইয়া যাইতে চাহিল। হাত বাড়াইয়া পয়সা গুলি গ্রহণ করিবার শক্তিও তাহার রহিল না। রাজকুমার তাহার লজ্জা বুঝিতে পারিয়া সেগুলি মেঝের উপরই ঢালিয়া দিল।

রামনাথ বলিল, এবার আমাদের খেতে দাও।

রাজকুমারের দেওয়া পয়সা গুলি কুড়াইয়া লইয়া মিনতি ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। সে রাত্রে তাহার আর আহার হইল না।

*

* *

রাজকুমার এইখানেই থাকিয়া গেল। ইহাও ত' জীবনের একটা খেলা। গ্রামের শান্ত জীবনে যে একদিন চাঞ্চল্য আনিয়াছিল আজ তাহারই জীবন হোঁচট খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পরাণ এবং দেবু পল্লীর পথে পথে ফিরিয়া হয়ত' এখনও একলা চলার গান গাহিয়া চলিয়াছে। সতী মাঝে মাঝে ফিরিয়া আসে গ্রামে। সোমেশ্বর মানুষকে জানিতে বাহির হইয়াছে ভারত-পথিক রূপে। সুরভী আজ শ্রেষ্ঠ নাগরিকের স্ত্রী। তরুণ সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্রকে জমিদারের হাত হইতে বাঁচাইতে হইলে কিছুদিন গ্রাম ছাড়িয়া থাকিতেই হইবে। কিন্তু জীবনকে জানিতে আসিয়া সে যে জীবন হারাইতে বসিয়াছে। উপায় নাই, কিছুদিন তাহাকে এই ভাবেই টানিয়া চলিতে হইবে।

সুকুমারের গৃহ হইতে সে তাহার পুটুলীটা লইয়া আসিয়াছে। কয়েকটা বই-খাতা এবং একটা ছিন্ন সাড়ী—নিজের একটা খদ্দরের মোটা ধুতি এবং জামা। মিনতি ভাবিয়া পাইল না, ওই রাজপুত্রের ন্যায় রূপবান পুরুষটির এই সামান্য সম্বল কি করিয়া সম্ভব? তাহার পিতার ন্যায় তাহারও সন্দেহ হইল, নিশ্চয় সে কোন কারণে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। রূপ দেখিয়া মিনতি চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারে না।

রাজকুমারের নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে। সে ও রামনাথ প্রভাতে উঠিয়াই নিজ নিজ বোঝা লইয়া বাহির হইয়া যায় এবং ফিরিয়া আসে দ্বিপ্রহরে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্নানাহার সারিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়ে এবং ফিরিয়া আসে রাত্রি নয়টার পর। রাজকুমারের রং-এর উপর কয়েক দিনেই একটা ম্লান ছায়া পড়িয়া গেল।

দিন পনের হইয়া গিয়াছে। জীবনের এ খেলা আর চলিবে না। এক-দিকে নোংরা বস্তীতে মিনতি ও রামনাথ অপরদিকে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ নাগরিক মনোতোষ ও তাহার সুন্দরী স্ত্রী। এ দুইয়ের সঙ্গেই রাজকুমারের যোগ স্থাপিত হইয়াছে, অথচ সে ইহাদের কাহারও নহে। আর বেশীদিন নয়, উভয় বন্ধন ছিন্ন করিয়াই সে চলিয়া যাইবে। তাহার কর্ম্মস্থল তাহাকে আহ্বান করিতেছে। পরাণ-দেবু-সোমেশ্বরকে যদি নাও পাওয়া যায় তবে তাহাকে একলাই চলিতে হইবে।

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমার গৃহে ফিরিয়া আসিল। গৃহে বজ্র উদ্যত হইয়া ছিল—রামনাথ শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। রাজকুমারের বুক কি এক শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

তাহাকে সান্ত্বনা দিবার মত করিয়াই মিনতি বলিল, ভয় নেই, এরকম আরও অনেকবার হয়েছে।

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, জ্ঞানও থাকে না? তাহার কণ্ঠস্বর স্থির বলিয়া মনে হইল না।

শান্ত ভাবে মিনতি উত্তর করিল, কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞানও থাকে না। তারপর একটু থামিয়া বলিল, এবার অবশ্য সবই একটু বেশী বলে মনে হচ্ছে।

রাজকুমার আর কোন কথা বলিল না, রামনাথের মাথার কাছে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধের নিশ্বাস পড়িতেছে। ওই টুকু বন্ধ হইলেই সে চির দিনের মত নিশ্চিন্ত হইতে পারে। বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইলে তাহাকে যে মহা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে! ওই যে মেয়েটি পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে তাহাকে ফেলিয়া সে যাইবে কেমন করিয়া? অথচ তাহারই জন্য এখানে পড়িয়া থাকিলেও ত' চলিবে না। কোন বন্ধন তাহার ছিল না, যাহারা দাবী করিতে পারিত তাহারা স্বেচ্ছায় তাহাকে মুক্তি

দিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই অনাত্মীয়া সামান্য পরিচিতা মেয়েটি কোন দাবী না থাকা সত্ত্বেও কেমন সহজে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষের ম্লান দৃষ্টিই ত' তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিবার পক্ষে যথেষ্ট। না, রামনাথকে বাঁচিতেই হইবে—তাহার মরা চলিবে না। রাজকুমার মিনতির দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারিল না।

মিনতি শান্ত স্বরে বলিল, আপনি খেয়ে নিন্ কুমারদা, উঠুন।

রাজকুমার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, একান্ত নির্ভরতায় সে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। 'কুমারদা' বলিয়া সম্বোধন ইতিপূর্বে সে দুই একবারের বেশী করে নাই, পিতার মধ্যস্থতায়েই তাহার কাজ চলিয়া যাইত। কিন্তু এইমাত্র এই সম্বোধনে তাহার কণ্ঠে যে স্বর ফুটিয়া উঠিল তাহাকে লক্ষ্য না করিয়া কেহ পারে না, রাজকুমারও পারিল না। রাজ-কুমারের বোধ হয় আর ইহাকে ছাড়িয়া যাওয়া হইল না। সে উঠিয়া গেল। রামনাথ তখনও নির্জ্জীবের মতই পড়িয়া রহিয়াছে, চেতনা সঞ্চার হয় নাই—সেই দিকে একবার চাহিয়া মিনতিও উঠিয়া দাঁড়াইল।

গভীর রাত্রিতে রামনাথের চেতনা ফিরিয়া আসিল। মিনতি এবং রাজকুমার তখনও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে চক্ষু খুলিতে দেখিয়া তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া রোগীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

রামনাথের ঠোঁট দুইটা বার কয়েক কাঁপিয়া উঠিল। মিনতি আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া একেবারে পিতার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, বাবা।

বৃদ্ধের চক্ষু বুঁজিয়া আসিতেছিল, কন্যার আহ্বানে পুনরায় সে চক্ষু দুইটা খুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া একটা হাত তুলিবার চেষ্টা করিল, কিছুটা

উঠিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে হাতটা পড়িয়া গেল। ঠোঁট দুইটা পুনরায় কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা বাহির হইল না। মিনতি আর পারিল না, পিতার বুকের উপর ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাজকুমার এতক্ষণ কোন কিছু করিতে পারে নাই, এইবার বৃদ্ধের বুকের উপর হইতে মিনতির মাথাটা নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল, ছিঃ, কাঁদতে নেই, একটু দুধ জোগাড় করে খাইয়ে দাও।

মিনতি রাজকুমারের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চক্ষে একান্ত নির্ভরতার ভাব তখন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকাল সেই ভাবে চাহিয়া থাকিয়া সে নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

গরম দুধ লইয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন রামনাথ ভুল বকিতে আরম্ভ করিয়াছে। মিনতি আসিয়া শুনিতে পাইল পিতা অস্ফুট স্বরে বলিয়া চলিয়াছে, তখন চারিদিকে অভাব, খাবার জোটেনা—তোর মা দু' পয়সার বিস্কুট কিনে তোকে খাইয়েছিল বলে কি ধমকই দিয়েছিলাম। আহা, একটা ভাল জিনিষও তোদের খাওয়াতে পারিনিরে।

মিনতি ও রাজকুমার অনেক চেষ্টায় কিছুটা দুধ বৃদ্ধের গলায় ঢালিয়া দিতে পারিল। অনেকেই বৃদ্ধের এই আকস্মিক অসুস্থতার কথা জানিতে পারিয়াছে। বস্তীর নিকটেই বাস করিত সম্পন্ন গৃহস্থ হরেরাম। তাহার বাড়ীতে তিন চারিটা ভাল ঘর, ছেলে মেয়েও তাহার সাত আটটা। বড় মেয়ে এবং ছেলের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ছোট ছোট দুইটা ছেলে মেয়ে রাখিয়া অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার স্ত্রী সমস্ত হিসাব না মিটাইয়া চির বিদায় লইয়াছে। হরেরাম প্রৌঢ়—রামনাথের সহিত সে বিশেষ ঘনিষ্ট হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল, দৃষ্টি অবশ্য ছিল মিনতির উপরই। স্ত্রীর আসন সে শূন্য রাখিবার পক্ষপাতী নহে। পুত্র কন্যা রাখিয়া যে হিসাব একজন না

মিটাইয়াই চলিয়া গিয়াছে সেই হিসাব বুঝিয়া লইবার জন্যই মিনতিকে প্রয়োজন। রামনাথ তাহাতে কিছুতেই সম্মত হয় নাই। কিন্তু সেও ছাড়িবার পাত্র নয়। তাহার কিছু টাকার জোর ছিল এবং ওই জিনিষটার জোর সংসারে নিতান্ত কম নহে। রাজকুমার উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসায় সে বড় কম বিরক্ত হয় নাই। তথাপি ভরসা এইটুকু ছিল যে ছেলেটি সত্যই রূপবান এবং বিবাহ করিতে চাহিলে মিনতি অপেক্ষা সহস্র গুণ সুন্দরী কন্যা লাভ তাহার পক্ষে শক্ত হইবে না। চাই কি, হরেরাম কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়াও তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে।

রামনাথের এই শেষ সময়ে হরেরাম না আসিয়া পারে নাই—তাহারও হয়ত ইহাই শেষ চেষ্টা। আঃ, আজ ওই ছোকরা না থাকিলে তাহার কি সুবিধাই না হইত, মিনতির মাথায় হাত দিয়া সান্ত্বনা দিবার সুযোগও যে মিলিত না তাহাই বা কে বলিতে পারে! যাহাই হউক প্রথম রাত্রিতে ঘুমাইয়া শেষ রাত্রের দিকে নিতান্ত শোকাভিভূতের ন্যায় সে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজকুমারের দিকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া একপাশে গিয়া বসিল। মিনতি তাহার দিকে মুহূর্তের জন্য চাহিয়া দেখিল, হরেরামের দৃষ্টি তাহারই উপর নিবদ্ধ হইয়া আছে। পিতার এই শেষ সময়ে শকুনির মতই তাহাকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্যই হয়ত সে আসিয়াছে। মিনতির বুক কি এক অজানা শঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।

রামনাথ কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়াছিল,পুনরায় আরম্ভ করিল, কোথায় থাকবি তুই? হরেরাম—রাজকুমার।

হরেরাম ব্যস্ত হইয়া খানিকটা আগাইয়া আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, এই ত' আমি।

রামনাথ শূন্য দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় বলিতে

লাগিল, কেউ দেখবে না, কেউ না। আঃ, ভগবান্। সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, কি যেন দেখিবার জন্য একবার চারদিকে চাহিল, তারপর চক্ষু বুঁজিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

মিনতি আর পারিতেছিল না, রাজকুমারের কথায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে, এইবার সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতার জীবনের আশা সে ছাড়িয়া দিয়াছে—তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া রুদ্ধ স্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

আর সান্ত্বনা দিবার কিছু নাই, পিতার বুকে লুটাইয়া পড়িয়া কন্যা তাহার শেষ ইচ্ছা মিটাইয়া লউক। রাজকুমার আর কোন বাধা দিল না। একটা ডাক্তার পর্য্যন্ত ডাকিবার সামর্থ্য তাহাদের ছিল না।

অকস্মাৎ হরেরামের যেন সেই কথাই মনে পড়িয়া গেল, বোধ করি মিনতিকে লক্ষ্য করিয়াই সে বলিল, একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি, হয়ত' এখনও—।

রাজকুমার ম্লান ভাবে বলিল, ডাক্তার ডাকার ক্ষমতাটুকুই ওতে শুধু বোঝা যাবে, কাজ কিছু হবে না।

বিরক্তি ভরে তাহার দিকে একটা কটাক্ষ করিয়া হরেরাম মিনতির উত্তর শুনিবার জন্যই বোধ করি তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু মিনতি কোন কথাই বলিল না।

রামনাথ চমকিয়া জাগিয়া দুই হাতে জোর করিয়া কন্যাকে বক্ষের উপর হইতে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত করিয়া হাত বাড়াইয়া কি যেন ধরিবার জন্য উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়াই পুনরায় শয্যায় লুটাইয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গেই তাহার শেষ নিশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল। মিনতি পুনরায় পিতার বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, আর কোন বাধাই

মানিল না। দুই চক্ষু বাহিয়া অজস্র ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হরেরাম তাহাকে শান্ত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল, রাজকুমার একদিকে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—আশ পাশের ঘরের লোকে তখন সেই ছোট্ট ঘরটা ভরিয়া গিয়াছে। বাহিরের উঠানে ক্ষীণ আলো আসিয়া পড়িয়াছে, বোধ হয় ভোর হইয়া আসিতেছিল—রাজকুমার উঠিয়া বাহিরে গেল।

*

* *

রাজকুমার এবং মিনতি। তৃতীয় যে ব্যক্তিকে মধ্যস্থ রাখিয়া নিঃসম্পর্কীয় হইয়াও ওই দুইটি যুবক যুবতী নিশ্চিন্ত হইয়া একই সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে পারিত, সেই ব্যক্তির মৃত্যুতে তাহাদের সেই নিশ্চিন্ততা আর রহিল না। বারান্দায় যেখানে রান্না হয় তাহারই একপাশে রাজকুমারকে শয্যা গ্রহণ করিতে হয়। হরেরাম প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া আসিয়া অভি-ভাবকত্ব ফলাইয়া যায় এবং রাজকুমারের প্রতি কটাক্ষ করিতেও ছাড়ে না। মিনতিকে এই গৃহে সে যেন এখনও দয়া করিয়াই রাখিয়াছে এই ভাব প্রকাশ করিতেও তাহার বাধে না, যে গৃহ মিনতির জন্য অনেকদিন হইতেই অপেক্ষা করিয়া আছে সেই গৃহে সে যে তাহাকে শীঘ্রই লইয়া যাইবে এই কথাও অবধারিত সত্যরূপেই সে বস্তীর অধিবাসীদের বেশ সহজ ভাবেই জানাইয়া দিয়াছিল। রাজকুমারের উপস্থিতিতে সকলেই বেশ একটু চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছে—বেশ একটা লড়াই দেখিবার সৌভাগ্য হয়ত' তাহাদের হইবে। একদিকে রূপ-যৌবন এবং দারিদ্র্য, অপর দিকে প্রৌঢ়ত্ব এবং অর্থ—মাঝখানে মিনতি, একটা পথ তাহাকে বাছিয়া লইতে হইবে। বস্তীর অধি-বাসীরা আশু দ্বন্দ্বের মজা উপভোগ করিবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইতেছিল।

রামনাথের মৃত্যুর পর প্রায় মাস খানেক কাটিয়া গিয়াছে। ফেরী করা রাজকুমারের সহ্য হইয়া গেছে। তাহার জীবনের গতির প্রতি চাহিয়া তাহার হাসি পায়। কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিয়া সে কোথায় আট্‌কাইয়া গিয়াছে! মিনতির বিবাহের পূর্ব্বে তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু হরেরামের সহিত উহার বিবাহের কথা মনে হইলেই তাহার তরুণ মন কেন জানি বিদ্রোহ করিতে চাহে। দেশের কোন কাজ সে করিতে পারে নাই, করিবার ক্ষমতাও হয়ত' নাই—কিন্তু তাই বলিয়া সরল সহজ-বিশ্বাসী একটি তরুণীর উপকার করিবার মত সামান্য শক্তিও কি তাহার নাই? হয়ত' নাই। রাজকুমারের দৃষ্টিতে কোন পথই ত' পড়ে না, তথাপি সে পথের সন্ধান করিবে। হরেরাম—না, তাহা সে কিছুতেই পারিবে না।

রাজকুমার মিনতিকে পড়াইতে আরম্ভ করিল, লেখা পড়া কিছু জানা একান্তই চাই। মিনতি কিছু কিছু জানিত। নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা ভুলিয়া থাকিবার জন্য সে অনেকখানি সময় পড়া শুনায় ব্যয় করিতে লাগিল। সারাদিনে কাজও ত' বড় বেশী নাই। আরও একটি কাজের অংশ সে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছে। রাজকুমার এখন মাজন ও চানাচুর লইয়া বাহির হয় এবং দুইটা জিনিষই নিজে তৈয়ারী করিয়া লয়, ইহাতে কিছু বেশী লাভ থাকে। এই কাজে মিনতি যথেষ্ট সাহায্য করে। দ্বিপ্রহরের সমস্তটা সময় সে পড়াশুনা এবং এই কাজের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছে। চিন্তা করিবার জন্য আর সময় বড় বেশী না থাকায় সে বাঁচিয়া গিয়াছে।

আজ শনিবার। সুরভীর নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়িয়া গেল। মেয়র হইয়াছে মনোতোষ—তাই আজ উৎসব। মাজন এবং চানাচুরের থলিয়া লই-য়াই সে সুরভীদের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। নানা রঙের আলোক

আলোয় সে গৃহ সজ্জিত, বাহিরের ফটকের উপর দুইটা উজ্জ্বল আলো সমস্ত স্থানটা দিনের মত করিয়া রাখিয়াছে—সেই আলো দুইটার উপরে দুইটা তেরঙা পতাকা। বাড়ীর সুসজ্জিত উদ্যানে সামিয়ানা টানান হইয়াছে। তেরঙা পতাকার মত করিয়া তিন রঙের কাপড়ে সমস্ত দিক ঢাকা, খুঁটি গুলি পর্য্যন্ত বাদ পড়ে নাই—সামিয়ানার উপরে একটা বিরাট সিল্কের তেরঙা পতাকা উড়িতেছে, নীচে বিজলী বাতির ঝাড় গুলি হইতে নানা রঙের আলো বাহির হইতেছে এবং ঘন ঘন পাখা পূর্ণ দমে ঘুরিতেছে। চারিদিকে ছোট ছোট টেবিল ঘিরিয়া চারিটা করিয়া চেয়ার। পুরুষ এবং নারীর দল নানা প্রকার পোষাকে এখানে ওখানে জটলা করিতেছে। নারীদের সাড়ীর রঙ্ এবং গহনার জৌলুষে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়। এই সব সৌভাগ্য লক্ষ্মীর প্রিয় পাত্র-দের যে সব মোটর বহিয়া আনিয়া ধন্য হইয়াছে সেগুলি বাহিরে পুনরায় ধন্য হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সব কয়টাতেই ছোট ছোট তেরঙা পতাকা শোভা পাইতেছে। রাজকুমার সমস্ত দিকে চাহিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল—স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকেরা কি আজ এইখানে একত্রিত হইয়াছে নাকি! মুহূর্ত্তের জন্য সে ইতস্ততঃ করিল, ভিতরে প্রবেশ করা উচিত হইবে কিনা তাহা একবার না ভাবিয়া পারিল না। পরমুহূর্ত্তেই তাহার ঠোঁটের উপর এক অদ্ভুত হাসি খেলিয়া গেল—সে ধীর পায়ে ভিতরে প্রবেশ করিল।

গাড়ী বারান্দার তলায় সুরভী এবং মনোতোষ দাঁড়াইয়া অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করিতেছিল। রাজকুমার সেইখানে আসিয়া পৌঁছাইতেই মনোতোষের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, গম্ভীর মুখে সুরভীর দিকে এক-বার চাহিয়াই সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, মনোতোষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উপলব্ধি করিয়া সুরভী মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টি অবনত করিয়াই মৃদু হাসিয়া

লজ্জিত ভাবে বলিল, আসুন কুমার বাবু। সে কৌতূহল ভরে রাজকুমারের কাঁধ হইতে ঝুলান খদ্দরের থলিয়াটার দিকে বার বার চাহিতে লাগিল।

সেই কৌতূহলী দৃষ্টি দেখিয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া রাজকুমার বলিল, আজকাল সময় ত' বড় বেশী পাইনা যে ঘন ঘন এমনি সব বড় বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে গৃহস্বামীদের বিরক্তির কারণ হব।

সুরভী ব্যস্ত হইয়া বলিল, কি যে বলেন—।

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, মেয়রের মেয়র ত' হয়েছেন অনেক দিন—ইতর-জনদের মিষ্টান্ন বিতরণে এত দেরি করলেন কেন?

মনোতোষের মুখে একটু খুসীর ভাব দেখা গেল, কিন্তু তখনও সে কোন কথা বলিল না।

সুরভী একটু হাসিয়া বলিল, এর মধ্যে আর ত' সময় হল না—ঘন ঘন ভোজ সভায় নিমন্ত্রণ হতে লাগল আমাদেরই, ফারপো, গ্র্যাণ্ড ইত্যাদি। উনি হোটেল পছন্দ করলেন না, ব্যবস্থা অবশ্য হোটেলেরই—খাবার থেকে বেয়ারা পর্য্যন্ত।

রাজকুমার উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল। সুরভী বলিল, বাগানে গিয়ে বসুন, আমরাও যাচ্ছি, মিসেস্ গুহার জন্যে শুধু অপেক্ষা করছি।

রাজকুমার সামিয়ানার নীচে গিয়া উপস্থিত হইল। প্রত্যেকটি খুঁটিতে একটি করিয়া ছবি—খুঁটির ব্যবস্থা গুণিয়া গুণিয়া করা হইয়াছে, ছবিগুলি কংগ্রেস সভাপতিদের, আর কাহারও ছবি নাই। ইহাও মনোতোষেরই পরি-কল্পনা। মনোতোষের বন্ধুরা এবং উপস্থিত সকলেই এই পরিকল্পনার প্রশংসা করিয়াছে। এই না হইলে দেশভক্ত! রাজকুমার ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে টেবিলগুলি ঘিরিয়া বসিয়া গেল, কাঁটা চামচ এবং খাদ্য সহ প্লেট একের পর এক আসিতে লাগিল। চেয়ারের হাতলে থলিয়াটা ঝুলাইয়া রাখিয়া রাজকুমার হাতা গুটাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাহাদের সহিত সে এক টেবিলে বসিয়াছিল তাঁহারা বেশ সহজ ভাবেই কাঁটা চামচ তুলিয়া লইয়া কথা বলিতে বলিতে আহারে মন দিয়াছে, এমন কি তরুণী মেয়েটি পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। রাজকুমার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সব দিকেই টুং টাং করিয়া শব্দ হইতেছে—মেয়েরাও দিব্যি কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতেছে। ক্ষণমাত্র ইতস্তত করিয়া রাজকুমার টেবিলের অন্য তিনজনকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাস্যের সঙ্গে বলিল, মাপ করবেন, ওসব যন্ত্র আমার চলবে না।

তরুণী হাসিল, অপর একজন বলিল, আগেই বুঝেছি।

রাজকুমার আর কোন কথা না বলিয়া কাঁটা চামচ একপাশে সরাইয়া রাখিয়া আহারে মন দিল—আর কোন দিকে চাহিয়া দেখিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, চাহিলে দেখিতে পাইত যে তাহার টেবিলের অপর পুরুষ দুইটির ঠোঁট বিদ্রূপে বাঁকিয়া উঠিয়াছে।

সুরভী-মনোতোষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের নিকটে গিয়া তদারক করিতেছে। রাজকুমার নীরবে আহার করিতেছিল। মনোতোষ তাহাদের নিকটে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমার কাঁটা চামচ ফেলিয়া অসভ্যের ন্যায় এ কি করিতেছে! যে দুইজন পুরুষ এক টেবিলে বসিয়াছিল তাহারা উভয়েই মনোতোষের অবস্থা বুঝিল। একজন ঈষৎ হাসিয়া রাজকুমারের দিকে কটাক্ষ করিয়া মনোতোষকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, এখানে আমরা একটুও আরাম বোধ করছি না রায়, মিস্ দত্ত ত' একরকম চুপ করেই আছেন।

মিস্ দত্ত নারী এবং তরুণী—স্নো, পাউডার, রুজেও তাহার ভিতরকার নারী জনোচিত ভাব একেবারে দূর হইয়া যায় নাই, সে সহজ ভাবেই মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। কথা শেষ করিয়া সে রাজকুমারের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে আলাপ নেই, কিছু মনে করবেন না।

রাজকুমার আহার থামাইয়া হাসিল, সম্মুখের পুরুষ দুইজনের দিকে চাহিয়া তেমনি হাসিমুখেই বলিল, আর দেরি করব না, অনেকদূর হাঁটতে হবে—শেষ অভদ্রতাটুকু করে টেবিল থেকেই বিদায় নিচ্ছি। মনোতোষের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনার তেরঙা পতাকা আর কংগ্রেস সভাপতিদের ছবি বেঁচে থাক। কিন্তু একটা উপদেশ দিয়ে যাই, ওই ছবিগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটা সরিয়ে রাখবেন, নইলে সকলের সামনেই ওঁরা হয়ত' ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মত আপনার জন্যে প্রার্থনা করতে বসবেন। অন্যমনস্কের মত সে চেয়ারের হাতল হইতে থলিয়াটা তুলিয়া লইতে গেল। দুর্ভাগ্য বশত হাতের ধাক্কা লাগিয়া সেটা মাটিতে পড়িয়া যাইতেই তাহার ভিতর হইতে কয়েকটা চানাচুর এবং দাঁতের মাজনের পুরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। একটা কিছু হইতেছে মনে করিয়া অভ্যাগতদের সকলেই এই দিকে চাহিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল। চানাচুর-মাজনের পুরিয়াগুলি বাহির হইয়া পড়িতেই অনেকেই সমস্ত ভদ্রতার কথা ভুলিয়া গিয়া জোরে জোরে হাসিয়া উঠিল। সুরভী দাঁড়াইয়া ছিল অন্যদিকে, ব্যাপার কি দেখিতে সে দ্রুত সেই দিকে যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

রাজকুমারের টেবিলের একজন হাসিতে হাসিতে বিদ্রূপ ভরে বলিল, আমি শেয়ার মার্কেটের ব্রোকার, লোকের মুখ দেখেই বুঝতে পারি—এই জন্যেই ত' এত অসুবিধা বোধ করছিলাম।

রাজকুমারের মুখে মুহূর্ত্তের জন্য অপ্রস্তুতের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই সে একেবারে সহজ হইয়া হাসিয়া বলিল, ব্রোকার—মানে দালাল না? আর কোন কথা না বলিয়া নত হইয়া সে পূরিয়াগুলি কুড়াইয়া লইতে লাগিল।

সুরভী ততক্ষণে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, পূরিয়াগুলির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার মুখ একেবারে কালো হইয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া থাকাও অসম্ভব মনে হওয়ায় সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

থলিয়াটা গুছাইয়া লইয়া রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল, অত্যন্ত সহজ ভাবে মৃদু হাসিয়া সুরভীর পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া থাকা নিশ্চল দেহটার দিকে চাহিয়া বলিল, আপনাদের মোটরের তেরঙা পতাকা সশব্দে উড়ে আমাদের মত লোক-দের যেন এমনি করেই দূরে সরিয়ে দিতে পারে চিরকাল। সে আর দাঁড়াইল না, নিঃশব্দে সে-স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইতেই মনোতোষের মন ক্ষোভে ভরিয়া গেল, সে চলিয়া যাওয়ায় নহে—চলিয়া যাইবার সময়েও সে যে বিদ্রূপ করিয়া গেল তাহার উত্তর দিতে না পারায়।

ভোজ সভা আর কিছুতেই জমিল না, শত চেষ্টা করিয়াও আর কেহ সহজ হইতে পারিল না—সুরভী-মনোতোষের মুখের শুষ্ক ভাব পর্য্যন্ত গেল না। শুষ্ক মুখ লইয়াও তাহারা সকলকে পূর্ব্ব অবস্থায় লইয়া যাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিল বটে কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল।

একে একে সকলেই বিদায় লইতে লাগিল। যাইবার সময়েও সহজভাবে কেহ হাসিতে পারিল না, সুরভী-মনোতোষও সহজ ভাবে হাসিয়া বিদায় দিতে পারিল না। রাজকুমারের বিদ্রূপ বাণ তখনও তাহাদের কানে বিঁধিতেছিল। মোটরের সম্মুখে আসিয়া মিস্ দত্ত একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তার-পর ধীরে ধীরে তেরঙা পতাকাটা মোটর হইতে খুলিয়া লইয়া হাতের মুঠায় গোপন করিয়া ফেলিল।

*

*　　　　*

রাজকুমার খুসীমনে পথ চলিতেছিল, কেন জানি না আজ তাহার খুব হালকা বোধ হইতেছিল। অনেকদিন পর মুক্তি পাইলে মানুষ বোধ হয় এইরূপই বোধ করিয়া থাকে। কি মনে হইতেই সে একটা খাবারের দোকা-নের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সে নিজে আজ অনেকগুলি ভাল খাদ্য আহার করিয়াছে, মিনতির জন্যও কিছু আজ সে লইয়া যাইবে। মনে পড়িয়া গেল প্রলাপের ঘোরে মিনতির পিতা যাহা বলিয়াছিল, দুই পয়সার বিস্কুট কন্যার হাতে তুলিয়া দিবার মত সামর্থ্যও তাহার ছিল না। যে পয়সা আজ সে লাভ করিয়াছে তাহা দিয়া মিনতির জন্য কিছু সে কিনিয়া লইল। মনটা আরও খুসী হইয়া উঠিল। চুপে চুপে সে গৃহে প্রবেশ করিবে বলিয়া স্থির করিল, খাবারের ঠোঙ্গা মিনতির হাতে তুলিয়া দিয়া সে তাহাকে একেবারে অবাক করিয়া দিবে।

তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় প্রায় আটটা হইবে। রাজকুমার ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠিয়া আসিল, কিন্তু সে স্থান হইতে আর সে নড়িতে পারিল না। ঘরের ভিতরে একধারে একটা বাতি মিটি মিটি জ্বলিতেছে, ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর বেশ করিয়া জ াঁকাইয়া বসিয়া হরেরাম অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। দুরে একপাশে পুটুলীর মত জড়সড় হইয়া যে বসিয়া রহিয়াছে সে যে মিনতি তাহা বুঝিতে রাজকুমারের বিলম্ব হইল না।

হরেরাম বলিতেছিল, এভাবে একজন পুরুষের সঙ্গে তোমার আর থাকা চলে না মিনতি—রাজকুমার ভাল কি মন্দ জানিনা, জানার দরকারও নেই কারণ আজ যে ভাল কাল তার মন্দ হতে বাধা নেই। তোমাকে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে।

মিনতি তেমনি স্তব্ধ হইয়াই বসিয়া রহিল, তাহার মধ্যে কোন প্রাণের স্পন্দন আছে বলিয়াও মনে হইল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া হরেরাম বলিল, তোমাদের নামে এর মধ্যেই যথেষ্ট কথা আরম্ভ হয়ে গেছে, সে সব কথা বিশ্বাস না করাও শক্ত। আমার ভবিষ্যতের কথা মনে করে আমি এতে বাধা না দিয়ে পারিনা।

রাজকুমারের হাসি পাইল। ওই প্রৌঢ় তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। তাহার শেষ হইয়া আসা ভবিষ্যৎ সে কি মনে মনে ওই তরুণীর সহিত জড়াইয়া ফেলিয়াছে নাকি?

হরেরাম পুনরায় কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার বাবার শেষ সময়ের কথা নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে, আমার হাতে তোমাকে দেবার যে তার ইচ্ছে ছিল তা' ত' জানই। তার সেই শেষ অনুরোধ আমি ব্যর্থ হতে দেব না। ক্ষণকাল থামিয়া সে বেশ জোর দিয়াই বলিল, তোমার সুনাম আমাকে বজায় রাখতেই হবে—কালই আমার বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যাব।

কোন উত্তর না পাইয়া হরেরাম কিছুই ঠিক বুঝিতে পারিল না, তাহার কথাগুলি ওই মেয়েটির উপর কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাও এই অন্ধকারে সে বুঝিতে পারিতেছিল না। হরেরামও আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আর বাহিরে বারান্দায় না দাঁড়াইয়া থাকিয়া এইবার রাজকুমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে এই অসময়ে আসিতে দেখিয়া হরেরাম চমকিয়া উঠিল, কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া ফেলিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। তাহার কথাগুলি রাজকুমার শুনিতে পাইয়াছে কিনা তাহা বুঝিতে

না পারিয়া সে প্রথমে কোন কথাই বলিল না, ওই দিক হইতে আক্রমণের জন্যই সে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

রাজকুমার ভিতরে প্রবেশ করিয়াই কোন ভনিতা না করিয়া বলিল, তা' হলে ওর সুনাম বজায় রাখবার জন্যে ওকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়াই ঠিক করলেন?

হরেরাম তাহার কথার ভাবটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া থামিয়া থামিয়া বলিল, সেই ত' ভাল, এদিকটা ত' আমাদের দেখতেই হবে।

রাজকুমার বলিল, আপনার বাড়ীতে ওর সুনাম থাকবে তাহলে?

হরেরাম সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, নিশ্চয়, সে আমি ঠিক ব্যবস্থা করতে পারব।

রাজকুমার এইবার একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিল, আপনিই ত' ওকে বিয়ে করতে চান?

অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও তাহার গলার স্বরটা হরেরামের ভাল বোধ হইল না, তথাপি সাহস সঞ্চয় করিয়া সে বলিল, ওর বাবার সেই রকমই ইচ্ছে ছিল।

কঠিন স্বরে রাজকুমার বলিল, ওঃ, আপনার নিজের ইচ্ছে নেই! ক্ষণকাল থামিয়া আঙ্গুল দিয়া দরজা দেখাইয়া দিয়া রাজকুমার সেইরূপ ভাবে বলিল, আমি যতদিন বেঁচে আছি, এ দরজা দিয়ে আর ভেতরে ঢুকবেন না, যান্।

এই কথার পর দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস হরেরামের ছিল না। সে ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় চাপা গলায় কেবল মাত্র বলিয়া গেল, বেশ।

হরেরাম বাহির হইয়া যাইতেই রাজকুমার সস্নেহে ডাকিল, মিনু।

এ ডাক মিনতি ইতিপূর্ব্বে কোন দিন শোনে নাই। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষু বুঁজিয়া আসিল, বোধ হয় সে আর বসিয়া থাকিতে পারিবে না। হরেরামের কথায় তাহার মনে যে শঙ্কা জাগিয়া উঠিয়াছিল, ওই একটি ডাকেই যেন তাহার সমস্তই ধুইয়া গেল।

মিনতির অবস্থা রাজকুমার বোধ করি বুঝিতে পারিল। মিনতি যেখানে বসিয়াছিল সেইখানে আগাইয়া গিয়া হাতের থলিয়াটা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া ঠোঙ্গাটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, তোমার জন্তে এনেছি—ধর।

মিনতি ফিরিয়া চাহিল, আজ এত সুখ কেন? হরেরাম প্রতিদিন আসিয়া তাহাকে এমনি করিয়া দুঃখ দিক—রাজকুমারের ডাক শুনিয়া সে জুড়াইবে।

রাজকুমার পুনরায় সস্নেহে বলিল, ওঠ, বসে থাকে না, ছিঃ—এত' দুঃখ কিসের?

মিনতি আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া দাঁড়াইয়া রাজকুমারের প্রসারিত হস্ত হইতে ঠোঙ্গাটা তুলিয়া লইল। তাহার সমস্ত শরীর বার বার কাঁপিয়া উঠিল।

রাজকুমার সোজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি বেঁচে থাকতে ওই বুড়োকে তোমার কোন ভয় নেই মিনু। সুনামের জন্য ভেবনা, গরীবের ওটা বজায় থাকাই কষ্টকর।

*

* *

মিনতি রাজকুমারের নিকট নিয়মিত পাঠ শিক্ষা করিত—পড়িবার সময় অবশ্য রাত্রি ছাড়া আর বড় মিলিত না। মিনতি দুপুরেও কিছুটা সময়

করিয়া লইয়া নিজে নিজেই পড়িত অথবা লিখিত। সেদিন রাত্রে পড়িতে বসিয়া একটা খাতা সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়া মিনতি বলিল, আজ দুপুরে লিখেছি —হাতের লেখা ভাল হয়নি কুমার দা ?

রাজকুমার হাসিয়া খাতাটার দিকে চাহিল, বেশ সুন্দর ছাঁদে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'সদা সত্য কথা বলিবে', 'চুরি করা বড় দোষ'। রাজকুমারের মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, কথা দুইটা তাহার কানে বার বার আঘাত করিতে লাগিল, যেন বহুদিন পূর্ব্বেও তাহার কানে ওই কথা দুইটা আঘাত করিয়াছে। রাজকুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মিনতির দিকে চাহিল।

মিনতি তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কৌতুক ভরে বলিল, কি দেখে লিখেছি বলত' ?

রাজকুমার কতকটা সহজ হইয়া বলিল, সেইটাই ত' ভাবছি মিনু।

মিনতি সুন্দর দৃষ্টি দিয়া রাজকুমারকে অভিষিক্ত করিয়া আর একটা খাতা তাহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া বলিল, তোমার বইগুলোর মধ্যে ছিল।

রাজকুমার খাতাটা টানিয়া লইল, গোটা গোটা হরফে ওই কথাগুলিই লেখা রহিয়াছে। বহুদিনের হারাইয়া যাওয়া স্মৃতি, নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই মিনতি তাহা বহিয়া আনিয়াছে তাহার নিকটে। সে প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া বলিল, গোটা গোটা বাঁকা হরফে লেখা রহিয়াছে—কুমারী সতী ঘোষাল।

মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, সতী কে কুমার দা ?

অন্যমনস্কের ন্যায় রাজকুমার উত্তর করিল, আমার বাল্যসাথী।

'ঘোষাল' দেখিয়া মিনতি মনে করিয়াছিল সতী রাজকুমারের সহোদরা। নিজের ভুল বুঝিয়া সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, সে এখন কোথায় ?

অতীতের কথায় রাজকুমার একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে, নিতান্ত অন্য-মনস্কের মত বলিল, হারিয়ে গেছে।

কথাটা ঠিক মত ধরিতে না পারিলেও সে কথা আর না তুলিয়া মিনতি জিজ্ঞাসা করিল, কার লেখা সুন্দর হয়েছে কুমারদা ?

রাজকুমার এতক্ষণে অনেকটা সহজ হইয়া বলিল, তোমার। তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তার লেখা খুব ছোট বেলার। বড় হয়ে সে কেমন লিখতে শিখেছে, জানিনা। জোর করিয়া এইবার সে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিয়া সে বলিল, ওসব রেখে এখন মন দিয়ে পড় ত' দুষ্টু মেয়ে।

মিনতি মাথা দুলাইয়া বলিল, আজ থাক। সে একটু দূরে সরিয়া গেল।

নিকটে টানিয়া আনিবার জন্য রাজকুমার হাত বাড়াইয়া মিনতির একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। হাত ধরিয়াই সে চমকিয়া গেল, হাতটা বেশ গরম। ব্যস্ত হইয়া সে মিনতির নিকটে আসিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, জ্বর হয়েছে নাকি ?

মিনতির মুখের উপর রাজকুমারের নিশ্বাস পড়িতেছিল, তাহার চক্ষু দুইটা আপনা হইতেই বুঁজিয়া গেল, সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

মিনতির কপালে হাত রাখিয়া তাহার দেহের উত্তাপ অনুভব করিয়া রাজ-কুমার চিন্তিত স্বরে বলিল, বেশ জ্বর হয়েছে দেখছি।

কোন মতে চক্ষু খুলিয়া মিনতি বলিল, ও কিছু নয়, রোজই গা ওরকম একটু গরম হয়।

রাজকুমারের চিন্তা তাহাতে বাড়িয়াই গেল, অন্যমনস্কের মত মিনতির মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করিতে করিতে বলিল, রোজই হয় ?

*

*　　　　*

সেদিন রাত্রে ফিরিয়া রাজকুমার দেখিল যে মিনতি ঘরের মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে। রাজকুমার যে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহাও সে জানিতে পারে নাই। রাজকুমার থলিয়াটা কাঁধ হইতে নামাইয়া একপাশে রাখিয়া দিয়া নত হইয়া মিনতির গায়ে হাত দিল। সেই স্পর্শে মিনতি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিল—সেই আধা অন্ধকারেও রাজকুমার দেখিতে পাইল যে মিনতির চক্ষু দুইটা লাল হইয়া উঠিয়াছে।

মিনতি মৃদু স্বরে কেবল মাত্র ডাকিল, কুমারদা।

এই একান্ত নির্ভরশীলা নারীকে লজ্জা করিবার মত কোন কারণ রাজকুমারের চক্ষে পড়িল না। সে তাহার শয্যা পাতিয়া তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া সেখানে শোয়াইয়া দিল—সমস্ত দেহ তাহার তখন পুড়িয়া যাইতেছিল। রাজকুমার কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। ডাক্তার ডাকিতে গেলে তাহার ঔষধ আছে এবং সেই এক ঔষধে কাজ নাও হইতে পারে, ডাক্তারকেও হয়ত' বার বার ডাকিতে হইবে। গরীবের পক্ষে কখনও এত সম্ভব নয়। পরাণের কথা মনে হইল, হোমিও প্যাথিক ঔষবের বাক্স এবং পরাণের অধীনে ডাক্তার রূপে তাহারা। কেহ মরিয়াছে, কেহ বাঁচিয়াছে—ঔষধ পড়িয়াছে মনে করিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা সান্ত্বনা ত' কতকটা পাইয়াছে! হরেরাম সংবাদ পাইলে হয়ত' এখনই ছুটিয়া আসিবে। ভবিষ্যতে স্ত্রী হইতে সম্মত হইলেই সে এখন হইতেই স্বামীত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করিতে যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হরেরামের নিকট হইতে সে এই সংবাদ গোপন করিয়া রাখিবে।

মিনতি একেবারেই নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, খুব মৃদু মৃদু নিশ্বাস পড়ি-

তেছে—রাজকুমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। আর সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না—ধীরে ধীরে যে সামান্য নিশ্বাস টুকু তখনও পড়িতেছিল তাহাকে কোন মতে ধরিয়া রাখিতেই হইবে। সে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই এক প্রৌঢ় ডাক্তার সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

সামান্য আলোতে অন্ধকার যতটুকু দূর হইয়াছিল তাহাতে ডাক্তার প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণকাল চক্ষু বুঁজিয়া থাকিয়া তিনি পুনরায় চক্ষু মেলিলেন। রোগিণীকে দেখিয়া এইবার তাহার শয্যায় গিয়া নানা ভাবে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া মুখ বাঁকাইলেন, তারপর চারিদিকে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ঘরের চালে কালী এবং ঝুল জমিয়া এমন কালো হইয়া গিয়াছে যে সেই দিকে চাহিয়া তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, মাটির দেওয়ালও ঝুল এবং কালীতে একেবারে কালো হইয়াই ছিল। ডাক্তার মৃদু স্বরে বলিলেন, এ ঘরে থাকলে এঁকে বাঁচান কিছুতেই সম্ভব নয়।

রাজকুমার ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, অসুখটা কি ?

চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িয়া ডাক্তার বলিলেন, প্লুরুসী। এঁকে বাঁচাতে হলে ঘর ছাড়তে হবে। তিনি আর কোন কথা না বলিয়া ঔষধ লিখিয়া দিলেন এবং ভিজিট লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

রাজকুমার কাতর ভাবে বলিল, কেমন দেখলেন, বাঁচবে ত' ?

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, এখন রোগের মাত্র প্রথম অবস্থা, ভাল করে চিকিৎসা হলে নিশ্চয়ই বাঁচবে। তবে প্রথমেই দরকার একটু শুক্‌নো ঘরে ওঁকে নিয়ে যাওয়া। তারপর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কতকটা আপন মনেই সহানুভূতি পূর্ণ স্বরে বলিলেন, ভাল ঘরে

নিয়ে যাওয়া খুবই শক্ত তা' অবশ্য বুঝি। কিন্তু কি করি আমাদের কর্ত্তব্য উপদেশ দেওয়া। আচ্ছা আসি, কাল সকালে একবার খবর দেবেন—ওষুধ বদলে দেবার দরকার হতে পারে।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। রাজকুমার সেই দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া রহিল, তিনি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে সে চেতনা ফিরিয়া পাইল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া সে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। রোগিণী তখন নিস্তব্ধ হইয়াই আছে, নিশ্বাস বহিতেছে অতি ধীরে ধীরে।

তাহার নিজের আহারের কথা মনে রহিল না, মিনতি রান্না করিতেও পারে নাই। তাহার রোগ ক্লান্ত মুখের দিকে চাহিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া রাজকুমার ঔষধ আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

দশ দিন কাটিয়া গিয়াছে। রোগের বড় বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ডাক্তার শেষ বারের মত জানাইয়া দিয়াছেন যে এই ঘরে থাকিলে তাহাকে বাঁচাইবার আর কোন আশাই থাকিবে না। রাজকুমারের হাতের প্রায় সমস্ত অর্থই এই কয়দিনে ফুরাইয়া আসিয়াছে। সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে যাহারা সামান্য ফেরী করিয়া বেড়ায় তাহাদের এই সব ব্যয় সাপেক্ষ রোগের চিকিৎসা করিবার চেষ্টা করিতে যাওয়াই অন্যায়, তাহাতে কোন কূলই রক্ষা পায় না। না যায় শেষ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা, না যায় সংসারের অন্য সকলকে বাঁচাইয়া রাখা। ঋণের বোঝা মাথার উপর পর্ব্বতের ন্যায় বলিয়া মনে হয়।

কি করিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। যে হরেরামকে কোন সংবাদ দিবে না বলিয়াই মনে করিয়াছিল তাহারই কথা বার বার করিয়া মনে হইতেছে। তাহার অর্থ আছে, বাড়ীটাও তাহার ভাল—মিনতিকে বাঁচাইতে গেলে তাহার উপরই নির্ভর করিতে হয়। রাজকুমারের পৌরুষে আঘাত

লাগিল। মিনতিকে আশা করিতে নিষেধ করিয়া সে যাহাকে একদিন গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, তাহারই দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে? কিন্তু তাহার পর আর ত' তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখা যাইবে না, তাহার নিজের দাবীও আর তখন কিছুই রাখিলে চলিবে না। রাজকুমার মন স্থির করিতে না পারিয়া ঘরময় পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পাশের ঘরের বৃদ্ধা গৃহিণী মাঝে মাঝে আসিয়া মিনতিকে দেখিয়া যাইত। রাজকুমার আজ অনেকদিন পর ফেরী করার থলিয়াটা কাঁধের উপর ঝুলাইয়া লইল। এই দশ দিন ধরিয়া কিছুই তৈয়ারী করা হয় নাই। সুতরাং বেশী জিনিষ থলিয়াতে ছিলও না। যাহা ছিল তাহা লইয়াই বাহির হইয়া পড়িবার জন্য রাজকুমার প্রস্তুত হইল। অর্থ নাই, একদিনের জন্যও ডাক্তারের ভিজিট দিবার সামর্থ্য আর তাহার ছিল না। স্নেহ মমতা যতই থাকুক না কেন সামর্থ্য না থাকিলে দায়িত্ব লওয়া চলে না। স্নেহ অপেক্ষাও এ জগতে অর্থের মূল্য অনেক বেশী। পাশের ঘরের বৃদ্ধা গৃহিণীকে ডাকিয়া রাজকুমার বলিল, আমি বের হচ্ছি আজ, মাঝে মাঝে ওকে একটু দেখে যাবেন।

বৃদ্ধা সম্মতি জানাইয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল। রাজকুমার বাহির হইতে গিয়া কি একটু ভাবিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল। মিনতির শয্যা পার্শ্বে সে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মিনতি বোধ হয় তখন ঘুমাইতেছে। রাজকুমার মিনতির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহার উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিয়া মিনতি ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। সে চক্ষে পরম নির্ভরতার ভাব দেখিয়া রাজকুমারের চক্ষুও একটু ভিজিয়া উঠিল। সে হাত দিয়া মিনতির মাথার চুল গুলি ঠিক করিয়া দিতে দিতে বলিল, কেমন মনে হচ্ছে? একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, আজ বের হচ্ছি মিনু।

মিনতি কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া রাজকুমার পুনরায় বলিল, যাচ্ছি মিনু। তাহার মনের মধ্যে যে কথা আসিয়াছিল তাহা কিছুতেই সে প্রকাশ করিতে পারিল না। এই একান্ত নির্ভরশীলা তরুণীটিকে ছাড়িয়া যাওয়াও কষ্টকর অথচ তাহার নিকটে আর কয়েকদিন থাকিলে তাহাকে সে বাঁচাইতেও পারিবে না। রাজকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল, মিনতি তখনও স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া রাজকুমার বাহির হইয়া গেল।

অন্যমনস্কের মত সে পথ চলিতেছিল। কি এক চিন্তায় সে তখন আচ্ছন্ন, কি এক সমস্যার সমাধান যেন কিছুতেই সে করিতে পারিতেছে না। সুরভীর কথা একবার মনে হইল, তাহার নিকট হাত পাতিলে এখনই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। মিনতি সেখানে থাকিয়াই বাঁচিয়া যায। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। রাজকুমার পথ চলিতে লাগিল। হরেরামের গৃহের পাশ দিয়া সে চলিয়া গেল। বাড়ীটার দিকে একবার না চাহিয়া সে পারিল না। বেশ সুন্দর ঘরগুলি, আলো-বাতাস সেখানে প্রবেশ করিতে কোন বাধা পায় না। এ গৃহে মিনতিকে প্রবেশ করিতে সেই ত' বিশেষ করিয়া বাধা দিতেছে। রাজকুমার আসিয়াছে বলিয়াই হয়ত' মিনতি তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে না। যদি অকস্মাৎ একদিন ধূমকেতুর ন্যায় রাজকুমার এখানে না আসিয়া পড়িত তাহা হইলে বাছিয়া লইবার ত' মিনতির কিছুই থাকিত না। হরেরামের গৃহের সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া এতদিনে সে হয়ত' পাকা গৃহিণী হইয়া পড়িত। হরেরামের যথেষ্ট ক্ষতি সে করিয়াছে।

সে গৃহ অতিক্রম করিয়া রাজকুমার অনেকদূর আগাইয়া গেল। যে চিন্তা

গত কয়েকদিন হইতেই তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা এইবার তাহাকে আরও বেশী করিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার নিকটে থাকিলে মিনতির নিশ্চিত মৃত্যু। সে ত' জোর করিয়া হত্যা করিতেছে। তাহার শাস্তি হওয়া উচিত। এমন করিয়া নিজের জেদ বজায় রাখিবার জন্য কাহাকেও হত্যা করিবার অধিকার ত' তাহার নাই। মিনতি নিজেও হয়ত' জানিতে পারিলে তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবে না—স্বার্থ বজায় রাখিবার এত' ইচ্ছা তাহার কেন হইল? মুক্তিই ত' সে একদিন চাহিয়াছিল, মুক্তি পাওয়াও আজ বেশ সহজ হইয়া গিয়াছে। কেন সে বিদায় গ্রহণ করিতেছে না?

রাজকুমার পুনরায় ফিরিয়া চলিল। মুক্তিই সে গ্রহণ করিবে। ক্ষমতার বাহিরে যাহা তাহা লইয়া অযথা টানাটানি করিবে না।

হরেরামের গৃহের নিকট আসিয়া রাজকুমার থামিল, একবার ইতস্ততঃ করিয়া সহজ ভাবেই সে হরেরামকে ডাকিল।

হরেরাম বাহির হইয়াই বিস্মিত হইয়া গেল। জীবনে যে তাহার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শত্রুতা করিয়াছে সে-ই সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেই দাঁড়াইবার মধ্যে একটা বিনীত ভাবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে! সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

ম্লানভাবে রাজকুমার বলিল, মিনতি অসুস্থ।

কথাটা হরেরামের অজানা ছিল না। তাহার মুখের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, বেশ সহজ ভাবেই সে উত্তর করিল, তাতে আমার কি?

রাজকুমার সোজা তাহার চোখের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনি না তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

রাজকুমারের স্থির দৃষ্টি হরেরাম সহ্য করিতে না পারিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, সে পুরণো কথা!

রাজকুমার তেমনি গম্ভীর স্বরেই পুনরায় বলিল, সেই কথাই যদি আবার নূতন করে ওঠে?

হরেরাম কিছু বুঝিতে পারিল না, অভিভূতের ন্যায় রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজকুমার সহজ ভাবেই বলিল, আজ রাত আটটার পর মিনতির খোঁজ নেবেন। যদি তখনও আমি না ফিরে আসি ত' বুঝবেন যে আমি সমস্ত দাবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছি। তারপর মিনতির কথা সে নিজেই বলতে পারবে।

হরেরাম তখনও সেই ভাবে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহাকে তখনও সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

রাজকুমার চলিয়া যাইবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া শেষ বারের মত বলিল, মনে রাখবেন, রাত আটটার পর। আমি না এলে মিনতিকে বাঁচাবার ভার আপনার। আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া সে দ্রুত আগাইয়া গেল।

মাজন এবং চানাচুর লইয়া রাজকুমার পথে পথে ঘুরিতে লাগিল। অন্য-মনস্কের মতই সে এপথ ওপথ করিতেছিল। কখন যে দ্বিপ্রহর আসিয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই—আহারের কথাও তাহার মনে ছিল না। মাঝে মাঝে দুই চারিটা বাড়ী হইতে ছেলেমেয়েরা কলহাস্য তুলিয়া ছুটাছুটি করিয়া চানাচুর কিনিতে আসিতেছে। শিশুদের মুখের দিকে চাহিয়া সে কিছুটা তৃপ্তি পাইতেছিল—উহারা জগতের বাহিরের জীব। সেও যদি চিরকাল শিশু হইয়াই থাকিতে পারিত!

অন্যমনস্কের মত সে চলিতেছিল, ছোট একটা ছেলে আসিয়া চানাচুর

চাহিল। সে তাহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটা পূরিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিল—ছেলেটা হাতের মুঠা খুলিয়া তাহার হাতে কি একটা কাগজ দিয়াই চানাচুরের পূরিয়া ছিঁড়িয়া আহারে মন দিল। কাগজটার দিকে চাহিয়া রাজকুমার বিস্মিত হইয়া গেল—একটা দশটাকার নোট! অন্যমনস্ক রাজকুমার একবার নোটটার দিকে এবং আর একবার ছেলেটার মুখের দিকে চাহিল। কয়েক মূহূর্ত্ত সেই ভাবে কাটিয়া যাইবার পর সে যেন চেতনা ফিরিয়া পাইল, আগাইয়া গিয়া ছেলেটার হাত ধরিয়া বলিল, তোমার বাড়ীতে চল খোকা।

খোকা মনে করিল বোধ হয় পয়সা দেয় নাই বলিয়াই লোকটা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—সে ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই কান্না শুনিয়া দুই চারিজন লোক আশপাশের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাজকুমারের হাতে নোটটা দেখিয়া সকলেই মনে করিল যে এক পূরিয়া চানাচুর দিয়া সে ওই ছোট ছেলেটার হাত হইতে নোটটা কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় সে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং রাজকুমারকে চোর বলিয়া ধরিতে কোন বাধা রহিল না। প্রায় ঘটনাটা চোখে দেখিয়াছে এরূপ দুই একজন লোক'ও জুটিয়া গেল। যে দুই চারিজন সেই পথ দিয়া যাইতেছিল রাজকুমারকে চোর বলিয়া মনে করিতে তাহাদের এতটুকু দ্বিধাও হইল না। কে একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিল, ...দের গায়ে স্বদেশী চোর বুঝি!

আর একজন জোগান দিয়া বলিল, সেইত' সুবিধে—ধরা পড়লেই স্বদেশী।

সমাজের কল্যাণকামীরা রাজকুমারকে ধরিয়া থানায় লইয়া গেল। যে ছোট ছেলেটাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনাটা ঘটিয়া গেল তাহাকেও সঙ্গে লইতে

তাহারা ভুলিল না, বেশ মজা হইবে বুঝিয়া সেও পরম নিশ্চিন্তে চানাচুর খাইতে খাইতে তাহাদের সঙ্গে চলিল।

দারোগা সমস্ত লিখিয়া লইয়া রাজকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, চেহারাটা ত' ভদ্রলোকের মতই দেখছি, আবার খদ্দর পরাও হয়েছে! সাহেবদের কাছে এরাই দেশের সাধারণ সম্মানটা নষ্ট করে দিলে।

রাজকুমারের নিকট সমস্ত ব্যাপারটা জলের ন্যায় সহজ হইয়া গিয়াছিল—চোর বলিয়া তাহাকে চালান দেওয়া হইতেছে। যাহারা ঘটনাটা প্রায় দেখিয়াছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছিল তাহারাই ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া পরম উৎসাহ ভরে নিজেদের নাম এবং ঠিকানা লিখাইয়া দিল। রাজকুমার স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে তাহার মুক্তি নাই। এই কলিকাতা সহরেই এমন লোক আছে যাহার সাহায্যে সে আত্মরক্ষা করিতে পারে কিন্তু তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে তাহার এতটুকু ইচ্ছাও হইল না। এ একরকম ভালই হইল। মিনতি বাঁচিয়া যাইবে, হরেরামের ভরসায় তাহাকে ছাড়িয়া সে নিজেই দূরে চলিয়া যাইবার কথা মনে মনে স্থির করিয়াছিল। অক্ষমতার জন্য তাহার এই স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া যাইবার লজ্জা হইতেও সে বাঁচিয়া গেল।

দারোগা রজকুমারের থলিয়াটা উল্টাইয়া জিনিষগুলি সব টেবিলের উপর ঢালিয়া ফেলিল, কতকগুলি দাঁতের মাজন এবং চানাচুরের পুরিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সেগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে সে বলিল, এই সব খাইয়েই না ছোট ছেলেদের লোভ বাড়িয়ে দেশের রোগ এরা বাড়ায়, এর জন্যেই এদের শাস্তি হওয়া উচিত। যত সব বাসি জিনিষ! একটা পুরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তিনি নিতান্তই তাচ্ছিল্য ভরে কিছুটা মুখে দিয়া চিবাইতে লাগিল এবং চিবাইতে চিবাইতেই মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, ঠিক তাই, বিশ্রী গন্ধ—যত সব পচা তেলে ভাজা! নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও

মুখের জিনিষগুলি গিলিয়া ফেলিয়া সে পুরিয়ার অবশিষ্ট গুলি মুখে ঢালিয়া দিল।

ছোট দারোগা নিকটে আসিয়া রাজকুমারের দিকে বিদ্রূপভরে একটু হাসিয়া টেবিলের উপর হইতে গোটা দুই দাঁতের মাজন এবং একটা চানাচুরের পুরিয়া তুলিয়া লইয়া নিজের টেবিলের দিকে চলিয়া গেল। নিজের পকেটে একবার হাত দিয়া যাহারা রাজকুমারকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছিল তাহা-দের দিকে নিতান্ত হতাশ ভাবে চাহিয়া দারোগা বলিল, সিগারেট আনতে ভুলে গেছি, আছে আপনাদের কারও কাছে? মুখটা একেবারে বিশ্রী হয়ে গেল। সে টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া কয়েকটা দাঁতের মাজন এবং চানাচুরের পুরিয়া তাহাতে রাখিয়া ড্রয়ার বন্ধ করিল।

একজন একটা সিগারেটের প্যাকেট এবং একটা দিয়াশেলাই বাহির' করিয়া দিল। দারোগা প্যাকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল এবং প্যাকেটটা হাতে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

রাজকুমার সেইখানে তখনও দাঁড়াইয়াছিল, এত' দুঃখেও তাহার হাসি পাইতেছিল।

দারোগা অকস্মাৎ সচেতন হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, দরওয়াজা।

দরওয়াজা অর্থাৎ তখনকার পাহারাদার সিপাহী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। দারোগা রাজকুমারকে দেখাইয়া বলিল, ফাটক।

দরওয়াজা রাজকুমারকে ধরিয়া লইয়া গেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা তালা খোলার এবং হুড়কা টানার শব্দ হইল। মুহূর্ত্ত পরেই আবার হুড়কা বন্ধ হইয়া গেল। দারোগা আপন মনেই বলিল, বার বার জেলে গেলেও এদের কোন শিক্ষাই হয় না। আমার হাতে গভর্ণমেণ্টের সব ক্ষমতা থাকলে দেখিয়ে দিতুম—একদিনেই এরা সোজা হয়ে যেত।

দারোগা এইবার বাহিরে যাইবার জন্য উঠিল, হাতের সিগারেটের প্যাকেটটা প্যান্টের পকেটে ভরিয়া লইল এবং টেবিলের উপর হইতে দিয়া-শেলাইটাও তুলিয়া লইল। তারপর কি একটু ভাবিয়া সমাজের কল্যাণকারীদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনারা আজ আসুন, সাক্ষ্য দেবার জন্যে মাঝে মাঝে আপনাদের কোর্টে যেতে হবে, ঠিক সময়ে সমন পাবেন। টুপীটা মাথায় দিয়া দারোগা বাহির হইয়া গেল।

সিগারেটের প্যাকেটটা যে দারোগার হাতে দিয়াছিল সে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল মাত্র, ফিরাইয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইতে পারিল না। একটা মাত্র সিগারেট সে খরচ করিয়াছিল, ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সেও সকলের সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইল। দারোগা নিশ্চয়ই মনের ভুলে প্যাকেটটা দিয়াশেলাই সমেত পকেটে ভরিয়া ফেলিয়াছে !

* * * *

৯

পুনরায় সেই জেলের বড় হাজতে ফিরিয়া আসিয়াছে রাজকুমার। এইবার আর স্বদেশী বাবু বলিয়া কেহ তাহাকে সম্মান দেখাইবে না। সেও তাহাদেরই মত সাধারণ চোর রূপেই ধরা পড়িয়াছে। পুরাতন চোর ডাকাত হইতে আরম্ভ করিয়া যাহারা জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে দাঙ্গা করিয়া ধরা পড়িয়াছে তাহারা সকলেই এক হাজতে থাকিয়া বিচারের জন্য অপেক্ষা করে এবং বিচার শেষে একই স্থানে থাকিয়া মেয়াদ ভোগ করে। গত বারে আসিয়া এক রাত্রের জন্য রাজকুমার এই সব সাধারণ কয়েদীদের দুরবস্থা দেখিয়া গিয়াছিল, এইবার তাহাকেই সেই দুরবস্থায় পড়িতে হইবে। অপরাধ সে কিছু করে নাই কিন্তু শাস্তি ভোগ তাহাকে করিতেই হইবে। তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া এতক্ষণে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

সে তাহার জীবনের কথা ভাবিতে লাগিল। কি ভাবে তাহা আরম্ভ হইয়াছিল, ভবিষ্যতে কত না কি হইতে পারিত, কিন্তু অ৲ ৭াৎ মোড় ফিরিয়া এ কোন্ দিকে তাহার গতি হইল! ইহার শেষই বা কোথায়? আজ বার বার পরাণ-দেবু-সোমেশ্বরের কথা তাহার মনে হইতেছিল—ইহাদের সঙ্গে, ইহাদের পুরোভাগে থাকিয়াই ত' বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পথ কাটিয়া তাহার চলিবার কথা। সতীর আদর্শ সে, সুরভীর সরল দিকটার শ্রদ্ধার পাত্র সে—মিনতি ত' তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াই ছিল। সেই চরিত্রে

আজ এ কলঙ্ক লেপন কেন? মনোতোষ জানিতে পারিলে খুসী হইবে, যদু ঘোষাল বাঁচিয়া যাইবে—তাহার সেই চোর অপবাদ ত' মিথ্যা হইল না। মিনতির সেই পরম নির্ভরশীল চক্ষু দুইটার কথা তাহার কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, সে কি হরেরামের সহিত যাইবে না? রাজকুমার চায় সে বাঁচিয়া উঠুক, হরেরামের নিকট ধরা দিয়াই সে এই স্বার্থপর জগতকে চিনিয়া লউক। এ জগত দানের পরিবর্তে প্রতিদান চায়।

হাজতের প্রথম রাত্রেই অনেকে তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। এমন রূপবান চোর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই। এ কাজে লাগিয়া থাকিলে ইহার উন্নতি লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে—একদিন চোরের রাজা বলিয়াও পরিচিত হইয়া যাইতে পারে। হাজতের দরজা দিয়া সে যখন ভিতরে প্রবেশ করিতে-ছিল তখন তাহাকে দেখিয়া অনেকের মুখ দিয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছিল, বাঃ, কি সুন্দর, একেবারে রাজপুত্তুর!

পকেটমার বিষ্টু জিজ্ঞাসা করিল, মাল প্রুফ নাকি ভায়া?

রতন সর্দ্দার বলিল, থাম্ পকেটকাটা, পাঁচবার জেলে এসেও সেই পকেট কাটাই থেকে গেছিস্, কত আর বুদ্ধি হবে! দেখছিস্ না নূতন মাল, ওসব শিখবে কোথায়? সে রাজকুমারের দিকে চাহিয়া বলিল, বামাল ধরা পড়েছ নাকি হে?

রাজকুমার কোন কথা বলিল না, কিন্তু এইভাবে যে বেশীক্ষণ থাকা যাইবে না তাহাও সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল।

রাজকুমারকে একটা ধাক্কা দিয়া হোসেন বলিল, কি বাবা বোবা নাকি?

মাধো সিং তাহার পিঠে এক চাপড় মারিয়া বলিল, নেশাই হয়নি, বোল ফুটবে কোথা থেকে। বাঁ দিকের পকেট হইতে বিঁড়ি দিয়াশালাই বাহির করিয়া বলিল, চলবে নাকি হে?

আর চুপ করিয়া থাকা সম্ভব নহে দেখিয়া রাজকুমার বলিল, ও সব আমি খাইনা ভাই।

বিষ্টু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্যের ভঙ্গিতে চিবুকে আঙ্গুল রাখিয়া এক পাক ঘুরিয়াই বসিয়া পড়িয়া বলিল, একেবারে ধম্ম-পুত্তুর!

জাফর বলিল, হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে—এই পাঠশালায় যখন একবার এসেছ বাপধন তখন ধম্ম পুত্তুর একেবারে দুঃশাসনটি হয়ে বের হবে, এই ত' সবে সন্ধ্যে।

উপস্থিত সকলেই পরম খুসী ভরে হাসিয়া উঠিল।

সকলকে থামাইয়া রতন সর্দ্দার বলিল, বেশী চালাকী করো না বাপু, চুরি করেছ চোরের মত থাক, নেশাভাঙ্গ কর। ধম্ম কথা বললে মজা টের পাবে। রতনের বিরাট দেহের মাংস পেশীগুলি আপনা হইতেই ফুলিয়া উঠিল।

ঢং ঢং করিয়া জেলের ঘড়িতে নয়টা বাজিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহারা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নূতন পাহারা আসিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, সব চুপ কর—এই চুপ। দেখিতে দেখিতে চারিদিক স্তব্ধ হইয়া গেল। পাহারা পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল, দো নম্বর উপর, এই দো নম্বর উপর।

কয়েদীদের মধ্যে যাহারা মেট এবং পাহারা তাহাদেরও বিভিন্ন ওয়ার্ডে পালা করিয়া রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিতে হয় এবং সিপাহীদের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়। তাহাদেরই একজন জবাব দিল, ছিয়াত্তর জমা, ঠিক হ্যায় হুজুর।

চারিদিকেই কিছুক্ষণের জন্য সিপাহীদের চীৎকার এবং মেট পাহারাদের

উত্তর শোনা গেল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই ভাবে সিপাহীদের আহ্বানে মেট-পাহারাদের সাড়া দিতে হয়।

রাজকুমার শুইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

রতন সর্দ্দার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, আমার পাশে জায়গা করে নাও।

রাজকুমার তাহার মুখের দিকে সোজা চাহিয়া বলিল, আমার ব্যবস্থা আমিই করতে পারব।

এইরূপ কথা রতন কোনদিন শোনে নাই। মাথা ঝাঁকাইয়া একটা গর্জ্জন করিয়া সে ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিল। ঘরের সকলেই শঙ্কিত হইয়া উঠিল, সিপাহীটা দৌড়াইয়া আসিয়া একটা ধমক দিতে গিয়া রতন সর্দ্দারকে দেখিয়া থামিয়া গেল। জাফর বিঁড়িতে একটা লম্বা টান দিয়া বলিল, আজকের রাতটা যেতে দাও সর্দ্দার।

তখনকার মত রতন আর কিছু বলিল না, মনে মনে কি একটা মতলব আঁটিয়া তাহার পাশে শায়িত লোকটাকে একটু ঠেলিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল। তাহার মুখের পৈশাচিক ভাবটা ঘরের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

জাফর বিঁড়িটায় আর একটা টান দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, আজ রাতেই শেষ।

কতক্ষণ পরে রাজকুমার তাহা জানে না অকস্মাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কে যেন তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়াছে। ভয়ে সে চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী লোকটা এক হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। এতটুকু নড়িবার ক্ষমতাও তাহার নাই—সমস্ত শরীর এক পশুর নিষ্পেষণে গুঁড়া হইয়া যাইবে যেন!

*

*　　　　*

প্রায় দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে, এখনও রাজকুমারের বিচার আরম্ভই হয় নাই। রাজকুমার মাঝে মাঝে হাত কড়া ও দড়িতে শোভিত হইয়া বিচারালয়ে যায় এবং নূতন তারিখ লইয়া ফিরিয়া আসে। ছয়মাস, এমন কি নয়মাস ধরিয়া বিচারালয়ে গিয়া কেবলমাত্র তারিখ লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে এরূপ লোকেরও অভাব নাই। বিচারে হয়ত' তাহাদের তিন মাসের বেশী কারা দণ্ড হইবে না কিন্তু হাজতী রূপে বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটিয়া যাইবে আট নয় মাস। গোবর্দ্ধন একজন চাষী, জমি লইয়া দাঙ্গা হওয়ায় লাঠি দিয়া তিন চারিজনের মাথা সে ফাটাইয়া দিয়াছে—সে আজ সাত আট মাসের কথা। দরিদ্র বলিয়া উকিল মোক্তার না দিতে পারায় সে জামিনে মুক্তি পায় নাই। বার বার বিচারালয়ে গিয়া তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। একবস্ত্রে সে জেলে আসিয়া ঢুকিয়াছে, সেটা কালো হইয়া প্রায় ছিড়িয়া আসিয়াছে—তাহাই কোনমতে জড়াইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে। মাথার চুল বেণী বাঁধিবার উপযোগী হইয়া উঠিল, একটি দিনের জন্যও তাহাতে তেল দিতে পারে নাই। প্রথম প্রথম সে খুব বিরক্তি প্রকাশ করিত, এখন সব সহ্য হইয়া গিয়াছে। আপন মনেই সে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সেদিন সন্ধ্যায় হাজতের ঘরে উৎসব বসিয়াছে। অনেকদিন পর আজ পঞ্চু আসিয়াছে। রতন সর্দ্দারের হাতেই তাহার প্রথম শিক্ষা। আজ বিচারালয় হইতে সে চালান আসিয়াছে। সর্দ্দার দায়রায় বিচারের তারিখ পড়িবার অপেক্ষায় আছে পঞ্চু তাহা জানিত। অনেকদিন পর তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, মনের মধ্যে এই আশা তাহার ছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তালা খুলিয়া তাহাদের ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া জমাদার পুনরায় তালা বন্ধ

করিয়া চলিয়া গেল। পঞ্চু দূর হইতে সর্দ্দারকে দেখিতে পাইয়াই নিকটে আসিয়া নত হইয়া সম্মান জানাইল, সর্দ্দার মৃদু হাসিয়া হাত তুলিয়া বোধ করি আশীর্ব্বাদ করিল।

পঞ্চুকে ঘিরিয়াই আসর জমিয়া উঠিল। রাজকুমারকে সর্দ্দার নিজের পাশে বসাইয়া রাখিয়াছিল। পঞ্চু তাহার দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়া সর্দ্দারকে বলিল, নূতন নাকি ?

সর্দ্দার হাসিয়া বলিল, একেবারে কাঁচা।

রাজকুমারের সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া পঞ্চু পুনরায় মুখ টিপিয়া হাসিল, তারপর একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া থুথু ফেলিয়া বলিল, রতন সর্দ্দারের হাতে কাঁচা মালই পাকে ভাল। আমি নিজেই বা কি ছিলুম ?

রতন সর্দ্দার জোরে জোরে হাসিয়া পঞ্চুর পিঠ ঠুকিয়া দিল।

একটু থামিয়া পঞ্চু পুনরায় বলিল, আজও আমি ঠিক তৈরী হয়ে উঠতে পারিনি সর্দ্দার—যেটুকু দোষ আছে এবারে তা দূর করে দাও।

রতন পা দুইটা প্রসারিত করিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এবার অপরাধটা কি ?

পঞ্চু উত্তর করিল, সেই চুরি।

রতন মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, এখনও চুরি! রতন সর্দ্দারের শিষ্য একবার মাত্র চুরি করে—তারপর সে ডাকাত হয়।

পঞ্চু হাসিয়াই বলিল, সর্দ্দার মরা বাঁচাতেও পারে। ছিলুম মরা চাষী, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ কর আর বৌ ছেলে নিয়ে আধ পেটা খাও। জমির মামলায় এলুম জেলে, ছ'মাস হাজতী আর একুশ দিন মেয়াদী। সর্দ্দারের দয়া হল, চুরির কায়দা শিখে গেলুম এখান থেকেই—সর্দ্দারের বিঁড়ি আর তামাক পাতা যেদিন থেকে চুরি করতে পারলুম সেদিন থেকে বুঝলুম

যে হাত পেকেছে। গরীব চাষীর অভাব কিছুটা মিটেওছে—দিনে চাষ করি আর রাতে করি চুরি। সংসার মন্দ চলছে না, মাঝে মাঝে জেলের জন্যে ভাবি না, বড় ছেলেটার দশ বছর হয়েছে—কায়দা কিছু তাকেও শিখিয়েছি। দিব্যি আছি।

গোবর্দ্ধন নিকটে বসিয়াছিল, হি হি করিয়া হাসিয়া সে বলিল, আমিও চোর হব, শুধু চাষ করে মজা নেই। বলিতে বলিতেই সে সর্দ্দারের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, শিখিয়ে দাও সর্দ্দার, আমিও বড় গরীব—দুটো প্যাঁচ শিখিয়ে দাও, পেট ভরে খেয়ে বাঁচি। গোবর্দ্ধন সর্দ্দারের পা দুইটা বেশ জোরেই চাপিয়া ধরিল।

রতন সর্দ্দার তাহাকে পা দিয়াই দূরে ঠেলিয়া দিয়া বিরক্তি ভরে বলিল, যা ব্যাটা পাগলা।

গোবর্দ্ধন উঠিয়া বসিল, চক্ষু মুছিয়া বলিল, পাগল কি আর সখ করে লোকে হয়। আট ন' মাস কেটে গেছে, চাষ করতে পারিনি—একটি মাত্র ছোট ছেলে আর কচি বউ, ছ'মাস কোন খবরও পাইনি, সব মরেছে সর্দ্দার, কেউ বেঁচে নেই।

রতন সর্দ্দার পুরুষের কান্না সহ্য করিতে পারে না, গোবর্দ্ধনের দিকে সে রক্তবর্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিল। সে দৃষ্টি সহ্য করিবার মত শক্তি গোবর্দ্ধনের ছিল না, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া রতন পঞ্চুর দিকে ফিরিয়া চাহিল।

পঞ্চু সেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল, সবই হয়েছে সর্দ্দার কিন্তু মনটা এখনও কঠিন হয়ে ওঠেনি, তাই ত' এখনও চুরি নিয়েই আছি। এবারে কি আর ধরা পড়ি? ওই মনের দুর্ব্বলতাই হল কাল। এবার কঠিন হবার শিক্ষাটা দিয়ে দাও।

রতন বলিল, বউ ছেলেকে পিটে ওটা অভ্যাস করতে হয়।

পঞ্চু ম্লান চক্ষে বলিল, তাদের ভালবাসি যে গো সর্দ্দার।

রতন হা, হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, ইহা অপেক্ষা পরিহাসের ব্যাপার আর যেন কিছু হইতে পারে না। রতন সর্দ্দারও গড়াইয়া পড়িল। অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া সে বলিল, ওই ভালবাসাটা ছাড়, আছে খেতে দাও, যায় যেতে দাও।

ইহা না হইলে কি আর এমন নামকরা সর্দ্দার কেহ হইতে পারে! ভালবাসিতে গেলে যে রতনের সর্দ্দারিই থাকিত না। এত' দুঃখেও রাজকুমারের হাসি পাইল, কিন্তু সে হাসি সে মনের মধ্যেই চাপিয়া ফেলিল, মুখটা একটু বিকৃত হইল মাত্র।

পঞ্চু বলিল, এবার থেকে তাই চেষ্টা করব। একটু থামিয়া পুনরায় বলিল, ওই স্নেহ মমতা ভালবাসাই যে কাল তা বেশ বুঝেছি। এবারে ধরাও ত' পড়ে গেলুম সেই জন্যে। চুরি করে ফিরছিলুম, একটা স্কুলের ছোট ছেলে মাত্র উঠেছিল ঘুম থেকে। বাড়ীর উঠানে কয়েকটা কাঠ পড়ে ছিল, তারই একটা তুলে তাকে ভয় দেখাতেই সে হাত জোড় করে মিনতি করল। দয়া হল, কাঠটা ফেলে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম—সেই ছোট ছেলেটাই তখন একটা কাঠ নিয়ে আমার পেছনে পেছনে চীৎকার করতে করতে তাড়া করলে, আশে পাশের বাড়ী থেকে লোক বেরিয়ে পড়ল, ব্যাস্। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া সে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, ওই দয়াই কাল হল সর্দ্দার। এক ঘা বসিয়ে দিলেই ছোঁড়াটা লেখাপড়ার কষ্ট থেকে চিরকালের মত বেঁচে যেত' আর আমারও এই বছর খানেকের দুর্ভোগ ভুগতে হত না।

রতন মাথা নাড়িয়া বলিল, এমনি করেই শিক্ষা হবে।

পঞ্চু মাথা নামাইয়া বলিল, তাই যেন হয়।

একধারে এক খুনী আসামী আপাদ মস্তক কম্বলে ঢাকিয়া শুইয়াছিল। আর চারদিন পরে তাহার দায়রায় মামলার তারিখ পড়িয়াছে। অকস্মাৎ কম্বল ফেলিয়া দিয়া লাফ দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, চুপ, চুপ কর সব—একটা পয়েণ্ট মনে পড়েছে, ঠিক হবে। ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়া বার বার সে বাঁ হাতের করতলে আঘাত করিয়া দ্রুত বেগে পায়চারী করিতে লাগিল।

রতন লোকটার মুখের দিকে চাহিয়া পরিহাস করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, একটা খুন করেই পাগল? তারপর নিজের কম্বলের ভিতর হইতে একটা বড় বোতল বাহির করিয়া পঞ্চুর দিকে চাহিয়া বলিল, আজই এটা আনিয়েছি অনেকদিন পর এসেছ সবটাই খরচ করব।

পঞ্চুর এবং উপস্থিত আরও অনেকের চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বাটীতে কিছুটা জল ঢালিয়া সর্দ্দারের দিকে তাহা বাড়াইয়া দিল। সর্দ্দার তাহাদের রাজা, প্রত্যেকের ভিক্ষা পাত্রে কিছু না কিছু দান করিবেই।

সর্দ্দার প্রত্যেকের পাত্রেই একটু একটু ঢালিয়া দিল। অর্দ্ধেক বোতল খালি হইয়া গেল। অবশিষ্ট অংশের দিকে চাহিয়া সর্দ্দার খুসী হইয়া বলিল, এটুকু আমার।

রাজকুমার তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশেষ করিয়া এই সবের লোভেই ইহারা পুরাতন চোর ডাকাতের নিকট আত্মবিক্রয় করে। নেশাই সকলের আত্মসম্মান নষ্ট করিয়াছে। তামাক খাইতে অভ্যস্থ গ্রামের চাষী পর্য্যন্ত যখন এখানে আসিয়া নেশার জন্য ছট্‌ ফট্‌ করিয়া মরে তখন ইহারাই তাহাদের নেশা মিটাইয়া ক্রয় করিয়া লয়। জেলের কয়েদীরা বিঁড়ি সিগা-

রেট পর্য্যন্ত পায় না বলিয়াই নূতন এবং কাঁচা কয়েদীরা পুরাতনদের পদলেহী হইয়া পড়ে। এই পদলেহনের জন্য সম্পূর্ণ বিঁড়িটাও তাহারা পায় না, দুই টানই যথেষ্ট। প্রত্যককে বিঁড়ি তামাক আনিতে দিলে হয়ত' অনেক অনাচার কমিয়া যাইত, গোপনে যাহারা আনিতে পারে তাহারাই রাজা হইয়া বসিতে পারিত না।

সেই খুনী আসামীটা তখনও পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছিল, ডান হাতের তর্জ্জনী দিয়া তখনও সে বার বার বাঁ হাতের করতলে আঘাত করিতেছিল, অকস্মাৎ ছুটিয়া গিয়া সে জানালার গরাদে ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, উকিল বাবু।

সকলেই চমকিয়া তাহার দিকে চাহিল, কি মনে করিয়া রতন সর্দ্দার তাহাকে টানিয়া লইয়া আসিয়া নিকটে বসাইয়া বলিল, থাম্, ভয় কি?

গলায় হাত দিয়া কি যেন টানিবার চেষ্টা করিয়া লোকটা ভীত স্বরে বলিল, ফাঁসী।

তাহাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া রতন বলিল, তার এখনও দেরি আছে। কথা শেষ করিয়া সে মদের বোতলটা তাহার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

গন্ধটা নাকে যাইতেই তাহার মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল শক্ত করিয়া মুখ চাপিয়া রাখিয়া সে ধীরে ধীরে হাঁ করিল এবং সেই অবসরে রতন কিছুটা তাহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল।

খানিকটা নির্জ্জলা মদ পেটে গিয়া পড়িতেই লোকটার সমস্ত শরীর বার কয়েক কাঁপিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ অভিভূতের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, দেরি আছে—এখনও অনেক দেরি। সে টলিতে টলিতে উঠিয়া গেল।

বোতলে তখনও যথেষ্ট ছিল। সেই দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া রতন সর্দ্দার এইবার ফিরিয়া চাহিল রাজকুমারের দিকে। সেই দৃষ্টি দেখিয়া রাজকুমারের বুকের রক্ত একেবারে হিম হইয়া গেল, দূরে পলাইয়া যাইবার মত শক্তিও তাহার রহিল না, স্থির দৃষ্টিতে সে রতনের চক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল। সর্দ্দারও ক্ষণকাল সেই ভাবে চাহিয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া বোতলটা তাহার মুখের নিকট লইয়া গিয়া চক্ষু দিয়া ইঙ্গিত করিল। রাজকুমার সেই খানেই তেমনি স্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিয়াই কেবলমাত্র মাথা নাড়াইয়া অসম্মতি জানাইল। রতন সর্দ্দারের মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল, বোতলটা বাড়াইয়া সে রাজকুমারের ঠোঁটে স্পর্শ করাইল। রাজকুমার যেন এতক্ষণে চেতনা ফিরিয়া পাইল, সে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, সর্দ্দার ততক্ষণে তাহার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়াছে।

রতনের মুখের কাছে হাত লইয়া পঞ্চু বলিল, আর একটু দাওনা সর্দ্দার।

রতন তাহার বাটীতে সামান্য একটু ঢালিয়া দিল, পঞ্চু তাহাই চাটিয়া চাটিয়া খাইয়া ফেলিল, নেশা বোধ হয় তখনও তাহার ঠিক মত জমিয়া ওঠে নাই। সে তৃষ্ণার্ত্ত ভাবে বোতলটার দিকেই চাহিয়া রহিল।

রাজকুমারকে নিজের দেহের অতি নিকটে টানিয়া আনিয়া রতন বলিল, চোখ বুঁজে সোনার চাঁদের মত একটু খেয়ে ফেল ত' দেখি।

রাজকুমার প্রাণপণ বলে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিয়া বলিল, আমার সবই ত' খেয়েছ—ভবিষ্যৎটাকে নষ্ট করো না সর্দ্দার।

ঘরের সমস্ত লোক তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহাদের চক্ষের দৃষ্টিতে মহা ঔৎসুক্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রতন সর্দ্দারের ন্যায় লোক

না থাকিলে কি আর এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষ গড়িয়া ওঠে! এই দুই মাস ধরিয়া ওই সুন্দর ছেলেটাকে লইয়া কি না করিতেছে সে।

পঞ্চু হাত মুখ নাড়িয়া একটু টানিয়া টানিয়া বলিল, যেতে দাও সর্দ্দার ছোঁড়াটা বড়ই হাঁদা। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। তারপর পুনরায় বাটীটা বাড়াইয়া বলিল, ওরটা আমাকে দিয়ে দাও।

রতন তীব্র দৃষ্টিতে পঞ্চুর মুখের দিকে চাহিল, সে ভয়ে একটু পশ্চাতে সরিয়া বসিল।

রাজকুমার বুঝিয়াছিল যে ঘরের কেহ তাহাকে সাহায্য করিবে না, বরং উৎসাহ দিয়া রতনকে আরও উত্তেজিত করিয়া তুলিবে। সিপাহীও জানালার পাশে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল, কি কিনিয়া আনিবার জন্য কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই সে রতনের নিকট হইতে পয়সা লইয়াছে। রাজকুমারের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, দেহের কোন অঙ্গ নাড়াইবার শক্তি তাহার ছিল না। শেষবারের মত সে মিনতি করিয়া বলিল, তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকব সর্দ্দার, আমাকে মাপ কর।

রতন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, রতন সর্দ্দার কাকেও দয়া করে না, মেয়েদেরও না। বাঁ হাত দিয়া সে শক্ত করিয়া রাজকুমারকে জড়াইয়া ধরিয়া একেবারে বুকের উপর আনিয়া ফেলিল এবং ডান হাত দিয়া জোর করিয়া বোতলের মুখটা রাজকুমারের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অনেকখানি ঢালিয়া দিল। রাজকুমারের গলা এবং পেটে জ্বালা ধরিয়া গেল, মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল, সমস্ত দেহটা বার কয়েক মোচড় খাইয়া উঠিয়াই একেবারে স্তব্ধ হইয়া পড়িল। রাজকুমারের ছোট্ট দেহটা রতনের বিশাল হাতের মধ্যে লতাইয়া রহিল। সেই দিকে একবার চাহিয়া বিকৃত হাসি হাসিয়া রতন সর্দ্দার বোতলটা নিজের মুখের মধ্যে উপুড় করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে পড়িয়া থাকিয়া রাজকুমার ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, তাহার চক্ষু দুইটা তখন ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছিল—দৃষ্টি একেবারেই ছিলনা। বসিয়া বসিয়া সে দুলিতে লাগিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে সে একেবারে কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। মেঝের মধ্যে পড়িয়া সে গড়াগড়ি করিতে লাগিল। ভিতরটা তখন তাহার জ্বলিয়া যাইতেছিল। পেটের ভিতরের সমস্ত কিছু ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, কিছুটা শান্ত হইয়া রাজকুমার সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

অত্যন্ত মজা অনুভব করিয়া ঘরের মধ্যকার প্রাণী গুলি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল, হাসিতে হাসিতে তাহাদের চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। এ উহার গায়ে লুটাইয়া পড়িয়া মাটীতে গড়াইয়া পড়িল, তখনও তাহাদের হাসি থামে নাই, সকলেই ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

খুনেটা চীৎকার করিয়া উঠিল, এই, এইও চুপ, উকিল বাবু—নূতন পয়েণ্ট। তারপর গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, উঃ ব্যথা হয়ে গেছে বাবা, এখনও দেরি আছে ত'—ঢের দেরি। কথাগুলি তাহার জড়াইয়া জড়াইয়া গেল, টলিতে টলিতে সে একজনের গায়ের উপর পড়িয়া গেল।

সকলে পুনরায় হাসিয়া উঠিল, লোকটা যাহার গায়ের উপর পড়িয়া গিয়াছিল সে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, ব্যাটা ছুটাকে মাতাল।

খুনে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, এইও। সেই খানেই সে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার নাক ডাকিতে লাগিল।

রতন সর্দার পরিহাস তরল কণ্ঠে বলিল, চিড়িয়াখানা! রোজই এক বোতল করে আনতে হবে দেখ্‌ছি।

*

*　　　　*

আরও প্রায় একমাস কাটিয়া গিয়াছে। বাহিরের কোন্ এক স্বনাম ধন্য পুরুষ আজ জেল পরিদর্শনে আসিবেন। আসামী ও কয়েদী মহলে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া সারি বাঁধিয়া সকলে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রতন সর্দ্দারের পাশেই রাজকুমার। জেলার পর্য্যন্ত রতনের হাত-ধরা। রাজকুমার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ওই লোকটার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই—আর প্রতিবাদ করিবার মত প্রবৃত্তিও বোধ হয় তাহার নাই। অতীতকে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইবার চেষ্টাই এখন তাহার জীবনের একমাত্র ধ্যান। অতীত কি মুছিয়া যাইবে না?

পরিদর্শক আসিয়া পড়িলেন—হ্যাট কোট পরিহিত লোকটা একবার চোখে পড়িয়াছিল, কিন্তু রাজকুমারের কোন আগ্রহ নাই। দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় বলিয়াই সে দাঁড়াইয়া আছে। সব কিছুই এখন তাহার কাছে ছায়াবাজী বলিয়া মনে হয়। প্রচণ্ড শক্তিমান কুমারদার মৃত্যু হইয়াছে, কলের পুতুল বনিয়া গিয়াছে সে—রতন সর্দ্দার কলটি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে বোধ হয়!

পরিদর্শক একেবারে সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর ঘাড়টা একটু দুলাইয়া ইংরাজী করিয়া বলিলেন, বাঃ, উপযুক্ত জায়গাতেই এসেছ দেখছি।

রাজকুমার সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখিল, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যেন! পরিদর্শকের মুখের দিকে চাহিয়া সেও চমকিয়া গেল। মনোতোষ রায়—কলিকাতার মেয়র!

রাজকুমারকে চাহিতে দেখিয়া মনোতোষের ঠোঁটের উপর একটা বিদ্রূপের

হাসি ভাসিয়া উঠিল, ঘাড়টা পুনরায় একবার দুলাইয়া রাজকুমারের হাতের টিকেটটা দেখিয়া সে বলিল, চুরি! ঠিকই ভেবেছিলুম।

সকলেই বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। এত বড় সম্মানিত লোকটা রাজকুমারকে চেনে নাকি? চিনিলে ত' ভালই হয়—দুই চারিটা উপকার করাইয়া লওয়া কি তবে সম্ভব নয়? রতন সর্দ্দার ইঙ্গিতে রাজকুমারকে সেলাম জানাইতে বলিল।

রাজকুমারের হাতটা সম্পূর্ণ উঠিল না। অকস্মাৎ তাহার ভিতরকার মানুষটা বোধ হয় একবার নাড়া খাইয়া জাগিয়া উঠিল। কোন প্রকারে কি আর মানুষটাকে বাঁচাইয়া তোলা যায় না? কান্নায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, আমাকে বাঁচান মনোতোষ বাবু।

মনোতোষের ঠোঁটের উপর দিয়া অবজ্ঞার হাসি খেলিয়া গেল—সমস্ত মুখে একটা ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইতেছে। এই প্রকার একটি অতি সাধারণ মানুষের সহিত এতক্ষণ কথা বলাও যে তাহার পক্ষে নিন্দনীয়! অগ্রসর হইবার জন্য মনোতোষ পা বাড়াইয়া দিল, যাইবার সময় শুধু বলিয়া গেল, চুরি করেছ শাস্তি হবে বই কি!

জেলারও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল। একটা সাধারণ কয়েদীর সহিত মেয়র পরিচিত হইলেন কি করিয়া! চলিতে চলিতে সে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, লোকটাকে চেনেন নাকি?

এইরূপ একটি নগণ্য লোকের সহিত কলিকাতার প্রধান নাগরিকের পরিচয় থাকা নিশ্চয়ই শোভন নয়। মনোতোষ তাহা বুঝিয়াছিল। জেলারের প্রশ্নের উত্তরে সে তাই কতকটা অন্যমনস্কের মতই বলিল, হ্যাঁ, লোকটা আমার বাড়ীতে একবার কাজের চেষ্টায় এসেছিল।—

পশ্চাতে ফিরিয়া একবার রাজকুমারকে দেখিয়া লইয়া জেলার বলিল, ভাগ্যিস কাজে লাগাননি—চোরদের স্বভাব ত' জানি, মিসেসের সব কিছুই চুরি করে লোকটা একদিন নিশ্চয়ই সরে পড়ত'। ভগবানকে ধন্যবাদ!

সব কয়টা কথাই রাজকুমারের কানে আসিয়া পৌঁছিল। ঠিকই বটে, চোরের স্বভাব ত' আর জৈলারের অজানা নহে!

পরিদর্শক চলিয়া গেলে কয়েদী-আসামীরা মুক্তি পাইল। রাজকুমারেরা নিজ নিজ স্থানে আসিয়া বসিল। কিন্তু আজ আর রাজকুমার চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। যে অতীতকে সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল সেই অতীতকেই মনোতোষ জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। যত রাজ্যের ভাবনা আসিয়া তাহাকে বর্তমান হইতে ছিনাইয়া লইয়া অতীতের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। মিসেসের সব কিছুই কি চুরি যাইত!

রাজকুমার উঠিয়া গিয়া জানালার একটা গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। গ্রামের বধূরা এতক্ষণে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া দিয়াছে। তাহার মনেও ত' সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে—সেখানে দীপ জ্বালাইবার জন্য কি কেহ কোথাও অপেক্ষা করিয়া নাই?

আকাশে বড় উজ্জ্বল হইয়া চাঁদ দেখা দিল। এই উজ্জ্বল চাঁদকে একদিন রাজকুমার কত না ভালবাসিত—সতীর মুখের ন্যায় উজ্জ্বল এই আলো। চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু সতীর মুখে বোধ হয় তাহাও নাই, চক্ষু দুইটা সর্ব্বদাই মমতায় টল্ টল্ করিতেছে। সহজ ভাবে সেই মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার অধিকার তাহার লোপ পাইয়াছে। চাঁদের আলোও আর ভাল লাগে না, তাহা যেন সমস্ত পরিষ্কার করিয়া ফেলে। চাঁদের কলঙ্কই তাহাকে এখন আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার মুখেও সেই কলঙ্কের স্পর্শ লাগি-

য়াছে। দেহের শুচিতা আর তাহার নাই। রতন সর্দ্দার প্রায়ই মদ আনাইত, অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহাকে জোর করিয়া সে তাহা পান করাইয়াছে, এখন সে আর কোন আপত্তি করে না, বাটীতে ঢালিয়া দিলেই পান করিয়া ফেলে। মদ তাহার রক্তের মধ্যে জ্বালা ধরাইয়া দেয়। উত্তেজনায় তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে, এখন তাহা আর বড় মন্দ লাগে না। এই জ্বালার মধ্যে, উত্তেজনার মধ্যেও একটা নূতন ধরণের সুখের স্পর্শ পাওয়া যায়। দেহের শুচিতার সঙ্গে মনের শুচিতাও বোধ হয় এমনি করিয়া ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। রাজকুমার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরভী সমাজের বুকে তাহার আসন পাতিয়া বসিয়াছে,.সম্মানের অলঙ্কারে তাহার সমস্ত অঙ্গ ভূষিত—তাহারই আর একপাশে মাটীতে লুটাইয়া রহিয়াছে মৃত্যু পথ-যাত্রী মিনতি। তাহার আশা আকাঙ্ক্ষাময় জীবনে ইহাদের স্পর্শ সে পাইয়াছিল। আদর্শ তাহার ছিল বড়, তাই সুরভীকে সে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল। দৈনন্দিন জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতায় আদর্শকে সম্মান করিয়া সে মিনতিকে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে অপরের হাতে। কিন্তু কোথায় রহিল তাহার আদর্শ! এখন সে অতি সাধারণের মত মদ্য পান করে—রতন সর্দ্দারের মত লম্পট খুনীর স্বার্থে আত্মবলি দিয়াছে। লোক সমাজে তাহার মুখ দেখাইবার কোন উপায় নাই। আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্যও তাহার ছিল না। ভবিতব্য বলিয়াই সব কিছু মানিয়া লইয়া সে স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। লড়াই করিয়া তীরে উঠিবার তাহার আর শক্তি নাই।

মিনতির কথাই বিশেষ করিয়া তাহার মনে হইত। সতীর কথা মনে না আনাই ভাল। সুরভী-মনোতোষ হইতে সে অনেক নীচে। পরাণ-দেব-



—১৪

সোমেশ্বরের কাজের অংশীদার হইবার মত শুচিতা আর তাহার নাই। সর্ব্ব-প্রকার ত্যাগ যাহারা করিতে পারে ওই পথ কেবল মাত্র তাহাদেরই। মিনতিও তাহারই মত হতভাগ্য, নিয়তির স্রোতে সেও গা ভাসাইয়া দিয়াছে। সে এখনও বাঁচিয়া আছে কিনা কে বলিতে পারে? হয়ত' নিয়তিকে মানিয়া লইয়া সে হরেরামের গৃহ আলোকিত করিয়া আজ শোভা পাইতেছে, লোভাতুর বৃদ্ধ অর্থের জোরে তাহার বার্দ্ধক্যকে গোপন করিয়া ফেলিয়াছে।

পঞ্চু আসিয়া রাজকুমারের হাতে একটা বাটী দিয়া গেল। রাজকুমার চাহিয়া দেখিল, টক্-টকে লাল মদ—মনে হইল যেন তাহারই রক্ত। রাজকুমার উন্মাদের ন্যায় বিস্ফারিত নেত্রে সেই গাঢ় লাল মদের দিকে চাহিয়া রহিল, সতী-সুরভী-মিনতির রক্তও এমনি লাল। সে এক চুমুকে সমস্তটা পান করিয়া ফেলিল। রক্তে তাহার আগুন ধরিয়া গেল। ধীর পায়ে আগাইয়া গিয়া সর্দ্দারের সম্মুখে বাটীটা ধরিয়া বলিল, আর একটু।

রতন সর্দ্দার বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া মৃদু হাসিয়া তাহার বাটীতে আরও অনেকটা মদ ঢালিয়া দিল।

*

* *

দায়রা আদালতে রতন সর্দ্দারের বিচার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বিচারে কিছু হইবে না বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। দায়রার বিচার বেশী দিন চলে না —পর পর কয়েকদিন চলিয়াই শেষ হয়।

রাজকুমারকে ভরসা দিয়া রতন বলিল, আমি বাইরে বেরিয়েই তোমায় জামিনে খালাস করে নিয়ে যাব, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

জেল রাজকুমারের সহ্য হইয়া গিয়াছিল। রতন তাহাকে যতদূর সম্ভব অধঃপাতে লইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার আর ভয় করিবার মত কিছুই ছিল

না। জেল-বাহির তাহার নিকট একই প্রকার বলিয়া তখন মনে হইত। সর্দ্দারের হাতে যখন সে পড়িয়াছে তখন জেলের বাহিরে গিয়াও ত' সেই ভিতরে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে—ইহ জীবনে আর সে মুক্তি পাইবে বলিয়া মনে হইল না।

সর্দ্দার তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল, আমার ওখানে তোমাকে নিয়ে যাব, সেখানে মজা আছে, নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। আমার কথা মত শুধু কাজ করতে হবে, ব্যাস্। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করেছ কি—। সর্দ্দার তাহার বাঘের থাবার মত হাত দুইটা একত্র করিয়া ঘটনাটা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল।

কোন কিছু লইয়াই আর তেমন করিয়া মাথা ঘামাইত না রাজকুমার। যাহা হউক একটা কিছু হইবেই, মৃত্যু আর এমন কি কষ্টকর! মানসিক মৃত্যু ত' তাহার হইয়াই গিয়াছে।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রতন সর্দ্দারদের বিচার শেষ হইয়া গেল—আই-নের ফাঁকে তাহারা সত্যই বাহির হইয়া গেল। মুক্তি পাইয়াই সে প্রচণ্ড ভাবে হাসিয়া উঠিল, বোধ করি আইনকেই তীব্র ভাবে বিদ্রূপ করিল। ডাকাতি এবং খুন করা সত্ত্বেও সে শিশুর ন্যায় নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং বিচারকের ন্যায়ই স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

মুক্তি পাইয়াই তাহার সর্ব্বপ্রথম কাজ হইল রাজকুমারকে জামিনে মুক্ত করিয়া আনা। পরের দিনই সে নিজে গিয়া তাহার জামিনের ব্যবস্থা করিল। বিকালের দিকে রাজকুমার জেলের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মুক্তি, কিন্তু সত্যই কি মুক্তি পাইয়াছে সে! ইতিপূর্ব্বে আর একবার সে কারাগার হইতে বাহির হইয়াছিল। সেবার সত্যই মুক্তির আনন্দ লাভ

করিয়াছিল, মুখে দেখা দিয়াছিল আত্মপ্রসাদের ভাব। সে বারের মুক্তি আনিয়াছিল সম্মান, মর্য্যাদা—দেহ মনের পবিত্রতা। কিন্তু এইবার ? লজ্জায় মুখ লুকাইবার স্থান নাই, দেহের শুচিতা গিয়াছে, মনের পবিত্রতাও শেষ হইতে চলিয়াছে—সমস্ত মনটাই হয়ত' একদিন লোপ পাইয়া যাইবে।

কি করিবে প্রথমে সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। সেই বস্তীতেই যাইবে ? মিনতি এখনও বাঁচিয়া আছে কিনা প্রথমেই সেই সংবাদ লওয়া প্রয়োজন। একটা পয়সাও সঙ্গে নাই, সমস্তটা পথ হাঁটিয়া যাইতে হইবে, পথ চিনিয়া লওয়াও কষ্টকর। রাজকুমার আগাইয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল। ঠিক সেই সময় কে যেন তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিল। সে চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—রতন সর্দ্দার দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। রাজকুমার মনে মনে নিশ্চিত রূপেই স্থির করিয়া লইল যে রতনই তাহার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করিবে। নিজেকে রক্ষা করিবার আর তাহার কোন উপায় নাই। মাথা নত করিয়া মনে মনে সে সর্দ্দারকেই মানিয়া লইল—সে-ই যন্ত্রী হইয়া তাহাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবে।

রতন তাহাকে সঙ্গে করিয়া একদিকে লইয়া গেল। রাস্তার একপাশে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল—ভিতরের বসিবার আসনটা মোটা অথচ রঙিন্ কাপড় দিয়া ঘেরা। সেইখানে আসিয়াই রতন পর্দ্দার পাশে দাঁড়াইয়া ডাকিল, আসমান।

পর্দ্দা সরাইয়া একটি অতি সুন্দরী নারী মুখ বাড়াইল—রূপের বিচারে সুরভীও ইহার নিকট দাঁড়াইবার যোগ্য নহে, চক্ষে তাহার চঞ্চল বিদ্যুৎ। রাজকুমার মুগ্ধ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজকুমারকে টানিয়া সম্মুখে আনিয়া রতন পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার মুগ্ধ অভিভূত দৃষ্টি আসমানের চক্ষে পড়িয়াছিল, মৃদু হাসিয়া সে-ও

ভাল করিয়া রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। আসমানও মুগ্ধ হইয়া গেল, ক্ষণকালের জন্য বিমুগ্ধ ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবার পর অস্ফুট স্বরে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, রাজকুমার !

রতন দুইজনের মুখের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, হ্যাঁ, এই রাজকুমার—একে বাড়ী নিয়ে যাও।

আসমানের চেতনা ফিরিয়া আসিল, সে মৃদু হাসিয়া পর্দ্দার ভিতরে সরিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে দরজাটাও খুলিয়া গেল। রাজকুমারকে ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া রতন বলিল, তোমরা চলে যাও, আমি পরে আসছি। দরজাটা সে জোরে বন্ধ করিয়া দিল।

পর্দ্দায় ঘেরা আসনে আসমান ও রাজকুমার। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। উভয়ে উভয়ের দিকে মুগ্ধ ভাবে চাহিয়াছিল। ক্ষণকাল পরে আসমান মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু খাবে ?

রাজকুমার কোন উত্তর করিল না, তেমনি ভাবেই চাহিয়া রহিল। এ কোথায় চলিয়াছে সে !

একটা খাবারের বাটী খুলিয়া গোটা কয়েক সন্দেশ আসমান একটা রেকাবীতে সাজাইয়া দিল। বেশ ক্ষুধা পাইয়াছিল। রাজকুমার সব কয়টাই খাইয়া ফেলিল।

আসমান মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আর দেব ?

রাজকুমার মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

একটা সুন্দর শিশি খুলিয়া খানিকটা রক্তবর্ণ পদার্থ একটা রঙিন্ কাচের গ্লাসে ঢালিয়া আসমান তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

রাজকুমার প্রথমটা একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু গন্ধটা নাকে যাইতেই তাহার রক্তের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। পাশে বসিয়া সুন্দরী নারী এবং

তাহারই হাতে গ্লাস—রক্তে তাহার নেশা লাগিয়া গেল। সে সমস্তটা এক চুমুকে পান করিয়া ফেলিল।

আসমান মৃদু হাসিয়া সাড়ীর আঁচল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিল। রাজকুমারের নেশা লাগিয়া গিয়াছিল, আসমানের একটা হাত সে দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

নারী মৃদু হাসিয়া আসনের পিছনের দিকে মাথা রাখিয়া দেহ এলাইয়া দিল।

পুরুষের রক্তে তখন মদের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেছে।

*

* *

রাজকুমারের মুক্তি মিলিল না। রতন সর্দ্দার বড় উকিল নিযুক্ত করিয়া এবং আরও কত কি করিয়া সে যাত্রা রাজকুমারকে চুরির দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াইয়া দিল। আসমান-মেনকা-রতন এবং রতনের শিষ্য প্রশিষ্যেরাই কেবল তাহাকে নিষ্কৃতি দিল না। পঙ্কিল জীবনের আবর্ত্তে সে পড়িয়া গিয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে ইহা হইতে আর মুক্তি নাই।

দশটা দিন কাটিয়া গিয়াছে রতন সর্দ্দারের আস্তানায়। জেলের বাহিরে আসিয়া এই বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়াও সে নির্জ্জীবের মতই পড়িয়াছিল। কোন কিছু করিবার প্রবৃত্তিও নাই বোধ হয়।

রতন সর্দ্দারের আস্তানায় কিসের যেন একটা পরামর্শ কয়দিন ধরিয়া চলিয়াছে। পরামর্শ চলিয়াছে বলিয়া যে কাজ বন্ধ আছে তাহা নহে। প্রতিদিনই চোরাই মাল চালান আসিতেছে আর তাহাই সঞ্চিত হইতেছে এক গোপন কক্ষে। রাজকুমার এই সমস্ত আর দেখিয়াও দেখিত না। মাঝে মাঝে আসমান আসিয়া তাহাকে লুপ্ত করিয়া দিত। মেয়েটাকে তাহার মন্দ লাগে না—টকটকে লাল মদের মতই সে নেশা ধরাইয়া দেয়।

সেদিন সে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতেছিল। মৃত রাজকুমারের মধ্য হইতে কুমারদা বোধ হয় উঁকি মারিতেছে! এই প্রেত পুরীর ফিস্ ফিস্ সহ্য করা সম্ভব নয়। ভূতটা আসিয়া যদি এক নিশ্বাসে তাহার সমস্ত রক্ত পান করিয়া ফেলিত রাজকুমার তাহাতে খুসী হইয়াই যাইত, কিন্তু হিস্ হিস্, ফিস্ ফিস্ শব্দ তুলিয়া সে ক্রমাগতই তাহার রক্ত জল করিয়া দিতেছে। কেহ কি নাই যে তাহাকে মুক্তি দিতে পারে?

আসমান ঘরে প্রবেশ করিয়াই লীলায়িত ভঙ্গিতে কটাক্ষ করিয়া বলিল, কি ভাবছ রাজা?

রাজকুমার দাঁড়াইয়া পড়িল, পূর্ণ দৃষ্টিতে আসমানের মুখের দিকে চাহিল, একটা প্রশ্ন বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে—কিন্তু কিছুতেই যেন আসিতে পারিতেছে না। তাহার ভবিষ্যত লইয়া ইহারা কী খেলা খেলিতেছে?

আসমান কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কথা বলবে না?

রাজকুমার অনেকটা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনের প্রশ্নটাকে একটু ঘুরাইয়া সে বলিল, কি এত' পরামর্শ করছ' তোমরা?

তাহাকে এক টুক্রা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়া আসমান উত্তর করিল, সত্যি কথা আমাদের মুখে বেরোয় না। 'সদা সত্য কথা বলিবে' ত' আর আমরা পড়িনি রাজা।

রাজকুমার চমকিয়া গেল। বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসা কাহাদের কণ্ঠ-স্বর যেন তাহাকে আহ্বান করিতেছে। সতী, মিনতি! সত্য কথা এইখানে কাহারও মুখ দিয়া বাহির হয় না। অকস্মাৎ তাহার চক্ষের উপরে গোটা গোটা হরফে লেখা কত কি-ই যেন ভাসিয়া উঠিল। সমস্ত ঘরময় কথাগুলি কে যেন লিখিয়া রাখিয়াছে। সতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সম্মুখে—

বালিকা কোন্ অবসরে যেন তরুণী হইয়া উঠিয়াছে, সাড়ীটা কোমরের কাছে জড়াইয়া বাঁধা, হাতের ঝাঁটাটা তখনও ফেলিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছে বোধ হয়। মুহূর্ত্তে পট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল—আধা-অন্ধকার ঘরে মাদুরের উপর আর একটা মেয়ে উপুড় হইয়া শুইয়া কি যেন লিখিয়া চলিয়াছে, তাহার সমস্ত মুখে আত্মসমর্পণের ছাপ লাগিয়া রহিয়াছে। রাজকুমার মাথাটা একবার ঝাঁকাইয়া লইল।

আসমান বিস্মিত হইয়া গেল, আগাইয়া আসিয়া তাহার একটা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, হল কি রাজা?

আসমানের মায়াজাল আজ ব্যর্থ হইয়া গেল। সতী ও মিনতি যে আজ একত্র আহ্বান জানাইয়াছে! কিন্তু সত্য কথা বলিয়া রতন সর্দ্দারের আস্তানা ত্যাগ করিয়া যাওয়া অসম্ভব। সত্য কথা যেখানে অচল সেখানে মিথ্যা বলিয়া প্রতারণাই করিবে রাজকুমার। আসমানকে নিকটে টানিয়া আনিয়া সে বলিল, দু'দিন তোমাকে ছেড়ে কি করে থাকব তাই ভাবছি আশা।

আসমান চমকিয়া গেল, রাজকুমারের আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে?

মৃদুস্বরে রাজকুমার উত্তর করিল, দেশে। সেখানে আমার কয়েকটা জিনিষ পড়ে আছে। সেগুলো কাছে না থাকায় শান্তি পাচ্ছি না।

সমস্ত শুনিয়া রতন বলিল, তোমার আবার কি আছে যা না এনে শান্তি পাচ্ছ না?

রাজকুমার মৃদু স্বরে উত্তর করিল, মায়ের স্মৃতিচিহ্ন, পূর্ব্ব পুরুষদের স্মৃতি-চিহ্ন—সবসময়েই সেগুলো আমার কাছে কাছেই থাকে।

রতন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, ন্যাকামি!

রাজকুমার গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বলিল, আমিও মরবার পর কারও মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই সর্দ্দার।

সর্দ্দারের হাসি যেন চাবুক খাইয়া থামিয়া গেল। মৃত্যুর পরেও তবে মানুষ কিছু চায়! রতন সর্দ্দার এই সব কথা বুঝিতে চাহে না। কিন্তু বুঝিতে না চাহিলেও তাহার কথার কোন উত্তরও ত' তাহার মুখে জোগাইল না।

আসমান রাজকুমারের হাতটা চাপিয়া ধরিল, তারপর সুন্দর ভাবে চাহিয়া বলিল, নিয়ে এস তোমার জিনিষ গুলো। তাহার চক্ষেও কোন্ এক মায়ারাজ্যের স্পর্শ লাগিয়াছে যেন!

*

*    *

রাজকুমার মিনতির সেই পুরাতন বস্তীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজায় তালা ঝুলিতেছে। মিনতি বাঁচিয়া আছে কিনা কে জানে! তাহার সংবাদ লইবার খুবই ইচ্ছা করিতেছিল। হরেরাম নিশ্চয় সবই জানে, হয়ত' তাহার গৃহেই সে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেছে।

সে ধীরে ধীরে হরেরামের গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হরেরাম বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল—ইহাকেই বোধ হয় ভূত দেখা বলে।

শান্ত স্বরে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, মিনতি কোথায়?

হরেরাম ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছিল, এইবার রাজকুমারের অতি নিকটে সরিয়া আসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, কে জানে মশায়, ওদের খবর রাখবেন না কখনও—বলে, দেবা ন জানন্তি।

রাজকুমার তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি চলে যাবার পর আপনি কি তাকে বিয়ে করেন নি?

হরেরাম বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু বিপদ হইতে উদ্ধারও ত' পাইতে হইবে, তাই কোনমতে মাথা নাড়িয়া বলিল, বিয়ে! হুঁ, বলেন কি —আমি!

সে সম্বন্ধে আর কোন কথা না বলিয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল, আমার একটা পুটুলী ছিল, সেটা কোথায় বলতে পারেন?

হরেরাম বোধ হয় বাঁচিয়া গেল। ফতুয়ার পকেট হইতে একটা চাবির গোছা বাহির করিয়া তাহা হইতে একটা চাবি বাছিয়া খুলিয়া লইয়া রাজকুমা-রের হাতে দিয়া বলিল, আপনার ঘরটা বাধ্য হয়েই রাখতে হয়েছে, আপনি নাকি ফিরবেনই। নিয়ে যান মশায় আপনার জিনিষ, আমিও ঘরটা ছেড়ে দিয়ে বাঁচি।

রাজকুমার হাত বাড়াইয়া চাবিটা গ্রহণ করিল, হরেরামের গৃহের দিকে একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। তার পর ধীর পায়ে সে-স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। ঘরের ভিতরটা ভাল করিয়া দেখা যায় না। মায়ের ছিন্ন সাড়ীটা বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া রাজকুমার ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া সে বই আর খাতাগুলি টানিয়া লইল। পাশাপাশি দুইটা খাতা, ঘরের সেই সামান্য আলোতেও সে দেখিতে পাইল একটার উপর গোটা গোটা হরফে লেখা কুমারী সতী ঘোষাল এবং অপরটার উপর মুক্তার ছাঁদে সুন্দর অক্ষরে লেখা কুমারী মিনতি রায়। অনেক কথা রাজকুমারের মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু সে রাজকুমার আর নাই। ওই দুইটি স্নেহময়ী মঙ্গলময়ী, নারীর খাতা স্পর্শ করিবার মত শুচিতাও বোধ হয় আর তাহার ছিলনা।

খাতা দুইটার পাতা সে উল্টাইতে লাগিল। অক্ষরগুলি চোখেও পড়েনা

তথাপি ওই কালো দাগগুলিই তাহাকে প্রচণ্ড শক্তিতে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই মুহূর্তে সতী ও মিনতি যেন একত্র তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, উভয়েই কাতর কণ্ঠে একান্ত মিনতি করিয়া ডাকিতেছে, ফিরে এস কুমারদা। ওই লাঠি ভর দিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিয়া আগাইয়া চলিয়াছেন অন্ধ পরাণ, বুক টান করিয়া তাঁহারই পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছে দেবু, সমস্ত বাঙ্গলা টহল দিয়া ফিরিতেছে সোমেশ্বর—পথ তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিবেই। তাহার জন্য ইহারা অপেক্ষা করিয়া নাই, সকলেরই কণ্ঠে সেই 'একলা চলরে'। সেই পথেরই পার্শ্বে এক বৃক্ষ ছায়ায় সজল চক্ষে দাঁড়াইয়া সতী ও মিনতি। তাহারা কুমারদার জন্য অপেক্ষা করিবে—অনন্তকাল ধরিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। খাতা দুইটার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া রাজকুমার উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, চক্ষু দিয়া তাহার অজস্র ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ সেই ভাবে সে পড়িয়াছিল জানে না, অকস্মাৎ কাহার ডাকে সে উঠিয়া বসিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। উজ্জ্বল একটা প্রদীপ হাতে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিনতি। ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আগাইয়া আসিয়া সে ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ফিরে এলে কুমারদা ?

ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া মাথা নাড়িয়া রাজকুমারও তেমনি ফিস্ ফিস্ করিযাই উত্তর করিল, চেষ্টা করছি বোন।

মিনতি আরও কিছুটা আগাইয়া আসিয়া নত হইয়া রাজকুমারকে প্রণাম করিল। রাজকুমার সেই দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল, মিনতির সীঁথির সিন্দুর এবং হাতের প্রদীপটা বড় উজ্জ্বল বলিয়া তখন তাহার বোধ হইতেছিল।

*

*　　　*

তারপরের ইতিহাস সামান্য। রাজকুমার পুলিসের নিকট রতন সর্দ্দারের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান দিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিল, কিন্তু তাহারই মধ্যে যতদূর সম্ভব আসমানকে বাঁচাইয়া গেল। গুপ্ত কক্ষ হইতে অনেক চোরাই মাল উদ্ধার হওয়ায় এবং দাগী বলিয়া রতন সর্দ্দারদের দশ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইল। আসমান রক্ষা পাইল না, কিন্তু নারী বলিয়া দণ্ড তাহার অপরাধের তুলনায় কমই হইল। রতন সর্দ্দার কারাবাসের আদেশ লইতে লইতেও মরণ কামড় দিয়া গেল, রাজকুমারকেও নিজেদের কুকার্য্যের সঙ্গী বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়াইল—বিশ্বাসঘাতককে রতন সর্দ্দার কোন দিন ছাড়িয়া দেয় না। রাজকুমার আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই করিল না, জগতের প্রতি তাহার আর কোন মায়া নাই। সুতরাং বিচারে তাহারও পাঁচ বৎসরের মেয়াদ হইয়া গেল। দাগী রতন সর্দ্দার গেল প্রেসিডেন্সিতে, রাজকুমার ফিরিয়া আসিল সেণ্ট্রাল জেলে। এই জেলটা তাহার একেবারে জানা হইয়া গিয়াছে।

জেলে এক বৎসরের মধ্যেই রাজকুমারের দেহে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। বসন্ত তাহার একটা চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া গভীর ক্ষতচিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে। রাজকুমারের মনের শক্তি তাহাতে নষ্ট হয় নাই। সে কাহারও সহিত বড় একটা কথা বলিত না, আপন মনেই কাজ করিয়া যাইত। তাহার কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়া বড় জমাদার তাহাকে মেট করিয়া দিয়াছে। রাত্রে কোন দিন এই ওয়ার্ডে কোন দিন সেই ওয়ার্ডে পালা করিয়া তাহাকে পাহারা দিতে হয়।

সেদিন রাজকুমারের কার্য্যভার পড়িয়াছিল বড় হাজতে। সমস্ত ঘর-

টায় তখন নেশার আসর জমিয়া উঠিয়াছে। খুনে বিল্লুর চারিপাশে কাঙাল ভিখারীর ন্যায় নানা জাতের অপরাধীরা গোল হইয়া বসিয়া গিয়াছে, খুনেটার হাতে একটা মদের বোতল—টকটকে লাল মদ তাজা রক্তের মতই দেখা যাইতেছে। অশ্লীল ভঙ্গিতে গানও চলিতেছে আসরে। রাত্রি প্রায় আটটা।

বিচারালয় প্রত্যাগত আসামীদের ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া জমাদার তালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। পুরাতন লোকেরা কলরব করিতে করিতে নিজ নিজ আসরের দিকে আগাইয়া গেল, নূতন এবং বিশেষ করিয়া কাঁচা যাহারা তাহারা দরজার নিকটেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিল্লুর আসর হইতে কে একজন এই নূতন আসামীদের দিকে চাহিয়া রসিকতা করিয়া বলিল, চলে এস চাঁদেরা, চাঁদের হাটে আবার লজ্জা কি! পর মুহূর্তেই লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পরম বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিল, বাঃ কি সুন্দর—একেবারে রাজপুত্তুর!

রাজকুমার একধারে বসিয়া কি একটা বই পড়িতেছিল। কথাটা কানে যাইতেই সে শিহরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। একটি পরম রূপবান তরুণ দরজার সম্মুখে বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—মুখে তাহার সরলতা মাখা। এই চারিদিকের কদর্য্যতার মধ্যে ওই মুখ অত্যন্ত বেমানান বলিয়া বোধ হইল। রাজকুমার স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল—তাহার বুকের মধ্যে কে যেন মাথা ঝাঁকাইয়া উঠিতে চাহিতেছে।

বিল্লুর আসরের সকলেই দরজার দিকে চাহিয়া কলকণ্ঠে ওই পরম রূপবান তরুণটিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। যে লোকটা প্রথমে তাহাকে দেখিয়াছিল সে নৃত্যের ভঙ্গিতে একপাক ঘুরিয়া বলিয়া উঠিল, আইয়ে রাণী সাহেবা।

সকলেই একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল, প্রত্যেকেই তাহাকে অধিকার করিতে চাহে—সে যেন পথে পড়িয়া থাকা লাখ টাকার তোড়া। বিল্লু মদের বোতল হাতে টলিতে টলিতে দুই পা আগাইয়া গিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, হঠ যাও, ও আমার।

সেই অল্পবয়সী তরুণটি ইহাদের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল, চক্ষু বাহিয়া তাহার অজস্র ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। রাজকুমার যেন কাহার এক ধাক্কা খাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তারপর একেবারে সকলের মাঝে আগাইয়া আসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিল, এই, হঠো সব। কিন্তু তাহার এই গম্ভীর কণ্ঠস্বরেও কিছুই হইল না, মেট বলিয়াও কেহ কোন খাতির করিল না। এই শান্ত প্রকৃতির মেটটিকে কেহ বড় গ্রাহ্যও করিত না, বিশেষ করিয়া আজিকার এই নূতন সম্পত্তির ছিনিমিনি খেলায় সিপাহীদেরও ঘোল খাইয়া যাইবার কথা। তাহাকে জোর করিয়া একপাশে সরাইয়া দিয়া সকলে মিলিয়া তরুণটিকে একেবারে আসরের মধ্যে টানিয়া আনিল—বিল্লু জোর করিয়া মদের বোতলটা তাহার মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল।

রক্তের মত টক্‌টকে লাল মদ—বিজলী বাতির আলোয় বোতলটা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। উহার সামান্যতম অংশও ভিতরে প্রবেশ করিলে ওই পবিত্র মানুষটা অশুচি হইয়া যাইবে। রাজকুমার আর স্থির থাকিতে পারিল না—একফোঁটাও সে উহার কণ্ঠে প্রবেশ করিতে দিবে না। নীলকণ্ঠ কেবল মাত্র একজনই হইতে পারে। সমস্ত জগৎ ভুলিয়া সকলকে ঠেলিয়া দিয়া আসরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সে দুই হাতে সেই আগন্তুক তরুণের কণ্ঠ সজোরে চাপিয়া ধরিল, কেহই তাহাকে সরাইয়া লইতে পারিল না। অনেকক্ষণ সেই ভাবে ধরিয়া থাকিয়া যখন রাজকুমার তাহাকে ছাড়িয়া দিল তখন সে একেবারে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার সুন্দর মুখ একেবারে বিকৃত হইয়া

গিয়াছে। রাজকুমারেরও সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল, বিরুদ্ধ পক্ষের আঘাতও ইতিমধ্যে তাহার দেহে পড়িয়াছে বড় কম নহে—সেও চেতনা হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল।

*

* *

কয়েক মাসের মধ্যেই ফাঁসির মঞ্চ প্রস্তুত করা হইল। দড়িটাকে কলা এবং মাখন মাগাইয়া নিয়মমত পিছল করা হইয়াছে, কোথাও যাহাতে বাঁধিয়া না যায়। ফাঁসীর মঞ্চ বাঁধিয়া বার বৎসরের জন্য দণ্ডিত খুনে সাহেবটা অনেক গুলি দিন ছুটি পায়—যত ফাঁসী ততই তাহার লাভ। কোন ফাঁসীর আসামীকে লাটসাহেব মাফ করিয়া দ্বীপান্তরের আদেশ দিলে সে বিরক্ত হইয়া ওঠে। আজ সে বেশ খুসী মনেই সকলের সহিত আলাপ করিতেছে, মাঝে মাঝে 'ট্রা লা' করিয়া সুরও ভাঁজিতেছে। এমন আসামীই ত' সে চায়, না করিয়াছে আত্মপক্ষ সমর্থন—না চাহিয়াছে কাহারও কাছে মাফ। সে আসামীটার সহিত দুই চারিবার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু লোকটার মন বহুপূর্ব্বেই বোধ হয় এই জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে!

ধীরে ধীরে সময় আগাইয়া গেল—ভোর হইয়া আসিতেছে, আর আধ-ঘণ্টা মাত্র সময়। পুরোহিত আসিয়া বোধ করি বা ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চকণ্ঠে গীতা পড়িয়া শুনাইয়া গেল। আসামীকে মঞ্চের উপর লইয়া যাওয়া হইল—বসন্তে তাহার একটা চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট চক্ষুটা দিয়াই সে পূর্ণ দৃষ্টিতে বেশ করিয়া মঞ্চটা দেখিয়া লইল। তারপর ক্ষণ-কালের জন্য উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল। কি দেখিতে চাহিল কে জানে, হয়ত' বা মহাশূন্যে দেখিতে চাহিয়াছিল অতীতের একটি চিত্র—ঠুক্ ঠুক্ করিয়া লাঠি ভর দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে অতীতের এক অন্ধ বৃদ্ধ, তাহারই

পশ্চাতে বুক টান করিয়া চলিয়াছে বর্ত্তমানের এক যুবক—সোমেশ্বর খুঁজিয়া বেড়াইতেছে সত্য পথ। সতী আর মিনতি, স্নেহ আর প্রীতি চারি চক্ষে অশ্রুজল লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে কাহার জন্য? চিরকাল এমনি করিয়াই তাহারা অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। মনোতোষের হাত ধরিয়া মোটরে ছুটিয়া চলিয়াছে সুরভী, চিরকাল হয়ত' ছুটিয়াই বেড়াইবে। নাঃ, আর কিছুই দেখা গেল না—অন্ধকার নামিয়া আসিল চারিদিকে। ঘটাং করিয়া জল্লাদ টানিয়া দিয়াছে মঞ্চের উপরকার হাতলটা।

*

*　　　*

মৃত কয়েদীর কেহ কোথাও নাই। হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ী আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। প্রধান ফটক পার হইবার সময় একজন সিপাহী হাঁকিয়া বলিল, পনের শ' একত্রিশ নম্বর।

অপর একজন সিপাহী মৃদু হাস্যের সঙ্গে বলিল, জান খালাস।

জেলের ঘণ্টা বাজিল ঢং ঢং করিয়া—পৃথিবীর কাজ একই ভাবে চলিয়াছে।

*　　　*　　　*　　　*